নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বাক্‌-সাহিত্য
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯

অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী

শ্রদ্ধাস্পদেষু

নিবেদন

রবীন্দ্রনাথের কথা-সাহিত্যের একটি স্বল্পাক্ষর আলোচনাই বইটির উদ্দেশ্য। পাঠকের আনন্দ নিয়েই বইখানি লেখা, সে আনন্দের অংশ যদি কেউ কেউ গ্রহণ করেন, তা হলেই আমি চরিতার্থ হবো।

সাময়িক পত্রে এবং একটি সংকলনে প্রকাশিত এর দুটি আলোচনা প্রায় বিলুপ্তির পথে চলে গিয়েছিল। সেই দুটিকে পুনরুদ্ধার করে দিয়েছেন আমার দুজন কৃতী ছাত্র—অধ্যাপক শ্রীমান অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য এবং শ্রীমান আদিত্যপ্রসাদ চৌধুরী। তাঁদের আমার কৃতজ্ঞতা ও আশীর্বাদ জানাই।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রসঙ্গ-সূচী

ছোটগল্পের ধারা

॥ এক ॥

উনিশ শতকের পৃথিবীতে চারজন প্রধান ছোটগল্প লেখক এসেছিলেন। গী-দ্য-মোপাসাঁ, আস্তন চেখভ, এডগার অ্যালান-পো আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আধুনিক এবং সফল ছোটগল্পের জমি অবশ্য এর আগে তৈরী হয়েছিল আর এক জনের হাতে। তিনি একাধারে কবি-নাট্যকার-ঔপন্যাসিক-গল্পকার, ফরাসী লেখক প্রস্‌পের মেরিমে। রোমাঁ এবং কঁৎ (Romans, Conte) অর্থাৎ উপন্যাস এবং কথার মাঝামাঝি আর একটি বস্তুকে শিল্পিত করলেন তিনি—যাকে বলা হল নুভ্যাল (Nouvelle)। বিস্তৃত একটি দীর্ঘ প্রসারিত কাহিনী নয়, কোনো একটি ঘটনার নিরলঙ্কার কৃপণ উপস্থাপনা মাত্রও নয়। মেরিমে তাঁর শিল্পকলায় যাকে রূপায়িত করলেন, সেই নাতি-দীর্ঘ নাতি-হ্রস্ব কাহিনী জীবনের শতদল হয়ে দেখা না দিক, অন্তত মন্দ-ভালোর দ্বাদশ দলেও উদ্ভাসিত হল। তাঁর 'কলঁবা' (Colomba)—পিতৃহত্যার প্রতিশোধের বিবরণ, 'লা ভেন্যু দি'ল্' (La Venus d' Ille)—প্রস্তরমূর্তির হাতে বিবাহের আংটি পরিয়ে দেবার পর তার ভয়াল অভিসার, লাঁলিভমাঁ দ্য লা রেদ্যুত্‌ (L' Enlivement de la Redoute)—নেপোলেয়ঁর মস্কো-অভিযানের ভিত্তিতে অনন্য কাহিনী, অথবা কর্সিকান 'মাতেও ফালকনে'র (Mateo Falcone) অল্পবুদ্ধি শিশুপুত্রকে হত্যা করবার অবিশ্বাস্য বৃত্তান্ত—সব মিলিয়ে এক নতুন আলোক-দ্বার উন্মোচিত করলেন মেরিমে।

প্রথমে যে চারজনের উল্লেখ করেছি, তাঁরা সেই আলোয় জাগা

পাখি। আর এই চারজনেরই গল্প রচনায় সূত্রপাত হয়েছিল একই কারণে—অর্থাৎ পত্র-পত্রিকার চাহিদা মেটাতে। মোপাসাঁ প্রধান ভাবে ফুটে উঠেছিলেন 'গোলোয়া' (Gaulois) আর 'জিল ব্লা' (Gil-Blas)-র পাতায়; চেখভ হাসির নক্‌শায় হাত পাকাচ্ছিলেন 'ওস্‌কোল্‌কি' (Oscolki) আর 'বুদিলনিক' (Budilnik)-এর আশ্রয়ে; পো-কে শুরু করতে হয়েছিল 'স্যাটারডে কুরিয়ার' আর 'স্যাটারডে ভিজিটার'-এ; আর রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হয়েছিলেন প্রথমে 'হিতবাদী' পত্রিকায়, পরে 'সাধনা'তে।

১৮৩০ থেকে ১৮৯১—এই একষট্টি বৎসরের ভেতরে এই চারজনের গল্প-শিল্পে পদক্ষেপ। এঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পো—তাঁর সঙ্গে মেরিমের বয়েসের ব্যবধান মাত্র ছ'বছর, কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ। চেখভ রবীন্দ্রনাথের চাইতে এক বছরের বড়ো, মোপাসাঁ এগারো বছরের, পো বায়ান্ন বছরের এবং ঐতিহাসিক বৃত্তরেখার মধ্যে ধরলে পো ছাড়া বাকী তিনজনকে প্রায় সমকালীনই বলা চলে; আরো বলা চলে, মেরিমের উদ্বোধনের পর, এই একষট্টি বছরের ভেতরেই, আধুনিক ছোটগল্পের পরিপূর্ণ বিকাশ।

"Men and women are better than heroes and heroines"—এই ছিল উনিশ শতকের সাহিত্য-পাঠকের মর্মবাণী। ফরাসী বিপ্লবে, চার্টিস্ট্ আন্দোলন আর চেল্‌শিয়ার রক্তপাতে, যন্ত্রশিল্পের ব্যাপকতায়, আভিজাত্যের অবক্ষয়ে, বুদ্ধিজীবীর ক্রোধ এবং হিউম্যানিজ্‌মে, দুঃখবাদী দর্শনের বিস্তারে আর ডারউইনের নির্মম জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায়—সব মিলে যেটি সামনে এসে দাঁড়াল, তা বাস্তবতার দাবি, জীবন আর জগৎকে স্পষ্ট প্রত্যক্ষভাবে জানবার আর জানাবার আকুলতা। দুদিন আগেও মানবতার মহৎ সত্যের যাঁরা বাণীবহ, সেই কবি-শিল্পীর দলকে উদাত্ত আহ্বান পাঠিয়েছিলেন মহাকবি ভিক্তর ইয়ুগো; বলেছিলেন, মহাশূন্যচারী ঈগলের মতো হে শিল্পিসত্তার দল—বুকের নীচে প্রাণাগ্নি বয়ে উড়ে চলো নব-দিগন্তের

দিকে—বিদীর্ণ করো অন্ধকার আর ঝঞ্ঝার বিভীষিকা—ভারত-মিশর-গ্রীস্ ইহুদী ভূমির ওপর দিয়ে হোক তোমাদের অভিযান :

"Pour connaître les horizons,
A travers l'ombre et les tempêtes,
Ayant au-dessus, de vos têtes
Mondes et soleils, au-dessous,
Inde, Egypte, Grèce et Judée,
De la montagne et de l'idée
Envolez-vous envolez-vous !"

কিন্তু সময় এসেছিল, যখন আর কবিকণ্ঠের উদ্বোধনই যথেষ্ট নয় ; জীবনের বেদনার মধ্যে নামতে হবে, তার গ্লানিকে নগ্নভাবে উপস্থিত করতে হবে, তার সত্যকে নিরাভরণভাবে তুলে ধরতে হবে। অতএব 'নোৎর্‌দামে'ও আর কুলোলনা, ঔপন্যাসিক হয়ে আসতে হল স্তাঁদাল, ফ্লোব্যার, এমিল্ জোলাকে। ইয়ুগো যাঁদের বলেছিলেন, 'ঈগল,' 'আত্মা', 'শক্তি'—নব-দিগন্ত যাঁদের দৃষ্টির সামনে প্রতীতি-সমুজ্জ্বল, তাঁদের আশাবাদেই জীবনের বাণী বেজে উঠবে না ; সব পাখিরই ডানা নেই, সব আকাশেই সূর্য ওঠে না। সেই পরিপূর্ণ স্বরূপকে জানতে চাই, অকুণ্ঠ-দৃষ্টিতে প্রতিদিনের অতি তুচ্ছকে প্রত্যক্ষ করতে চাই—যা বৈমানিক-বীক্ষণে ধরা পড়ে না,—মাত্র উর্ধ্বচারণেই যা সম্ভব নয়। ডবলু, এইচ্ অডেন ঔপন্যাসিক সম্পর্কে বলেছেন :

"For to achieve his highest wish, he must
Become the whole of boredom, subject to
Vulgar complaints like love, among the Just
Be just, among the Filthy filthy too,
And his own weak person, if he can
Must suffer dully all the wrongs of Man—

(The Novelist)

উপন্যাসিকের ভূমিকা এমন স্বল্পাক্ষরে, এত গভীরভাবে আর কেউ বলতে পেরেছেন বলে আমার জানা নেই। ছোটগল্প লেখকও এই সত্যের শরিক। উপন্যাসে ফুটে উঠতে লাগল সেকালের ক্ষত বিক্ষত, জিজ্ঞাসা-জর্জর সমগ্র জীবন ; আর যে-সব সমস্যা, যে-সমস্ত যন্ত্রণা, দৈনন্দিনতার যে-সব ছোটখাটো প্রেম-বেদনা-বৈচিত্র্য জীবনে খণ্ড খণ্ড হয়ে আসে, তারা আত্মপ্রকাশের উপায় পেলো ছোটগল্পে।

আধেয় ছিল যুগচেতনায়, আধার আনল পত্র-পত্রিকা। সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে পাঠককে খুশি করবার মতো, তার মনের চাহিদা মেটাবার মতো, কালের সত্যকে তার কাছে উদ্দীপ্ত রাখবার জন্যে, জীবনাশ্রয়ী শিল্পিত গদ্যবস্তু পরিবেষণ করতে হবে। কিছুকাল আগেও এ কাজ করত "Essay" বা 'সন্দর্ভ সাহিত্য'—ধীরে ধীরে তার জায়গা দখল করল ছোটগল্প। দীর্ঘ-বিলম্বিত উপন্যাস নয়, সংক্ষিপ্ত রচনা চাই ; পত্রিকার পাতায় স্থানাভাব—অতএব মেরিমের 'নুভ্যাল'-ও চলবে না—তিন-চার কলমের মধ্যেই বক্তব্যকে শেষ করতে হবে। এই পরোক্ষ সম্পাদকীয় শাসনে বাধ্য হয়ে লেখককে নির্বাচিত করতে হল ছোট ঘটনা, সংক্ষিপ্ত ব্যাপ্তি, একটি ক্লাইম্যাক্স্ এবং শেষ পর্যন্ত কোনো চমকপ্রদ বা নিশ্চিত গভীর পরিণাম। যুগচিন্তায় উদ্ধারিত এবং পত্রিকার শাসনে নিয়ন্ত্রিত হয়ে এই ভাবেই উনিশ শতকে ছোটগল্প তার শিল্পরূপ পেল।

যে কারণে, যে মননে, যে কাল-প্রভাবে মহাপৃথিবীতে ছোটগল্প এল, বাংলাদেশেও তারই স্বাভাবিক এবং ঐতিহাসিক অনুসৃতিতে প্রথম ছোটগল্প লিখলেন রবীন্দ্রনাথ। সে গল্প দেখা দিল ১৮৯১ সালে—"সাপ্তাহিক হিতবাদী"র পাতায়।

॥ দুই ॥

পত্র-পত্রিকার চাহিদা না থাকলে, লেখককে জীবিকার তাড়নায় উদ্‌ভ্রান্ত হতে না হলে, এ কালের ছোটগল্প এমন একটি স্বতন্ত্র শাখায় এ-ভাবে পল্লবিত হত কিনা অথবা কতদিনেই বা হত, তার জবাব বোধ হয় এড্‌গার অ্যালান-পো এবং তাঁরই স্বদেশবাসী ন্যাথানিয়েল হথর্ণ কিছুটা দিতে পারতেন। নাতি-আধুনিক কালে সমারসেট মম্‌ও এই চিন্তায় কিছুটা বিব্রত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু বাংলা দেশে "হিতবাদী" পত্রিকা না এলে কবি-নাট্যকার-প্রাবন্ধিক ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ক'টি ছোটগল্প লিখতেন, তা নিশ্চয় ভাবে বলা কঠিন। প্রায় শৈশব থেকে যাঁর সাহিত্য সাধনা শুরু—ত্রিশ বছর বয়েসে তিনি প্রায় প্রথম কলম ধরলেন ছোটগল্পের জন্যে। "হিতবাদী"র তাগিদ না থাকলেও হয়তো কোনো একদিন তাঁর গল্প আসত, যেমন করে দিনান্তের রঙ নিয়ে তাঁর ছবিরা ঝাঁক বেঁধে এসেছে। কিন্তু সে হয়তো আরো কুড়ি-ত্রিশ বৎসর পরে; আর তার ফলে তাঁর অনেক আশ্চর্য, উজ্জ্বল, অসামান্য গল্প থেকে আমরা বঞ্চিত হতাম। যৌবনের বন নানা রঙের ফুল ফোটায়, কিন্তু পরিণত বয়েস যুথী-মালতী-কুন্দের শুভ্রতার কুঞ্জেই প্রশান্ত হতে চায়। 'রবিবার' রবীন্দ্রনাথ পরে হয়তো ঠিকই লিখতেন, কিন্তু 'ক্ষুধিত পাষাণ'—কিংবা 'এক রাত্রি'র জন্ম হত কি? রবীন্দ্রনাথের 'পরিশোধ' কবিতা আর 'শ্যামা' গীতিনাট্য কি ঠিক এক?

"হিতবাদী" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন দার্শনিক পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, তার সাহিত্য-সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্য-সম্পাদকের কাজ দিল একটিই—সপ্তাহে সপ্তাহে একটি করে নতুন গল্পের জোগান দেওয়া। কিন্তু তখন রবীন্দ্রনাথ ছোট

ভাসিয়েছেন পদ্মার বুকে। নানা কারণেই মন অশান্ত। দেশের নরমপন্থী এবং চরমপন্থী—দুই রাজনৈতিক দলের সংঘাতে চিন্তা দ্বিধাগ্রস্ত। নাগরিক জীবন থেকে দূরে সরে এসে রোমান্টিক প্রকৃতি-সম্ভোগের মধ্যে আর সৌন্দর্য-তন্ময়তায় তাঁর দিন কাটছে। আর সেই প্রকৃতির পটভূমিতে যে সহজ-সরল মানুষ নিজের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা নিয়ে পদ্মার ঢেউয়ের মতো জাগছে, ভাঙছে, মিলিয়ে যাচ্ছে, তারাও এসে তাঁর সৃষ্টির ভেতরে বাসা নিয়েছে। দিগ্‌বিকীর্ণ ধূ-ধূ মাঠ, নদীর জল, "কাঁপন-লাগা ঝাউয়ের শিরে" সন্ধ্যাতারা-শুকতারা—এদের নিয়ে তাঁর মন ভেসে চলেছে কল্পনার সোনার তরীতে; আর গ্রাম্য পোস্টমাস্টার, বেদে-বাউল, শ্বশুরবাড়ি-যাত্রিণী পাড়াগেঁয়ে ছোট মেয়েটি, "যোবতী, ক্যান্ বা কর মন ভারী"-গেয়ে-চলা রসিক নৌকোযাত্রীরা, কাঠের মাস্তুল গড়িয়ে গড়িয়ে খেলা-করা কতগুলি ছেলেমেয়ে—এরাই তাঁর গল্পের উপকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে; এদের বীজাঙ্কুরেই তাঁর কথাকুঞ্জ বিকশিত হচ্ছে।

"হিতবাদী"তে রবীন্দ্রনাথ গল্প লিখেছিলেন মাত্র গুটি ছয়েক। 'দেনা-পাওনা' আর 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা'য় সমাজ সমালোচনা 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি'তে বাস্তবের সংঘাতে ভাববিলাসীর ট্র্যাজিডী, 'গিন্নী'তে একটি শৈশব-স্মৃতির পটভূমিকায় সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক রসসৃষ্টি আর 'পোস্টমাস্টার' গল্পে জীবন এবং প্রকৃতির দ্বৈততান।

এই গূঢ়-গভীর গল্পগুলো পাঠকদের কেমন লেগেছিল কে জানে, কিন্তু 'হিতবাদী'র কর্তৃপক্ষ পুরোপুরি খুশি হতে পারেননি। সাহিত্য-সাধনা তাঁদের কাছে প্রধান প্রশ্ন ছিল না, তাঁরা চেয়েছিলেন জন-প্রিয়তা। সুতরাং সাপ্তাহিক পত্রিকার পাতায় শিশু-মনের বিদ্যুচ্চকিত ইঙ্গিতময়তা অথবা বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে রতনের হৃদগত সম্পর্ক আবিষ্কার—এ-সব তাঁদের খুব মনঃপূত হলনা। আরো তরল রসের জোগান চাইলেন তাঁরা। কিন্তু সেদিন পদ্মার বিশাল বুকে,

তার [illegible]
তার তীর তীরে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন ঘিরে যে ক্ষুদ্র-তরঙ্গ উঠছিল, তার মধ্যে 'পঞ্চানন্দী' রামশিঙার কোনো অবকাশ ছিল না। তখন মানস-সুন্দরীর মায়ামূর্তির ওপর বিম্ববতীর রূপাঞ্জন পড়ে, তখন সকালের আলো সোনার কাঠি হয়ে সোনার খাটে ঘুমন্ত রাজকন্যার ঘুম ভাঙায়, তখন পদ্মার ভূর্জপত্র-দিগন্তে কালো মেঘের অক্ষরে কে যেন নিদ্রোত্থিতার কাছে নিজের পরিচয় লিখে যায়, পদ্মার তীরে যে মগ্ন বাউল শূন্যের দিকে তাকিয়ে পথ চলেছে, তাকে দেখে মনে হয়—কোন্ খ্যাপা যেন অনন্ত-সমুদ্রের কূলে কূলে পরশ-পাথর খুঁজে ফিরছে। রবীন্দ্রনাথের হৃদয়-যন্ত্রে তখন গল্প-কবিতার বিভাস-ললিত বাজছে—রম্য-সাংবাদিকতার চটুল উপকরণ আহরণ করে বেড়ানোর প্রসঙ্গও সেদিন অবান্তর।

সেদিন কবির মন বলে: "আমি সেই রাজপুত্র—একটা অসম্ভবের প্রত্যাশায় সন্ধ্যারাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এই ছোট নদীটি সেই তেরো নদীর মধ্যে একটি নদী, এখনো সাত সমুদ্র বাকী আছে; এখনো অনেক দূর, অনেক ঘটনা, অনেক অন্বেষণ বাকী; এখনো কত অজ্ঞাত নদীতীরে, কত অপরিচিত সমুদ্রসীমা, কত ক্ষীণচন্দ্রালোকিত অনাগত রাত্রি অপেক্ষা করে আছে—

(ছিন্নপত্র, ২৩)

এই অজ্ঞাত নদী-সমুদ্র-রাত্রি হল জীবন—তার অপরিমেয় রহস্যের সম্ভার। যে লেখক সেই অফুরন্ত অমিত জীবনের স্বাদমুগ্ধ, তাঁর পক্ষে যোগেন্দ্রচন্দ্র কিংবা ইন্দ্রনাথের সাংবাদিকতা কোনো-ক্রমেই আর সম্ভব ছিল না।

'সাহিত্য-সম্পাদক' রবীন্দ্রনাথ 'হিতবাদী'র জন্য গল্প লেখা বন্ধ করলেন—হয়তো ঝোঁকটা সেখানে থেমেও যেত; হয়তো 'মেঘ ও রৌদ্রে'র নির্যাসরূপ পাওয়া যেত একটি কবিতায়, হয়তো 'ক্ষুধিত পাষাণ' "শিপ্রানদী তীরে" না গিয়ে শুস্তার উপল-উপকূলে আর

একটি "স্বপ্ন" নির্মাণ করত। তাতে বাংলা সাহিত্য লাভবান হত কিনা, অথবা কতখানিই বা হত, সে আলোচনা তুলে লাভ নেই। কিন্তু ছোট গল্পের ক্ষতি হত অবশ্যই, তা শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও।

কিন্তু এরই মধ্যে 'সাধনা' পত্রিকা দেখা দিয়েছিল ঠাকুর বাড়ীর নেতৃত্বে, সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন্ সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'হিতবাদী' থেকে গল্পলেখক রবীন্দ্রনাথ চলে এলেন "সাধনা"র পাতায়। তারপর "গল্প লিখি এক একটি করে।" ১৮৯১ থেকে ১৯০১—এই এগারো বছরের মধ্যে দু হাতে গল্প লিখলেন তিনি। "সাধনা" ছাড়া "ভারতী"তেও লেখা চলল। কঙ্কাল, অতিথি, ত্যাগ, একরাত্রি, কাবুলীওয়ালা, ছুটি, শাস্তি, সমাপ্তি, মেঘ ও রৌদ্র, বিচারক, নিশীথে, মানভঞ্জন, ক্ষুধিত পাষাণ, দুরাশা, রাজটীকা এবং নষ্টনীড় পর্যন্ত সেরা গল্পগুলো এই সময়ে লেখা হয়ে গেল।

এই সময়টিকে বলা যায়, তাঁর গল্প-রচনার প্রথম পর্যায়। আর প্রসঙ্গত মনে পড়ে, ঠিক একই সময়ে সাত বছরের কনিষ্ঠ মাক্সিম গোর্কীও তাঁর ছোট গল্পগুলো লিখে চলেছেন। রবীন্দ্রনাথ দেখছেন পদ্মার ধারে বেদের টোল, গোর্কী ভল্‌গার তীরে জিপ্‌সীর মুখে শোনা গল্পকে সাজিয়ে লিখছেন—'Makar Chudra'; রবীন্দ্রনাথ তখন আবিষ্কার করছেন তাঁর মূক বেদনা আর তুচ্ছ সুখে নিস্তরঙ্গ যথার্থ স্বদেশকে, গোর্কীর চোখে ফুটে উঠছে গ্লানিগ্রস্ত ক্ষুধিত রুশিয়ার আর একরূপ। দৃষ্টিতে মিল নেই, প্রকাশে পার্থক্য, দুজনে দুই স্বতন্ত্র জীবনধারার শরিক, তবু কোথায় যেন একটা গভীর সাদৃশ্য আছে দুজনের। যে স্বাতন্ত্র্য আর সাধর্ম্য তলস্তয় আর গোর্কীর মধ্যে পাওয়া যায়, ঠিক সেই পার্থক্যই বোধ হয় ভল্‌গার তটচারী এবং পদ্মা-হৃদয়বাসী দুই গল্পশিল্পীর মধ্যে অনুভব করা যাবে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের প্রথম ও প্রধান অধ্যায়টি এখানেই।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভ হয়েছে ১৯১৪ সালে—প্রমথ চৌধুরীর "সবুজ পত্রে"র আবির্ভাবে।

বাংলা সাহিত্যে এক ঝলক উদ্দাম মৌসুমী হাওয়ার আনন্দ নিয়ে এল "সবুজ পত্র।" বক্তব্যে নতুন, বলার পদ্ধতিতেও নতুন। পত্রিকার সংকল্প বাক্য-প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী বললেন :

'আমাদের নব মন্দিরের চার দিকের অবারিত দ্বার দিয়ে প্রাণবায়ুর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের যত আলো অবাধে প্রবেশ করতে পারবে। শুধু তাই নয়, এই মন্দিরে সকল বর্ণের প্রবেশের সমান অধিকার থাকবে। উষার গোলাপি, আকাশের নীল, সন্ধ্যার লাল, মেঘের নীল-লোহিত, বিরোধালংকার স্বরূপে সবুজ পত্রের গাত্রে সংলগ্ন হয়ে তার মরকত দ্যুতি কখনো উজ্জ্বল, কখনো কোমল করে তুলবে। সে মন্দিরে স্থান হবে না কেবল শুষ্ক পত্রের।"

এই সংকল্পের মধ্যে দেখা গেল, নতুন কাল, নতুন মন এবং যুগচিন্তার প্রতিটি অভিনব তরঙ্গকেই নিজের বর্ণ-বিচিত্র মন্দিরে 'সবুজ পত্র' আহ্বান জানিয়েছে। স্বভাবতঃই রবীন্দ্রনাথের সদা-সজাগ চেতনাও 'সবুজ পত্রে'র ডাকে সাড়া দিল, অংশ নিল তারুণ্যের উৎসবে। বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, ইয়োরোপীয় মনন-স্পন্দে বেপমান, বৈদগ্ধ্যে বিমণ্ডিত, আধুনিকতায় দীপ্ত, এই পত্রিকার পাতায় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন "সবুজের অভিযান", চির-যৌবনের বাণী শোনালেন "ফাল্গুনী" নাটকে, লিখলেন অনেকগুলি ক্ষুরধার প্রবন্ধ, আর ঝড় জাগালেন একটি বিতর্কমূলক উপন্যাস লিখে—"ঘরে বাইরে"তে বিমলাকে সত্যরূপে গড়ে নিতে চাইলেন। সেই সঙ্গে লিখলেন কয়েকটি প্রবল ছোট গল্প—"স্ত্রীর পত্র", "পয়লা নম্বর", "হালদার গোষ্ঠী"; আরো পরে 'প্রবাসী'তে এল রাজনৈতিক জিজ্ঞাসা "সংস্কার", "নামঞ্জুর গল্প।"

তারপর থেকে তাঁর গল্পের ধারা অনিয়মিত। কখনো কখনো টুকরো টুকরো লেখা, দু-চারজন নাছোড়বান্দার দাবি মেটানো

হয়তো, হয়তো বা চল্‌তি লেখার একটানা অনুবৃত্তিতে এক আধবার স্বাদ বদলানো। গল্পের ধারা বোধ হয় তখন গদ্য কবিতার খাতে বয়ে গিয়ে আর একটা নতুন শিল্পরূপ পাচ্ছিল 'পুনশ্চ' জাতীয় বইয়ের পাতায়। তখন 'হরিপদ কেরাণীর' গল্প ধরা পড়ল আর এক মাধ্যমে, সুনৃতার কাহিনীও তাই, তখন গদ্য-কবিতার অপূর্ব ছন্দঃস্পন্দে সুনীত নটমল্লারে গান ধরল: 'আওয়ে পিয়ারোয়া রিমিঝিমি বরষণ লাগে,' 'বিদলিত ভেকের ডাকে'র মতো ব্যঙ্গ-সুনিপুণ বটকৃষ্ণের হাসি মাঝপথেই থেমে গেল, আর শূদ্রের রক্তে চিরকালের মতো চরিতার্থ হল ত্রিলোকেশ্বরের মন্দির। তারও পরে এল "হঠাৎ-দেখার" সেই মেয়েটি, যাকে জবাব দিয়েছিল কবিতার নায়ক: 'রাতের সব তারাই আছে—দিনের আলোর গভীরে'; এল 'অমৃতে'র অমিয়া—যাকে মহীভূষণ 'উপকরণের দুর্গ থেকে' মনুষ্যত্বের মধ্যে ত্রাণ করেছিল; 'উজ্জ্বল শ্যামলবর্ণ, গলায় পলার হারখানি' দুলিয়ে এল 'শ্যামা'—যে হাত দেখে বলেছিল, "তোমার স্বভাব-প্রেমের লক্ষণে দীন;" এল 'কণি', লিচুর ঝুড়ি ভাইফোঁটার উপলক্ষ্যে সাজিয়ে দিয়ে যে ঋণ শোধ করতে চেয়েছিল; সেই সঙ্গে এল আরো অনেকে।

মনে হয়েছিল, তাঁর ছোটগল্প কবিতার জগতে যেখানে ডানা মেলেছে, সেখান থেকে আর তারা ফিরে আসবে না; কারণ গল্পের সঙ্গে অনিবার্যভাবেই যে বস্তুভার থাকে, যে পারিপার্শ্বিক স্থূল উপকরণের আবেষ্টনী থাকে, তাঁর এই কবিতাশ্রয়ী গল্পগুলো তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করেছে। তারা কেউ-কেউ ছন্দে ঝঙ্কৃত, কেউ কেউ বা পরিপূর্ণ গদ্য-রীতির পথিক। ইংরেজি ব্যালাডের শরিক নয়, কাব্যরীতিতে লেখা গল্পও নয়—আসলে গল্পের মূলটিকে সরিয়ে রেখে তার ফুলটিকে তুলে ধরলে যা দাঁড়ায় তাই। এ-কথাও মনে হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের মানসিকতার বিচারে তাঁর গল্পেরা একটা স্বাভাবিক পরিণতিই পেয়েছে—'অতিথি', 'এক রাত্রি', 'ক্ষুধিত

পাষাণে' যার পূর্বসংকেত ছিল। এই পরিণামেই আমরা পূর্ণ হয়ে ছিলাম, কিন্তু আবার তাঁর তিনটি গল্প 'মাটির কাছে নেমে এল। ভাষায় কল্পনায় তারা গদ্য-কবিতার বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শবাহী, তবু তারা ছোটগল্পই বটে। তারা হল "তিনসঙ্গী"র ত্রয়ী। আর এই তিনটির ভেতরে সর্বোন্নতভাবে করুণ মহিমায় দাঁড়িয়ে রইল 'ল্যাবরেটরি' —তার বুকের ভেতর অনন্যা নারী সোহিনী এক সর্বলোভজেতা সাধকের প্রতীক্ষায় বেদনা-নিস্তব্ধ।

॥ তিন ॥

আগেই দেখেছি, 'হিতবাদী' "সাধনা" "ভারতী" পত্রিকার তৎকাল এবং পরবর্তী আরো কতকগুলি বৎসর—এই সময়টিই বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার প্রধান সময়। অর্থাৎ পূর্ণ যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বে পদক্ষেপ পর্যন্ত, 'সোনার তরীর' রূপ-সম্ভোগ থেকে 'গীতাঞ্জলি'র অরূপ সাধন পর্যন্ত, এই গল্প-পর্যায়ের বিস্তার। ১৩০৭ সালে মজুমদার এজেন্সী রবীন্দ্রনাথের প্রথম সম্পূর্ণ গল্প-সংগ্রহ প্রকাশ করেন 'গল্পগুচ্ছ' নামে—তাতে ১৩০৫ সালের 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'সমাপ্তি' পর্যন্ত ছিল। মোটের ওপর গল্প-রচনায় এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশের দ্বৈত প্রকরণে এই সময়ের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোট গল্পেরও যেন কায়ারূপ ও ভাবরূপের সম্পূর্ণতা এনে দিলেন।

প্রথম পর্যায়ের গল্পগুলোকে মোটামুটি এইভাবে সাজানো যেতে পারে:

(ক) সমাজ-সমস্যা: দেনা-পাওনা, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, বিচারক, সমস্যাপূরণ, অনধিকার-প্রবেশ, ত্যাগ, মানভঞ্জন ও নষ্টনীড় ইত্যাদি।

(খ) পারিবারিক : শাস্তি, দর্পহরণ, স্বর্ণমৃগ, কাবুলিওয়ালা, ঠাকুর্দা, দান-প্রতিদান, মধ্যবর্তিনী, ব্যবধান, খাতা।

(গ) জীবন ও প্রকৃতি : পোস্টমাস্টার, অতিথি, সুভা, একরাত্রি, সমাপ্তি, ছুটি।

(ঘ) রোমান্স : মণিহারা, ক্ষুধিত পাষাণ, দুরাশা, দালিয়া, মহামায়া, জয়-পরাজয়।

(ঙ) রাজনীতি : মেঘ ও রৌদ্র, দুর্বুদ্ধি, রাজটীকা।

(চ) অন্যান্য : কঙ্কাল, প্রায়শ্চিত্ত, গুপ্তধন, নিশীথে, ডিটেক্‌টিভ ও গিন্নী ইত্যাদি।

এই সব পরিচিত গল্পগুলোর বিস্তৃত পরিচয় দেবার কোনো প্রয়োজন নেই—সকলের আলোচনাও অনাবশ্যক। এদের মধ্য থেকে কিছু কিছু গল্প বেছে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের শিল্প-সফলতা অনুধাবন করা যাক।

দেনা-পাওনার বক্তব্য বাঙালী হিন্দু সমাজের একটি চিরাচরিত নিষ্ঠুরতার স্বরূপ-নির্ণয়, বরপণ-প্রথার নির্দয়তার নির্দেশ। নিরুপমার মৃত্যুর মুকুরে হাজার হাজার বাঙালী মেয়ের সকরুণ পরিণাম বিম্বিত হয়েছে। এই বেদনাকেই স্পষ্টোচ্চারিত প্রতিবাদরূপে জ্ঞাপন করার জন্যে স্নেহলতা সেকালে আত্মহত্যা করেছিল। রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতায় দেখানো হয়েছে, সত্যনিষ্ঠ ধর্মভীরু মানুষ এ যুগে অহেতুক উপদ্রবের মতোই অবাঞ্ছিত এবং অপমানিত। বিচারক গল্প সামাজিক উৎপীড়নের আর এক নৃশংস দিক—যেখানে স্বয়ং অপরাধী বসেছে বিচারকের আসনে ; গল্পটি তলস্তয়ের রেসারেকশনের সেই সুপরিচিত অংশটি স্মরণ করায়—যেখানে অনুরূপভাবেই কাউণ্ট্ বসেছেন কাতুশার বিচার করতে।

অনধিকার প্রবেশ, ত্যাগ ও মানভঞ্জন তিনটি বিশিষ্ট গল্প। এদের একটু আলাদাভাবে লক্ষ্য করবার প্রয়োজন আছে। 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পটিতে পরম নিষ্ঠাবতী কঠিন-হৃদয়া জয়কালী— যিনি ধর্মসংস্কারের বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় ঘটলে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রকেও অতি নিষ্ঠুর দণ্ড দিতে দ্বিধা করেন না—ডোমদের ভক্ষ্য একটি শূকর ছানাকে বাঁচাবার জন্য তিনি অকস্মাৎ যে আচারহীনতা এবং মিথ্যার আশ্রয় নিলেন, তা নারী-হৃদয়ের এক অপরূপ রহস্য—যা করুণার স্পর্শে আপাত-কঠিনতার দ্বার ভেঙে দিয়ে চকিতে স্নেহধারায় নেমে আসে। গল্পটির অন্যতর বক্তব্য হল, আচার ধর্মের ওপর প্রাণধর্মের প্রতিষ্ঠা—যা রবীন্দ্রনাথের অন্যতম জীবন-বাণী।

কিন্তু 'অনধিকার প্রবেশে'র আর একটি পশ্চাৎপট আছে— প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-জীবনী'তে তার সন্ধান আমরা পাই : "এই সময়ে বাংলা দেশে সুদূর সুইডেন হইতে হ্যামারগ্রেণ নামে এক যুবক আসেন। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের ইংরেজি গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া বাংলা দেশের কোন সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবেন এই আকাঙ্ক্ষা লইয়া এখানে আসেন। নিতান্ত পরিশ্রম করিয়া অকালে এই উদার হৃদয় যুবকের মৃত্যু হয়—তাঁহার মৃত্যুকালে আকাঙ্ক্ষা ছিল যে হিন্দুর ন্যায় তাঁহার দাহকার্য হয়। এই ব্যাপারে গোঁড়া হিন্দু সমাজের মধ্যে ঘোর আন্দোলন হয় ; একজন বিদেশী বিধর্মী হিন্দুশ্মশানে দাহ হইবে, ইহা তাঁহাদের অসহ্য হইয়াছিল।"

এই মনোভাবে যন্ত্রণায় জর্জরিত রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'বিদেশী অতিথি ও দেশীয় আতিথ্য' ; প্রশ্ন করেছিলেন, "এই অমানুষিক মানব ঘৃণাই কি আমাদের পক্ষে অক্ষয় কলঙ্কের কারণ নহে? অবশেষে আমাদের শ্মশানকেও আমাদের গৃহের ন্যায় বিদেশীর নিকট অবরুদ্ধ করিয়া রাখিব ?"

এরই পরোক্ষ প্রকাশ অল্প কিছুদিন পরে রচিত 'অনধিকার

প্রবেশ।' গল্পটি ছোট ; কিন্তু রবীন্দ্র মানসের ত্রিধারা, অর্থাৎ নারীর 'করুণী'-রূপ, ধর্মসংস্কারের উপরে মানবধর্মের প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বাত্মবোধ—এর মধ্যে একই সঙ্গে মিলিত হয়েছে। গল্পে রবীন্দ্রনাথের সার্থক উত্তর-সাধক প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সাগর সঙ্গম' নিঃসন্দেহে এই 'অনধিকার প্রবেশ' দ্বারাই অনুপ্রাণিত।

'ত্যাগ' গল্পও হৃদয়ধর্ম ও সমাজধর্মের বিরোধ-বৃত্তান্ত। গল্পটির বিন্যাস-কৌশল অপূর্ব—চারটি অধ্যায়ে চারটি দৃশ্যের অবতারণা, পরিবেশ এবং সংলাপের সাহায্যে সুরচিত পরিণতি। গল্পটির আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য এর নাট্যগুণে। কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন একাঙ্ক নাটক এবং ছোটগল্প চরিত্র-লক্ষণে এক—'ত্যাগ' তার খুব সার্থক উদাহরণ।

'ত্যাগে'র বক্তব্যও সংস্কার-মুক্তি। প্রতিহিংসাকামী প্যারিশংকরের চক্রান্তে ব্রাহ্মণ সন্তান হেমন্ত, নিজের অজ্ঞাতেই কায়স্থকন্যা বালবিধবা কুসুমকে বিয়ে করেছিল। একদিকে কুঁসুমের প্রতি ভালোবাসা, অন্যদিকে সমাজ ও সংস্কার—এই দ্বন্দ্বে হৃদয়েরই. জয়লাভ ঘটল—কুসুমকে হেমন্ত ত্যাগ করল না, পরিবার এবং সমাজকে ছেড়ে সে বেরিয়ে চলে গেল। মানবসত্য এবং ধর্মতন্ত্রের সংঘাতে রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই প্রথমটিকে সংবর্ধনা জানিয়েছেন, এই ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি।

'মানভঞ্জনে' সমাজকে আঘাত করা হয়েছে আর এক ভঙ্গিতে। গোপীনাথ শীলের স্ত্রী গিরিবালা বাস করে 'ত্রিতল অট্টালিকার সর্বোচ্চ তলের ঘরে'। তার সৌন্দর্য অসাধারণ: "অকস্মাৎ আলোকরশ্মির ন্যায়···এক আঘাতে অভিভূত করিয়া দিতে পারে। ···মদের ফেনা যেমন পাত্র ছাপিয়া পড়িয়া যায়, নব যৌবন এবং নবীন সৌন্দর্য তাহার সর্বাঙ্গে তেমনি ছাপিয়া পড়িয়া যাইতেছে—" কিন্তু গোপীনাথ শীলের সেদিকে লক্ষ্য নেই। তার হৃদয়-রাজ্যের রাণী থিয়েটারের নায়িকা লবঙ্গ—রূপে যে গিরিবালার পদধূলির

যোগ্য নয়—অথচ যার জন্যে গিরিবালাকে লাথি মেরে তার সমস্ত অলঙ্কার গোপীনাথ কেড়ে নিয়ে যায়।

যৌবন-মাদকতায় উচ্ছল, রঙ্গমঞ্চের মায়া-প্রদীপে উদ্ভাসিত এই গল্পে গিরিবালা সমাজ তথা স্বামীর উপরে এক নিদারুণ প্রতিশোধ নিয়েছে। চেখভের 'কোরাস গার্লে' কোলপাখভের স্ত্রীর মতো গিয়ে সে লবঙ্গের পা জড়িয়ে ধরে স্বামী এবং অলঙ্কার ভিক্ষা করেনি, অন্যভাবে সব অপমানের জবাব দিয়েছে। গল্পের শেষাংশে যখন গিরিবালা "রূপের তরঙ্গ তুলিয়া বাসরঘরে দাঁড়াইল এবং এক অনির্বচনীয় গর্বে গৌরবে গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া সমস্ত দর্শক মণ্ডলীর প্রতি এবং বিশেষ করিয়া গোপীনাথের প্রতি চকিত বিদ্যুতের ন্যায় অবজ্ঞাবজ্রপূর্ণ তীক্ষ্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল," তখন ক্ষিপ্ত গোপীনাথকে পুলিশ এসে প্রেক্ষাগৃহ থেকে টেনে বের করে নিয়ে গেল। "সমস্ত কলিকাতা শহরের দর্শক দুই চক্ষু ভরিয়া গিরিবালার অভিনয় দেখিতে লাগিল, কেবল গোপীনাথ সেখানে স্থান পাইল না।"

প্রতিশোধ, এবং নিঃসন্দেহে ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ। তবু এর মধ্যে নারীর মুক্তির একটা দিকও আছে। হয়তো গিরিবালার মুক্তি আমাদের মনঃপূত হবে না, কিন্তু স্বাধিকারপ্রমত্ত মূঢ় স্বামীর উদ্দেশে থিয়েটারের নায়িকার অবজ্ঞাদীপ্ত কটাক্ষেও আমরা 'মহেন্দ্রের বজ্র'ই দেখতে পাই। বিকৃত হতে পারে, তবু বৃহত্তর জগতে—শিল্প এবং সৌন্দর্যের মধ্যে—গিরিবালার যে মুক্তি—সংসারের অবমাননা আর অমর্যাদার গ্লানি দূর করে তার যে আত্মবোধন, সেই মৌল সত্যটিও উপেক্ষা করবার মতো নয়।

এই সব গল্পগুলির মধ্যে বহু আলোচিত এবং বিতর্কিত 'নষ্টনীড়'ই সব চাইতে উল্লেখ্য। বাংলা সাহিত্যের সংস্কার অনুযায়ী আয়তনে এটি ছোট উপন্যাস, চরিত্রধর্মে স্পষ্টই ছোটগল্প। আঙ্গিক-গত ভাবে এর সঙ্গে টমাস হার্ডির 'টেল'গুলোর সাদৃশ্য অনুভব করা

যায়। শিল্পকলার দিক থেকে 'নষ্টনীড়' প্রায় সার্থক। তিনটি মূল চরিত্রের আশ্রয়ে অনিবার্য নিপুণতায় গল্পটি অগ্রসর হয়েছে, অপরিসীম সংযমে একটি অতিরিক্ত শব্দকেও গল্পে স্থান দেন নি লেখক; আদর্শ ছোট গল্পের তির্যক রীতি, সংকেতধর্মিতা এবং সুনিশ্চয়তায় 'নষ্টনীড়' অসামান্য।

সব চেয়ে জ্বলন্ত 'নষ্টনীড়ে'র অগ্নিবর্ণ জিজ্ঞাসা। বাংলা সাহিত্যে এমন দুঃসাহসিক গল্প এর আগে আর কখনও লেখা হয়নি। সম্পর্কের বিধি-নিষেধ ভেঙে, নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে যে হৃদয়ঘাতী দুরন্ত প্রেম এসে চারুর জীবনে উপস্থিত হয়েছে—অথচ যার সমাধান কোথাও নেই, তার পরিণতি গ্রীক-ট্র্যাজিডীর মহৎ-যন্ত্রণায় আমাদের অভিভূত করে।

উপকরণের স্বল্পতায়, বাহুল্য-বর্জিত গতিতে, স্থির ভয়াল পরিণামে—এই গল্প গ্রীক ট্র্যাজিডীর সমধর্মাই বটে। উদার মহাপ্রাণ ভূপতি, শিল্পী এবং সহৃদয় অমল, স্নিগ্ধ নির্মল-হৃদয়া চারু— দুর্যোগের এক বিন্দু কালো মেঘও কোথাও ছিল না। তবু আকিলিসের মরণ-কেন্দ্রের মতো একটি ভুল ভূপতিরও ছিল:

"এইরূপ যতদিন সে খবরের কাগজ লইয়া ভোর হইয়াছিল, ততদিনে তাহার বালিকা বধূ চারুলতা ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করিল। খবরের কাগজের সম্পাদক এই মস্ত খবরটি ভালো করিয়া টের পাইল না।" এবং

"যে সময়ে স্বামী স্ত্রী, প্রেমোন্মেষের প্রথম অরুণালোকে পরস্পরের কাছে অপরূপ মহিমায় চির নূতন বলিয়া প্রতিভাত হয়, দাম্পত্যের সেই স্বর্ণপ্রভামণ্ডিত প্রত্যূষকাল অচেতন অবস্থায় যখন অতীত হইয়া গেল, কেহ জানিতে পারিল না। নূতনত্বের স্বাদ না পাইয়া উভয়ে উভয়ের কাছে পুরাতন পরিচিত অভ্যস্ত হইয়া গেল।"

দাম্পত্য-জীবনের এই পরম সত্যের দিকে অসতর্ক পতি-পত্নীকে এখানে সচেতন করে দিয়েছেন লেখক; এই ভ্রান্তিটুকুর মধ্যেই দেবলোকের কুটিল নির্দেশ—এরই রন্ধ্র ধরে প্রবেশ করল নেমেসিস্‌। অমল ভারতবর্ষ ছেড়ে ছুটে পালালো, ভূপতি দাঁড়িয়ে রইল বজ্রদগ্ধ বনস্পতির মতো—চারু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। মন্দাকিনী কিংবা উমাপদ যেটুকু ইন্ধনই যোগাক, আসলে সবই গৌণ। তিনটি নিরপরাধ চরিত্রের ওপর নিয়তি নিয়ন্ত্রিত একটি মহা-পরিণাম নেমে এল।

চারুর অন্তর্দ্বন্দ্ব, তার ফিরে আসবার চেষ্টা, ভাগ্যের বিরুদ্ধে তার করুণতম আত্মরক্ষার প্রয়াস, প্রাণপণে ভূপতিকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করবার তপশ্চর্যা, শেষ পর্যন্ত সর্বতোভাবে পরাভূত হয়ে অনির্বাণ তুষাগ্নিতে কী দারুণ আত্মনিবেদন। বাইরের জগৎ থেকে আর্ত-আহত ভূপতির অন্তঃপুরে চলে এসে স্ত্রীর প্রেমচ্ছায়ায় আশ্রয়-লাভের স্বপ্ন, স্বধর্ম-বিরোধী হয়ে স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্যে প্রহসনধর্মী প্রচেষ্টা, তারপর সর্বনাশের সামনে দাঁড়িয়ে মুহূর্তে "বৃদ্ধ" হয়ে যাওয়া—মারী করেলীর নায়ক জীবন্তে শবাধারে প্রোথিত হয়েও কি এর চাইতে বেশি যন্ত্রণা অনুভব করেছিল? চারুর দহন কি আনা কারেনিনার চাইতে বিন্দুমাত্রও লঘু?

মহান ট্র্যাজিডী, মহৎ উপন্যাসের এক অঞ্জলি স্বাদ আমরা 'নষ্টনীড়ে' লাভ করি। অসমসাহসী বক্তব্য, অসামান্য সমাপ্তি। কোথাও মেলাবার চেষ্টা নেই, সমাধানহীন সমাধানের কোনো নিরর্থক নির্দেশ দেওয়ার প্রয়াসও নেই। এই সমস্যা "চন্দ্রশেখরে"র লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মুখেও উপস্থিত ছিল—আমরা কল্পনা করতে পারি: মাদাম বোভারীকে নিয়ে বিভ্রান্তচিত্ত গুস্তাভ ফ্লোব্যারের মতোই, শৈবলিনীকে নিয়েও শিল্পী বঙ্কিমের বিনিদ্র নিশিযাপন করতে হয়েছে। তবু শিল্পী শেষ পর্যন্ত গার্হপত্য অগ্নিতে শৈবলিনীকে আহুতি দিয়েছেন—না দিয়ে তাঁর উপায় ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ

শিল্পকেই রক্ষা করতে পেরেছেন; চারুকে তিনি ভূপতির জীবনে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য কোনো লৌকিক বা অতি-লৌকিক উপায়নের উপর নির্ভর করেন নি, তাঁর যৌবন তখনো পরিপার্শ্বের সঙ্গে চুক্তি করতে জানত না। তাই ছোট গল্পের স্বভাবসিদ্ধ জ্বলন্ত জিজ্ঞাসার উপরেই 'নষ্টনীড়ে'র যবনিকা নেমেছে।

গল্পের এই সমাপ্তিহীন পরিণতি, এই ভবিষ্যৎহীন প্রেম, চেখভের "The Lady with the Dog" কে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু চেখভের গল্পে বর্ষাসন্ধ্যার কোমল বিষণ্ণতা, যা তাঁর অধিকাংশ গল্পেরই বৈশিষ্ট্য; আর রবীন্দ্রনাথের গল্পে সন্ধ্যার নীড় বহ্নিমান— তার শিখার উত্তাপ আমাদেরও স্পর্শ করে।

বক্তব্যে এবং রীতিতে, বলা অনাবশ্যক, 'নষ্টনীড়' বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত সমস্ত কোডের বাইরে, আধুনিক রবীন্দ্রনাথের হাতে গল্পটি আধুনিকতম। একমাত্র এই গল্পটি লিখেই তিনি গল্পকাররূপে স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতেন।

ছোটখাটো ত্রুটি গল্পটিতে একেবারে যে নেই, তা নয়। অমলকে বিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বিলেত পাঠানোর মধ্যে লেখক অনেকখানি ফাঁকি দিয়েছেন। এ-ভাবে বিয়ে করে শ্বশুরালয় থেকেই কোনো বাঙালী কখনো বিলাত-যাত্রা করে না—এটুকু নিতান্তই গল্পের খাতিরে। আসলে এর সাহায্যে লেখক চারু এবং অমলের বধূর সাক্ষাৎকার, তার ফলে চারুর প্রতিক্রিয়া এবং আনুষঙ্গিক আরো অনেকগুলি সংকটকে এড়াতে চেয়েছেন মনে হয়। খুব সম্ভব, সেই বিস্তৃতি উপন্যাসের দীর্ঘ জটিলতায় পরিকীর্ণ হয়ে যেত, ছোটগল্পের শাসিত আয়তনে তা হলে আর 'নষ্টনীড়'কে নিবদ্ধ রাখা যেত না। আমার দ্বিতীয় আপত্তি ভূপতির করুণ আত্মবঞ্চনার পর্যায়ে, শিল্পী হিসেবেই এ অংশে রবীন্দ্রনাথের ভূপতি সম্পর্কে আরো একটু সদয় হওয়ার প্রয়োজন ছিল। অমলের চিঠির আশায় চারু ব্যাকুল, তখন নানা ছলে তার প্রত্যাশা চরমে তুলে দিয়ে

ভূপতি চাদরের আড়াল থেকে নিজের লেখার খাতা বের করল —এই false climax-এর কৌতুক-সৃষ্টির প্রলোভন রবীন্দ্রনাথ সহজেই সংবরণ করতে পারতেন। কারণ 'নষ্টনীড়ে'র এই রক্তক্ষরা পর্যায়ে আমরা অন্তত প্রহসনের জন্যে প্রস্তুত নই ; আর ভূপতি গ্রীক ট্র্যাজিডীর নায়কের মতো নিয়তি-তাড়িত এক উজ্জ্বল পুরুষ, কোনোক্রমেই সে শেক্‌সপীয়রের সেই রঙ্গচরিত্র ম্যালভোলিয়ো নয়।

পারিবারিক গল্পগুলোর ভেতরে ফাঁসির মঞ্চে যাত্রিণী 'শাস্তি'র অভিমানিনী নায়িকা চন্দরা রবীন্দ্রনাথের অকৃপণ মমতা দিয়ে গড়া। রবীন্দ্রনাথ যে কেবল "মাঝে মাঝে…ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে" গতায়াত করেছেন তা নয়, 'ভেতরে প্রবেশ' করবার শক্তিও যে তাঁর ছিল, এই গল্পই তার প্রমাণ। স্বামী এবং তার প্রেম সম্পর্কে কী মোহমুক্তি বয়েই চন্দরা ফাঁসি-কাঠের দিকে যাত্রা করেছে! এটি পড়ে "সাহিত্যের" শ্যেনচক্ষু সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির বিভ্রান্তি ঘটেছিল, গল্পটি লিখে রবীন্দ্রনাথ যে কাকে শাস্তি দিতে চেয়েছেন, সেটি তাঁর বোধগম্য হয় নি। আশ্চর্য রুচি, অদ্ভুত রসবোধ। কিন্তু গল্পটি সমাজপতির পক্ষে যতই দুষ্পাচ্য হোক, এর অন্তর্নিহিত কারুণ্য ছাড়াও পদ্মার তীর থেকে তুলে আনা গ্রাম্য কৃষকবধূর এই ছবিটিকেও বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন বলে চিহ্নিত করা উচিত। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচিত "মৌরীফুল" গল্পের দুর্ভাগিনী সুশীলার ওপর চন্দরার ছায়া অলক্ষ্য নয়।

'ক্যাবুলিওয়ালা' রবীন্দ্রনাথের বিশ্বচেতনার বিস্ময়। মানুষের সহজাত স্নেহ-মমতা-ভালোবাসাকে দেশ-জাতি-ধর্মের গণ্ডীর বাইরে ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। আমাদের ঘরের ভেতরে বিশ্বকে বরণ করে আনতে পারলেই আমরা ধন্য—আত্মপরের ভেদ সেখানে

নগণ্য। তাই 'কাবুলিওয়ালা'য় কবি যা বলতে চেয়েছেন 'খেয়া'য় তার মর্মমধু এইভাবেই উচ্ছলিত :

'কাউকে চেনে পরশ আমার,
কাউকে চেনে ঘ্রাণ,
কাউকে চেনে বুকের রক্ত
কাউকে চেনে প্রাণ।
ফিরিয়ে দিতে পারি না যে
হায় রে—
ডেকে বলি, 'আমার ঘরে
যার খুশি সেই আয়রে তোরা,
যার খুশি সেই আয়রে।'

পারিবারিক পর্যায়ের দুটি প্রধান গল্পরূপে নির্দেশ করা যায় 'মধ্যবর্তিনী' এবং 'খাতা'কে। নিবারণ আর হরসুন্দরীর দাম্পত্য জীবন চমৎকার চলছিল :

"যেদিন কাঁচা আম অথবা তপ্‌সি মাছগুলো আসে, সেদিন অনেক দরদাম করিয়া কিঞ্চিত বিশেষ রূপ রন্ধনের আয়োজন হয়। তারপর যথাসময়ে তেল মাখিয়া স্নান করিয়া আহারান্তে দড়িতে ঝুলানো চাপকানটি পরিয়া একছিলিম তামাক পানের সহিত নিঃশেষ পূর্বক, আর একটি পান মুখে পুরিয়া"—

আফিস যাত্রা, দিনান্তে প্রত্যাবর্তন, প্রতিবেশীর বাড়িতে সন্ধ্যার আড্ডা, তারপর "রাত্রে শয়নগৃহে স্ত্রী হরসুন্দরীর সহিত সাক্ষাত হয়" এবং "নবনিযুক্তা ঝির অবাধ্যতা, ছেঁচকি বিশেষে ফোড়ন-বিশেষের উপযোগিতা" ইত্যাদি গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনা চলে। এই গন্তময় এবং স্বাচ্ছন্দ্যময় দাম্পত্য জীবনে এক মারাত্মক অঘটন ঘটালো হরসুন্দরী। নিজের অসুস্থতা এবং সন্তানবিহীন স্বামীর কথা ভেবে সে জোর করেই ঘরে সপত্নী আনল। নতুন প্রেমের স্বাদে

নিবারণ পুরোনোকে ভুলে গেল, শুরু হল হরসুন্দরীর অন্তর্জ্বালা। অবশ্য বালিকা বধূ শৈলবালা বেশীদিন রইল না, নিজের অসন্তোষ, অসুখ এবং অশান্তি দিয়ে সংসারটিকে বিপর্যস্ত করে মৃত্যুর মধ্যে বিদায় নিলে। স্বামী স্ত্রী পূর্বজীবনে আবার ফিরে এল, কিন্তু পুনর্মিলন আর ঘটল না; সবই সেই আগের মতো, তবু:

"পূর্বে যেরূপ পাশাপাশি শয়ন করিত এখনও সেইরূপ পাশাপাশি শুইল, কিন্তু ঠিক মাঝখানে একটি মৃত-বালিকা শুইয়া রহিল, তাহাকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিল না।"

শেষের একটি মাত্র বাক্যেই অতি সাধারণ গল্পটি অসাধারণ হয়ে উঠেছে। অবাঞ্ছিতভাবে যে এসেছিল, দু জনকে সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক করে দিয়ে সে সরে গেছে। কিন্তু সম্পূর্ণ? শৈলবালার মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু মাঝখানে যে চিহ্নটি সে রেখে গেছে তা কোনোদিনই হয়তো সরবে না, দু জনের হৃদয়ের ওপর ভারের মতো • চেপে থাকবে। আর্নেস্ট ডাউসনের মতো নিবারণ আর একবার অনুভব করবে:

"Then falls thy shadow, Cynara! the night is thine:
And I am desolate and sick of an old passion—"

ছোটগল্প রচনার যে বিশেষ গুণটির জন্যে চেখভকে "The Master" বলা হয়ে থাকে, সেই উৎকর্ষে এই গল্পটি দীপ্ত। আর একটি গল্প, "খাতা।" "লিখিতে শিখিয়া অবধি উমা বিষম উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে।" এই ছোট মেয়েটির মনের কথার প্রতীক তার খাতাটি স্বামী প্যারীমোহন কেড়ে নিয়েছে; কিন্তু প্যারীমোহনের "সূক্ষ্মতত্ত্বকণ্টকিত বিবিধ প্রবন্ধপূর্ণ" খাতাটিকে কেড়ে নিয়ে ধ্বংস করতে পারে এমন "মানবহিতৈষী" কেউ নেই, এইটিই রবীন্দ্রনাথের মর্মোত্থ দীর্ঘশ্বাস।

বিষয়বস্তু সামান্যই, কিন্তু ব্যঞ্জনায় অসামান্য। কত সহজ উপকরণের সাহায্যে কতখানি গভীরে যাওয়া যেতে পারে এই

গল্পটি তার চমকপ্রদ উদাহরণ। উমার তুচ্ছ লেখার খাতাটি কেড়ে নেওয়ার মধ্যে যে নিষ্ঠুরতা প্রকাশিত হয়েছে, তা যেন রক্ষণশীল বাঙালী পরিবারের একটা সর্বাঙ্গীণ শোষণকেই ফুটিয়ে তুলেছে, উমার মতো লক্ষ লক্ষ মেয়ের চাপা কান্নার অস্ফুট ধ্বনি গল্পটির মধ্যে ফেটে পড়েছে। আপাত দৃষ্টিতে কাহিনী ভারবর্জিত এবং সহজ, অথচ অন্তরঙ্গে একটি সুবৃহৎ বক্তব্য সংকেতিত—'খাতা' ছোটগল্পের এই মৌলিক গুণে গুণান্বিত।

এই পারিবারিক গল্পের পর্যায়ে "দিদি" আর একটি গভীর এবং করুণ কাহিনী। বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে রক্ষা করবার জন্য দিদি শশিমুখীর জীবন দান, শশীর স্বামী জয়গোপালের স্বার্থলুব্ধ হিংস্রতা এবং ঘটনার বিন্যাস-কৌশলে এই ছোটগল্পটিতে একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের উপকরণ বিন্যস্ত।

"দৃষ্টিদান" ও "প্রতিহিংসা" ইত্যাদিও "দিদি"র সমধর্মী। চরিত্র-সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য, রচনার সরসতায় এবং জীবনের তরল কলধ্বনিকে চকিতে সমুদ্র-মন্দ্রিত করে তোলার নিদর্শন "ঠাকুর্দা"। অতীতের স্বপ্নাচ্ছন্ন সরল মিথ্যার পশারী নয়নজোড়ের কৈলাসচন্দ্র পাঠকের কাছেও কৌতুকের উপকরণ হয়ে ওঠেন, গল্পের নায়কের মতোই তার মনে হয়: "বৃদ্ধ যে মিথ্যা দুর্গ অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছে এবং মনে করিতেছে ইহা চিরস্থায়ী, সেই দুর্গটি দুই তোপে সর্বসমক্ষে উড়াইয়া দিই।" তারপরে কৌতুকের উৎকট বিস্তার এবং তোপের আগুন দেওয়ার মুহূর্ত যখন সমাগত, সেই মুহূর্তে:

"হাসির উচ্ছ্বাস মুক্ত করিয়া হঠাৎ দেখি, একটি বালিকা তক্তপোষের উপর উপুড় হইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে" এবং "হঠাৎ আমার কৃতকার্যের বীভৎস নিষ্ঠুরতা আমার সম্মুখে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল।"

একটি দায়িত্বহীন কৌতুক যে কী নিদারুণরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, গল্পের শেষে তারই উদ্‌ঘাটন। আর সেই চিরকালীন

সত্যের সংকেত—সমস্ত উচ্ছ্বসিত হাসিই বেদনাবাহী ক্রন্দনের বহিরঙ্গ :
"বাহিরে যবে হাসির ছটা, ভিতরে থাকে আঁখির জল।"

আর একটি অসামান্য নিদর্শন : "মুক্তির উপায়।"

গল্পটি পরে সার্থক একটি প্রহসনে রূপায়িত হয়েছে। কিন্তু এর মূল রবীন্দ্রনাথের জীবন-প্রেমের গভীরে। বৈরাগ্যের সম্বর্ধনায় মুক্তি নয়, মানুষের চরিতার্থতা জীবনরস-সম্ভোগে। কৌতুকের সুপ্রচুর উপাদানে সাজিয়ে, কর্মবীর মাখনলাল এবং "দড়ি" ও "কলসী"-রূপা তার দুই স্ত্রীকে উপস্থিত করে—বিড়ম্বিত বিবাগী ফকিরচাঁদকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত করে রবীন্দ্রনাথ যে উজ্জ্বল হাসি এই গল্পে বিতরণ করেছেন, তা কৌতুকের আশ্রয়ে একটি মনোরম গল্পে পরিণত হলেও এর তাৎপর্য গভীরতর। যে কথা বলেছি—রবীন্দ্রনাথ মর্ত্যপ্রীতির কবি—"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে" তাঁর জন্য কখনোই নয়। তার ফলে নিদারুণ আত্মবঞ্চনা এবং অনিবার্য দুঃখ।• এই গল্পেরই অন্যতর ভাষ্য 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'—যেখানে হৃদয়কে হত্যা করতে গিয়ে সন্ন্যাসী বুঝেছিল—স্নেহ-প্রেম কী নির্মমভাবে প্রতিহিংসা নেয়। প্রথাজালবদ্ধ নিষ্ঠুর রঘুপতিকেও কি জয়সিংহের শোণিত-তর্পণের মধ্য দিয়ে এই অকরুণ সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে হয়নি? এই তত্ত্বেরই কাব্যময়রূপে আমরা 'পরশ পাথরে' দেখি :

"সেই সমুদ্রের তীরে, শ্রান্ত দেহে জীর্ণ চীরে
খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর"।

॥ চার ॥

রুসো বলেছিলেন, "যিনি বিশ্বকর্তা (L' Auteur des choses), *তিনি সব চমৎকারভাবে শুরু করে দিয়েছিলেন, কিন্তু সব বিকৃত* হয়ে গেল মানুষের হাতে—entre les mains de l'homme।" সুতরাং চলো প্রকৃতিতে, সেই সহজ সৌন্দর্যের লীলালোকে। হিংসা-দ্বেষ-সংঘাত বর্জিত সেই আনন্দের জগতে—আত্মা পুনরুদ্বোধিত হোক : 'পাখির গানে, বাঁশির তানে, কম্পিত পল্লবে।'

এই প্রকৃতি থেকে বিচ্ছেদই মৃত্যু। সে মৃত্যু আত্মিক, সেই মৃত্যু কায়িক। রুসোর ভাবশিষ্য ব্যার্নার্দাঁ দ্য স্যাঁৎ-পিয়্যার তাঁর উপন্যাস 'পল এ ভিরজিনি' (Paul et Virginie) লিখেছিলেন এই সত্যকেই প্রকাশ করবার জন্য। প্রকৃতি এবং প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রিত প্রেমের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিরজিনি চলে গিয়েছিল সভ্যতার কেন্দ্রে—দূরের শহরে। কিন্তু শহরের কৃত্রিমতা তার অসহ্য ঠেকল, সেখানে সে থাকতে পারল না—ফিরতে চাইল আইল অভ্ ফ্রান্সে, সেই নারিকেল কুঞ্জে, সমুদ্রতীরে, পলের ভালোবাসায়। কিন্তু ফিরতে আর পারল না। সেই সরল জীবনের সহজ স্বর্গের কাছে এসেও তার জাহাজ ডুবে গেল, মৃত্যু কেড়ে নিলে ভিরজিনিকে।

এই কাহিনী রূপক। এর তত্ত্ব সুস্পষ্ট। প্রকৃতির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই মৃত্যু। সরল আনন্দের স্বর্গ থেকে একবার ভ্রষ্ট হলে আর ফিরে আসবার পথ নেই। যেমন ফিরে আসতে পারেননি আদম আর ইভ।

রুসোর দর্শন এবং স্যাঁৎ-পিয়্যারের উপন্যাস ইংরেজি নব-রোম্যান্টিক্ কাব্যধারাকে কী বিপুল ভাবে প্রভাবিত করেছিল, তা আমরা সকলেই জানি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যজীবনে যখন মুগ্ধচিত্তে

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য অনূদিত 'পৌল-বর্জিনি' পড়েছিলেন, তখন এই উপন্যাসের শেষে লেখকের এ উক্তিও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি : "আমাদের সৌভাগ্য নির্ভর করছে প্রকৃতিকে অনুসরণ করবার ভেতরেই।"

তা ছাড়া বিহারীলাল তো ছিলেনই, যিনি সহর থেকে দূরে, কোনো এক নদীর ধারে, সুদীর্ঘ তৃণরাজির ভেতরে সারা শরীর এলিয়ে দিয়ে "শবসম স্থির" হয়ে থাকতে চান। ছিল ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-শেলীর কবিতা। ছিল জোড়াসাঁকোর বাড়ীর পুকুর, প্রাচীন বট; সেখান থেকে শান্তিনিকেতনের ধূ-ধূ লাল মাটি, কোপাই, শালের বীথি; ডালহাউসি পাহাড়, কেলুবন; মোরান সাহেবের বাড়ী—চিরকলতান উদার গঙ্গা; কারোয়ারের সমুদ্রতীর; তারপর পদ্মাবাস, শিলাইদহ, সাজাদপুর, চর-ধানক্ষেত-বন ঝাউ-আকাশ, এরাও সবাই এল। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মর্মমধু পান করে মগ্ন হয়ে গেলেন।

স্বাভাবিক ভাবেই, নিসর্গ জগৎ তাঁর গল্পে একটা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করল। তারা মাত্র প্রেক্ষাপট হয়ে রইল না, কেবল অলঙ্করণের দায়িত্বই নিল না, এক-একটি সজীব চরিত্র হয়ে কোনো কোনো গল্পে পরিণামও নির্ধারণ করল। কখনো বা প্রকৃতি আর মানুষ এক হয়ে গেল, যেমন "সুভা" গল্পের সুভা, "ছুটি" গল্পের ফটিক।

সুভা কথা বলতে পারে না—সে মূক; কিন্তু "প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার পূরণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইয়া কথা কয়। নদীর কলধ্বনি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখির ডাক, তরুর মর্মর-ধ্বনি, সমস্ত মিশিয়া চারিদিকের চলাফেরা—আন্দোলন—কম্পনের সহিত এক হইয়া, সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায়, বালিকার চিরনিস্তব্ধ হৃদয় উপকূলের নিকট আসিয়া ভাঙিয়া পড়ে।" ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের 'রুথে'র সঙ্গে সুভার মিল লক্ষ্য করবার মতো:

"And she made a pipe of straw,
And music from that pipe could draw
Like sounds of winds and floods ;
Had built a bower upon the green,
As if she from her birth had been
An infant of the woods.
Beneath her father's roof, alone
She seemed to live ; her thoughts her own"—

তবু তার এই নিসর্গাশ্রয়ী আনন্দিত জীবন বেশিদিন রইল না, এল মানুষের ছলনা, রুথকে কেড়ে নিল তার সুখস্বর্গ থেকে—সব বীভৎস হয়ে গেল "entre les mains de l'homme।" ঠিক একই ট্র্যাজিডী ঘটল সুভার ক্ষেত্রে। সে ছিল, তার 'সর্বশী-পাঙ্গুলি' ছিল, বিড়াল শিশুটি ছিল, আর গোঁসাইদের অকর্মণ্য ছোট ছেলে প্রতাপও ছিল। "সুভা তেঁতুল তলায় বসিয়া থাকিত এবং প্রতাপ অনতিদূরে মাটিতে ছিপ ফেলিয়া জলের দিকে চাহিয়া থাকিত।" আর সুভা হয়তো স্বপ্ন দেখত, প্রতাপকে আশ্চর্য করবার জন্য অতল পাতালের প্রাসাদে, "রূপার অট্টালিকায়, সোনার পালঙ্কে" সে জলকন্যা হয়ে বসে আছে।

কিন্তু মানুষের জগতের নিয়ম আলাদা। "সুভার বয়স বাড়িয়া উঠিতেছে।" কিন্তু বোবা মেয়েকে কে বিয়ে করবে? মিথ্যার ছলনা দিয়ে তার বিবাহের ব্যবস্থা করা হল, সুভা যে "কাহাকেও প্রতারণা করে নাই," এ সত্য কেউ বুঝতেও চাইল না। তারপর স্বামীর পরিত্যাগ, আর "বালিকার চিরনীরব হৃদয়ের মধ্যে একটা অসীম অব্যক্ত ক্রন্দন বাজিতে লাগিল—অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহ তাহা শুনিতে পাইল না।"

প্রকৃতির সঙ্গে যে অভিন্নসত্ত্ব, প্রকৃতি থেকে বিচ্ছেদেই তার মৃত্যু। "ছুটি" গল্পের ফটিক চক্রবর্তীর ইতিহাস এরই আর

একদিক। "সুভা" আর "ছুটি" একই সময়ে লেখা, প্রথমটি মাঘে, পরেরটি আগের মাসে—অর্থাৎ পৌষে। প্রথম গল্পে সুভার হৃদয়-রহস্য মাঘের কুয়াশার আড়ালে লুকিয়ে রইল, কোনো সমবেদনার সূর্যালোক সেখানে পৌঁছুল না। আর পৌষের পাকা ফসলের ক্ষেতে যেখানে "মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি" হয়, সেই প্রকৃতির আনন্দ-ভোজের জগৎ থেকে ফটিককে কেড়ে আনা হল কলকাতার বন্দীশালায়—যেখানে জল-মাপার শব্দে ছুটির ডাক শুনতে শুনতে নবান্নের গন্ধভরা আকাশে হারিয়ে গেল ফটিক।

এই দুটি গল্পেই পল আর ভির্জিনির তত্ত্ব। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছেদ, ফলে আত্মিক মৃত্যু, কায়িক মৃত্যু। কিন্তু কায়িক মৃত্যু তবু একটা মুক্তি—তখন আর কোনো বাঁধন তাকে বাঁধবে না, বিরাট বিশ্ব তাকে বাহু মেলে নিজের ভেতর আশ্রয় দেবে, আর তার মানুষের হাতে বন্দী হওয়ার ভয় রইল না। তাই মহাসমুদ্র তার রুদ্র বাহুতে ভিরজিনিকে তুলে নিয়েছে—মৃত্যু এসেছে ফটিকের দরজা খুলে দিতে। লুসির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তো এই তত্ত্বই লাভ করেছিলেন। এই মৃত্যু-মুক্তিবোধ পরে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আরো পূর্ণতা পেয়েছে, 'ডাকঘরের' অমল ফটিকেরই সাংকেতিক রূপ।

সুভার ক্ষেত্রেও যদি এই মুক্তি ঘটত, আমরা হয়তো সুখীই হতাম।

"পোস্টমাস্টারে" প্রকৃতি যেন এক অমোঘ বিশ্বনীতির ভূমিকা নিয়েছে। সামাজিক পরিবেশে, শিক্ষা-দীক্ষায় যাদের কোথাও কোনো মিল নেই, তাদের দুটি জীবনকে প্রকৃতি এইভাবে মিলিয়ে দিল :

"পোস্ট মাস্টারের হাতে কাজ ছিল না—সেদিনকার বৃষ্টিধৌত মসৃণ চিক্কণ তরুপল্লবের হিল্লোল এবং পরাভূত বর্ষার ভগ্নাবশিষ্ট রৌদ্রশুভ্র স্তূপাকার মেঘস্তর বাস্তবিকই দেখিবার বিষয় ছিল;

পোস্টমাস্টার তাহা দেখিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন, এই সময়ে কাছে একটি-কেহ নিতান্ত আপনার লোক থাকিত—হৃদয়ের সহিত একান্ত সংলগ্ন একটি স্নেহপুত্তলি মানবমূর্তি। ক্রমে মনে হইতে লাগিল, সেই পাখি ওই কথাই বার বার বলিতেছে এবং এই জনহীন তরুচ্ছায়ানিমগ্ন মধ্যাহ্নের পল্লবমর্মরের অর্থও কতকটা ওইরূপ—”

প্রকৃতি সেই স্নেহ পুত্তলিকে কাছে নিয়ে এল, একটি ছোট মেয়ে রতনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু তার একটা নির্মম বিধান আছে। কোনো জিনিসকে সে ধরে রাখতে দেয় না, বর্ষায় যে মেঘ সে ভাসায়, শরতে সে মেঘকে সে ফিরিয়ে নিয়ে যায়; বসন্তের ফুলকে ধরে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা বৈশাখের দীর্ঘশ্বাসে উধাও হয়। তাই প্রাকৃতিক বিধানেই পোস্টমাস্টারকে চলে যেতে হল। তখন ‘যেতে নাহি দিব’ কবিতাটির মতো: “একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল।”

প্রকৃতি মিলন ঘটিয়েছিল—বিচ্ছেদও সেই আনল। জীবন এখানে নিমিত্তমাত্র। গল্পের শেষ পংক্তিতে একটি আশ্চর্য ইঙ্গিত আছে: “দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।” মাত্র দ্বিতীয়বার? বার বার। বসন্ত বারে বারে আসে, তার ফুলে মুকুলে দক্ষিণায় স্থায়িত্বের প্রত্যাশা জাগায়, তারপর কোকিলের কান্নার পথে আবার তার বিদায়। তবু এই ভ্রান্তিটুকুই জীবনের সম্বল—না হলে অরণ্য বহুদিন আগে শুকিয়ে যেত, রতনেরা বাঁচতেও পারত না।

নদীর খরস্রোতে পোস্টমাস্টারের নৌকো ভেসে চলে যাওয়ার মধ্যে গল্পের যে ইঙ্গিত নিহিত, সেটি যে কী, তা ‘ছিন্নপত্র’ থেকেই আমরা দেখতে পাই:

“বিদায়কালে এই নৌকো করে নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়ার মধ্যে যেন আরও একটু বেশি করুণা আছে। অনেকটা যেন

মৃত্যুর মতো—তীর থেকে প্রবাহে ভেসে যাওয়া; যারা দাঁড়িয়ে থাকে তারা আবার চোখ বুজে ফিরে যায়, যে ভেসে গেল সে অদৃশ্য হয়ে গেল। জানি, এই গভীর বেদনাটুকু, যারা রইল এবং যে গেল উভয়েই ভুলে যাবে, হয়তো এতক্ষণে অনেকটা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। বেদনাটুকু ক্ষণিক এবং বিস্মৃতিই চিরস্থায়ী, কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে এই বেদনাটুকুই বাস্তবিক সত্য, বিস্মৃতি সত্য নয়।” দ্বিতীয় ভ্রান্তিকে মেনে নিয়েও পোস্টমাস্টার এই বেদনারই কাহিনী।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ‘পোস্টমাস্টার’ নামে পুশ্‌কিনেরও একটি গল্প আছে। বিষয়ের দিক থেকে গল্পদুটির মধ্যে কোনো সাদৃশ্যই নেই—তবু কোথায় যেন একটু সম্পর্ক পাওয়া যায়। দুটিরই মূল 'কথা বিচ্ছেদ-বেদনা, পুশ্‌কিনের পোস্টমাস্টার কন্যা বিরহে অতিরিক্ত মদ্যপানে প্রায় আত্মহত্যা করেছে, রবীন্দ্রনাথের গল্পে মানুষের পরিবর্তে প্রকৃতি এসে রতন আর পোস্টমাস্টারকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

‘পোস্টমাস্টার’ রবীন্দ্রনাথের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের গল্প। সেদিন থেকে গল্পটির অন্যবিধ কৃতিত্বও লক্ষণীয়। প্রায় ঘটনাবিহীন, ইঙ্গিতধর্মী, ব্যঞ্জনাময় এই গল্প সে-কালের বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণই অভিনব। ‘পোস্টমাস্টার’ পড়তে গিয়ে মনে হয়, যেন সূত্রপাত ঘটিয়েই বাংলা ছোটগল্পকে রবীন্দ্রনাথ এক পরমতম সিদ্ধিতে পৌঁছে দিয়েছেন। গল্পের শেষাংশে লেখকের মন্তব্যগুলি হয়তো শিল্পরীতির দিক থেকে কিছু অতিরিক্ত; কিন্তু পথিকৃতের প্রতিবন্ধক কিছু থাকেই, তাতে তাঁর গৌরবের ব্যত্যয় ঘটে না।

রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় এক ‘নিত্যকালের বালকবীর’ আছে, যে চিরযাত্রিক, যে প্রকৃতির প্রাণসত্তার প্রতীক; প্রতিটি ঋতু যার ‘নবীন রক্তে জাগায় চঞ্চলতা—বলে, চলো চলো, অশ্ব তোমার আনো সে।’ এই প্রকৃতির প্রাণকে, এই Spirit of Nature-কে কখনো জোর

করে ধরে রাখা যায় না; স্নেহ-শাসন-প্রেম-বাধা কেউ তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না—"বসন্তের যাত্রা চলে অনন্তের পানে।" এই সত্তার মানবরূপ 'অতিথি' গল্পের তারাপদ।

ঋতুদের মতো—বর্ষা-শরৎ-বসন্তের মতো পৃথিবীতে তারাপদ অতিথি। সমস্ত গ্রামের সে "আদরের ছেলে", তাই কোনো আদরের বন্ধনেই সে ধরা দেয় না। "জন্মনক্ষত্র তাহাকে গৃহহীন করিয়া দিয়াছে।" "বহিঃপৃথিবীর স্নেহহীন স্বাধীনতা"র আনন্দে তারাপদ পৃথিবীর পথ বেয়ে চলেছে। সে সঙ্গীতমুগ্ধ—বিশ্বপ্রকৃতির মর্মে মর্মে রন্ধ্রে রন্ধ্রে এক অনবচ্ছিন্ন সঙ্গীত অরণ্য দেবতা প্যানের বাঁশির সুরের মতো তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যায়ঃ

"গাছের ঘন পল্লবের উপর যখন শ্রাবণের বৃষ্টিধারা পড়িত, আকাশে মেঘ ডাকিত, অরণ্যের ভিতর মাতৃহীন দৈত্য-শিশুর ন্যায় বাতাস ক্রন্দন করিতে থাকিত···নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে বহু দূর আকাশ হইতে চিলের ডাক, বর্ষার সন্ধ্যায় ভেকের কলরব, গভীর রাত্রে শৃগালের চীৎকারধ্বনি—সকলি তাহাকে উতলা করিত।"

সুতরাং কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিবাবুর সংসারকে কেন্দ্র করে জীবন যখন তাকে মোহিনী মায়ায় চারদিক থেকে বাঁধবার আয়োজন করেছিল, সেদিনও সে আর অপেক্ষা করতে পারল না। পুঞ্জীভূত অন্ধকারে ঝিল্লিমুখরিত অরণ্যের আন্দোলনে বর্ষার পরিস্ফীত নদীর কল্লোলে সে দেখলঃ "সম্মুখে আজ সমস্ত জগতের রথযাত্রা, চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে, গান উঠিয়াছে—"তখন সেই সঙ্গীতের আহ্বানে—সেই রথযাত্রার পথে "আসক্তিবিহীন উদাসীন" ঋতুমত্ত তারাপদও চিরকালের মতো অনন্তের পথে এগিয়ে গেল।

"জননী বিশ্বপৃথিবী"র বুকে হারিয়ে যাওয়ার এই আকুলতা রবীন্দ্র-মানসেরও একটি বিশিষ্ট প্রতিফলন। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার এই আর্তি আমরা 'বসুন্ধরা' কবিতাতেও শুনতে পাইঃ

"যাই পরশিয়া
স্বর্ণ শীর্ষে আনমিত শস্যক্ষেত্রতল
অঙ্গুলির আন্দোলনে ; নব পুষ্পদল
করি পূর্ণ সঙ্গোপনে সুবর্ণলেখায়
সুধা গন্ধে মধুবিন্দুভারে ; নীলিমায়
পরিব্যাপ্ত করি দিয়া মহাসিন্ধু নীর
তীরে তীরে করি নৃত্য স্তব্ধ ধরণীর
অনন্ত কল্লোল গীতে।......
......শুভ্র উত্তরীয়-প্রায়
শৈলশৃঙ্গে বিছাইয়া দিই আপনায়
নিষ্কলঙ্ক নীহারের উত্তুঙ্গ নির্জনে
নিঃশব্দ নিভৃতে।"

স্নিগ্ধ মধুর প্রেমের গল্প "সমাপ্তি"-তেও প্রকৃতি-রহস্যের আর এক সংকেত নিহিত। দুরন্ত চঞ্চল কিশোরী মৃন্ময়ী অপূর্ব প্রেমের সঙ্গে কিভাবে নারীত্বের মধ্যে জেগে উঠল, তার একটি সহজ সুন্দর কাহিনী অসামান্য মমতায় এই গল্পে বিবৃত হয়েছে। ঈশান মজুমদার, রাখাল, অপূর্বর মা, নৌকোর মাঝি—প্রতিটি পার্শ্বচরিত্রও অসাধারণ নিপুণতায় ফুটে উঠেছে। কিন্তু এই গল্পের বাণী আরো গভীরে নিহিত।

"চিত্রাঙ্গদা" নাটকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বসন্তের ফুল যদি নিদাঘের ফলে পরিণতি না পায়, তা হলে সেই পুষ্পসম্ভার ব্যর্থ। তাই যৌবনোৎসবপ্রমত্ত মধুযামিনীগুলির অবসান ঘটলে চিত্রাঙ্গদাকে নারীত্বে এবং মাতৃত্বে চরিতার্থ হতে হয়েছে। মৃন্ময়ীর মধ্যেও এই অপূর্ণতাই ছিল। "এই বালিকার মুখে চোখে একটি দুরন্ত অবাধ্য নারীপ্রকৃতি উন্মত্ত বেগবান অরণ্যমৃগের মতো সর্বদা দেখা দেয়, খেলা করে"—সে বসন্ত-পুষ্পিত নিসর্গ সত্তার স্বরূপ মাত্র। অপূর্ব-র প্রেম ধীরে ধীরে তাকে নারীত্বের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছে—বৈশাখী পূর্ণতায় সার্থক হয়েছে মৃন্ময়ী।

পরোক্ষভাবে, "সমাপ্তি" এই প্রকৃতি-লীলারই কাহিনী।

আর "এক রাত্রি"? বহু-আলোচিত এই অনুপম গল্পে প্রকৃতি কাহিনীর শেষে এক অনন্য ভূমিকায় আবির্ভূত। ব্যর্থ বঞ্চিত সেকেণ্ড মাস্টারের জীবনে একটি রাত্রির প্রলয়-মুহূর্ত তাকে চিরকালের পাথেয় দিয়ে গেছে। ঘনান্ধকার রাত্রি, একটি নির্জন দীঘির উঁচু পাড়ি, "পদতলে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ উন্মত্ত মৃত্যুস্রোত গর্জন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে", নির্বাক দুটি প্রাণী, কিছুক্ষণের জন্য অনন্ত মুহূর্তের উপলব্ধি—সব মিলে ব্রাউনিঙের কবিতার এক তীব্র গভীর স্বাদে আমাদের মন রসোজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

পাঠক হিসেবে, কখনো কখনো প্রশ্ন জেগেছে, রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের সঙ্গে পাশ্চাত্যের কোন্ লেখকের রচনা নিকট-নিহিত। হয়তো এডগার অ্যালান-পো কিছু প্রভাব ফেলেছেন, একজন তরুণ সমালোচক তাঁর আলোচনায় তা দেখিয়েছেন। চেখভের মতো করেও যে রবীন্দ্রনাথ সহজ-গভীর কাহিনী লিখতে পারতেন, বহু গল্পেই তার প্রমাণ আছে। হয়তো মোপাসাঁর কথাও মনে পড়বে। কিন্তু গল্পকার রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রকৃতি এবং জীবনের যে সম্মিলিত দ্বিস্বর-ধ্বনিত, তার সঙ্গে সব চাইতে বেশি সাদৃশ্য আছে আলফঁস দোদে (Alphonse Daudet)-র। সেই অদ্বিতীয় ফরাসী কথাশিল্পী, যাঁর সৃষ্টির পরিমাণ সামান্য অথচ অপসৃষ্টি যাঁর একটিও নেই।

"এক রাত্রি" পড়তে গিয়ে দোদের "নক্ষত্রেরা" (Les Etoiles) গল্পটিকে অনিবার্য ভাবেই স্মরণ করতে হয়। গল্পের নায়ক এক তরুণ রাখাল, বছরের একটা দীর্ঘ সময় যে পার্বত্য উপত্যকায়, মাত্র একটি কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে, পরিপূর্ণ একাকীত্বে বাস করে। মনিবের ভেড়ার পাল চরায় সেখানে। আর সন্ধ্যা নামলে তার নিঃসঙ্গতায় বসে বসে সে একটি মেয়ের কথা ভাবে—যার নাম স্তেপান্যাৎ। স্তেপান্যাৎ তার মনিবকন্যা, সুন্দরী, বিলাসিনী, তার দরিদ্র জীবনের

উপান্ত থেকে যে আকাশের নক্ষত্রের মতো সুদূর। রাখালের স্বপ্নলোকে সে রূপকথার রাজনন্দিনী।

ঘটনাচক্রে একদিন এই স্তেপান্যাৎ এসে নির্জন পাহাড়ের সেই উপত্যকায় আটকে পড়ল। আশঙ্কা, দুঃখ আর কান্নার পালা শেষ হলে খানিকটা শান্ত হল স্তেপান্যাৎ, একটা রাত—অন্তত পাহাড়ী নদীর আকস্মিক জলোচ্ছ্বাস শান্ত না হওয়া পর্যন্ত এখানেই যে ভাবে হোক কাটাতে হবে, এই ভাগ্যকে নিরুপায় ভাবে স্বীকার করে নিল সে। আর রাখাল? তার জীবনে এল এক পরম রাত্রি।

আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে পাশাপাশি বসে আছে দু'জন। রাখালের মুখে তারাদের কিংবদন্তী শুনছে স্তেপান্যাৎ। তারাদেরও বিয়ে হয়? কী আশ্চর্য!

রাত্রি—সে অপরূপ। "দিনের আলো? সে তো প্রাণীদের জীবন। রাত্রি? তখন বস্তুরা প্রাণ পেয়ে ওঠে (Le jour, c'est la vie des êtres ; mais la nuit, c'est la vie des choses.)।" এমনি করেই "এক রাত্রি"তে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল "কৃষ্ণবর্ণ গাঢ় মৃত্যুস্রোত"—আর আজ বেঁচে উঠল চিরন্তনের প্রহরী আকাশের তারারা।

তারার গল্প শুনতে শুনতে—সেই সুদূর লোকের স্তেপান্যাৎ—রাখালের মনের আকাশে যে স্বপ্নের তারা হয়ে আছে, সে ধীরে ধীরে রাখালের কাঁধেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। সেই পবিত্র রাত্রে, পবিত্র চিন্তাকে হৃদয়ের প্রহরী করে রেখে রাখাল অনুভব করতে লাগল: "Autour de nous, les étoiles continuaient leur marche silencieuse, dociles comme un grand troupeau, et par moment Je me figurais qu'une de ces étoiles, la plus fine, la plus brillante, ayant perdu sa route, était venue se poser sur mon epaule pour dormir."

"মস্ত এক পাল শান্ত ভেড়ার মতো আমাদের ঘিরে নিঃশব্দে প্রদক্ষিণ

করতে লাগল তারারা, সেই মুহূর্তে আমার মনে হল—ওদেরই একটা তারা—অনেক বেশি সুন্দর, অনেক বেশি উজ্জ্বল, নিজের পথ হারিয়ে ফেলে, আমার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমোবার জন্যে চলে এসেছে।”

এই রাত প্রভাত হবে, যেমন করে সুরবালা দুর্যোগের অবসানে নিজের ঘরে ফিরে গিয়েছিল, তেমনি করে স্তেপান্যাৎও ফিরে যাবে তার সামাজিক দূরত্বের জগতে ; রাত্রের পথ-হারানো নক্ষত্র আবার উত্থিত হবে তার দূর আকাশের অয়ন-চক্রে। শুধু নিঃসঙ্গ রাখালের জীবন-পাত্রটিকে সে এক রাত্রের মাধুর্য দিয়ে ভরে রেখে গেল, সেই মধুস্বাদ তার সমস্ত জীবনের সঞ্চয় হয়ে রইল।

॥ পাঁচ ॥

মানস-ধর্মে রবীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ রোম্যান্টিক। এই রোমান্স সব চেয়ে চড়া পর্দায় উঠেছে “ক্ষুধিত পাষাণ,” “মহামায়া” আর “দুরাশায়”। প্রথম গল্পটি কিছুদিন আগে চলচ্চিত্রায়িত হয়ে অর্থকরী সাফল্যের একটি রেকর্ড করেছে—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মর্যাদা রক্ষা করেছে বলে মনে হয় না। এটি ভৌতিক গল্প নয়—ভৌতিক গল্প একটিও তিনি রচনা করেন নি। অতি-মাত্রার মানসিক স্পর্শাতুরতা এবং পরিবেশ-প্রভাবই “ক্ষুধিত পাষাণ” “মণিহারা”, এবং “নিশীথে”র সৃষ্টি-উৎস। ‘ক্ষুধিত পাষাণে’ আরালী পর্বতের বিবিক্ত প্রেক্ষাভূমি, শ্বেত পাথরের জনহীন বিশাল প্রাসাদ এবং হিংস্র উন্মত্ত বিলাস সম্ভোগের স্মৃতি, তুলার মাশুল-কালেক্টারের মনে যে “বস্তু থেকে সত্যতর” মায়ার সৃষ্টি করেছে—সেইটিই এই গল্পের প্রধান ঐশ্বর্য। এই মায়া যাতে কিছুতেই না ভাঙে—সেইজন্য একটি বাস্তব কাহিনীর রেখাবৃত্ত পড়বার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে প্রথম শ্রেণীর

শিল্পীর মতোই গল্পটি লেখক শেষ করে দিয়েছেন—আরবের মরুভূমিতে ঘোড়া ছুটিয়ে নায়ককে "জাতিস্মর" করবার প্রয়োজন অনুভব করেন নি।

'ক্ষুধিত পাষাণ' প্রসঙ্গে দু-একটি বিদেশী গল্প স্মরণে আসে। মেরিমের 'ভেনুস্য দিল' (La Venus d'Ille)-ও তাঁর প্রিয়তমকে খুঁজতে বেরিয়েছে, কিন্তু আলিঙ্গনপিষ্ট নায়কের মৃত্যু এই গল্পে গভীর রোমান্টিক আবেদন নিয়ে আসে না—সর্বাঙ্গে এক বীভৎস ভীতির শিহরণ জাগায়; এই ভেনাস 'ক্ষুধিত পাষাণে'র চির বেদনাময়ী অশরীরী নায়িকা নয়—এর মধ্যে একটা নিদারুণ নিষ্ঠুরতা আছে। এ-ই কপার্ডের 'The King of thc World' মনে আসে, সেই গল্পের নায়ক একজন অ্যাসিরীয়ান ক্যাপ্‌টেন মরুভূমির বুকে দুরন্ত সাইমুমের পর আবিষ্কার করেছিল দূর ইতিহাসের পরপারে অবলুপ্ত প্রেমের দেবতা 'নামু-সারকন' (Namu-Sarkkon)—এর মন্দির; সেই মন্দিরে শিলীভূত হয়ে অপেক্ষা করছিল তার নায়িকা যার প্রেমের স্পর্শে নায়ক শেষ পর্যন্ত চলে গেল ইতিহাসের যুগান্তে, মরুভূমির বালিতে মিশে অনন্তে বিলীন হল। মনে আসে অলিভার অনিয়ন্‌সের সেই দুঃস্বপ্নভরা গল্প—"The Beckoning Fair one" —এক অলক্ষ্য নায়িকার প্রেত-সঞ্চার যেখানে শেষ পর্যন্ত দারুণতম মৃত্যু বিভীষিকার পরিণতি আনে।

"ক্ষুধিত পাষাণ" ঠিক এদের কারুর মতোই নয়।

এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল। বক্তব্য কী? অতিরিক্ত স্পর্শকাতর একটি মানুষ ইতিহাসের স্মৃতিজড়িত এক নির্জন প্রাসাদে অপরূপ কোনো মোহের ইন্দ্রজালে বাঁধা পড়েছিল। যেন মৃত্যুর যবনিকা তুলে এসে দাঁড়িয়েছিল এক ক্ষুধিত আত্মা, যে প্রার্থনা করেছিল: "তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও—কঠিন মায়া, গভীর নিদ্রা, নিষ্ফল স্বপ্নের সমস্ত দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া ......আমাকে উদ্ধার করো!"

কিন্তু ইতিহাসকে উদ্ধার করা যায় না; মিশরের মরুভূমিতে যতই দীর্ঘশ্বাস পড়ুক, 'নীলনদের নাগিনী' ক্লিওপাত্রা আর আবির্ভূত হবে না; স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীতে পৌঁছে কবি যখন জন্ম-জন্মান্তরের মালবিকার মুখোমুখি দাঁড়ান—তখন দেখা যায় দুজনের ভাষাই বিস্মৃত। পাগলা মেহের আলীর মুখ দিয়ে তাই বার বার শোনানো হয়—"সব ঝুট্ হ্যায়।" আর সমস্ত গল্পটি একটি পরিপূর্ণ সঙ্গীত হয়ে ওঠে।

"পাথর বাঁধানো দেড়শত সোপান", "বনতুলসী, পুদিনা আর মৌরির জঙ্গল" থেকে ঘনগন্ধবহ বাতাস, পাহাড়ের চূড়োয় নিঃসঙ্গ তারাটি—প্রত্যেকেই সেই সঙ্গীতে এক একটি বাদ্যযন্ত্র। সর্বোপরি গল্পটির ভাষা। এই ভাষা যেন সেই প্রাচীর প্রাসাদের জালির কাজের মতো. মিনার সূক্ষ্ম কারুকার্যের মতোই অপরূপ। এই ভাষা একাধারে সুর এবং চিত্র—গল্পটির উপযুক্ত পরিবাহ। গান শেষ হয়—সুরের মায়া মিলিয়ে যায়, অথচ মনের ওপর থেকে মোহের আবরণ সরে যেতে চায় না—ক্ষুধিত পাষাণের এইটিই ফলশ্রুতি।

ক্ষুধিত পাষাণ কেন ভৌতিক গল্প নয়, সেই প্রসঙ্গে একটি বিদেশী গল্পের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। অতিলৌকিক গল্পের অসাধারণ স্রষ্টা অ্যাল্জারনন ব্ল্যাকউডের 'The Glamour of the Snow' গল্পটিও এক অনন্য পরিবেশে গড়ে উঠেছে। গল্পের নায়ক হিবার্ট একজন ইংরেজ লেখক, মেজাজে রোম্যান্টিক। ফ্রেঞ্চ আল্প্‌সের একটি সুদূর অঞ্চলে সে গিয়েছিল নিভৃতে তার উপন্যাসটি শেষ করতে—আর তুষারের উদার-দাক্ষিণ্য ছড়ানো পাহাড়ের ঢালে স্কেটিং করতে।

সেইখানে, নিঃসঙ্গ শীতের রাত্রে, জ্যোৎস্নার আলোয়, যখন চার্চের ঘণ্টা আর শোনা যায় না, তখন রিংকের তুষারশয্যার ভেতরে একা স্কেটিং করতে করতে হিবার্ট দেখল তার সঙ্গিনী হয়েছে এক রহস্যময়ী সুন্দরী। এই সুন্দরী প্রকৃতির শক্তি—সাক্ষাৎ মৃত্যু।

এরই আকর্ষণে—মধ্যরাতের চন্দ্রালোক, শীতলতম বাতাস আর পুঞ্জ পুঞ্জ তুষারের ভেতর দিয়ে হিবার্ট চলল ঊর্ধ্ব থেকে আরো ঊর্ধ্বে—আল্‌প্‌সের যে ভয়ঙ্কর দুর্গমতায় স্কেটিং করবার কথা কোনো পাগলেও ভাবতে পারে না। সেইখানে প্রকৃতিরূপা মৃত্যু তাকে গ্রাস করতে লাগল তুষারের অসহ আলিঙ্গনে—যেখানে চার্চের ঘণ্টা বাজেনা—যেখানে ঈশ্বরের স্পর্শ কোনোদিনই এসে পৌঁছোয় না।

সেই রহস্যময়ী নারীর আহ্বান, অপরূপ বর্ণনা, ভাষার কাব্যময় সৌন্দর্য—সব মিলে 'ক্ষুধিত পাষাণে'র মতোই এক গভীর মদির উপলব্ধি আমাদের আচ্ছন্ন করে। তবু এ গল্প রোম্যান্টিক নয়—প্রেতলৌকিক। গীর্জা এবং ঈশ্বরের প্রভাবে হিবার্টের মুক্তি—নিঃসন্দেহে গল্পকে ক্রীশ্চান প্রেত-প্রত্যয়ে পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু 'ক্ষুধিত পাষাণে'র সমস্ত উপলব্ধিই স্বপ্ন আর মায়া দিয়ে গড়া—নায়কের ললাটে এক ফোঁটা চোখের জল পড়বার সঙ্গে সঙ্গে লেখক স্মরণ করিয়ে দেন, আরালী পর্বতের চূড়োয় মেঘ ঘনিয়েছে। হিবার্টের গল্পের নারীটি এসেছে বাইরের প্রাকৃতিক শক্তি থেকে—আর ক্ষুধিত পাষাণের আত্মাটি লেখকের মানস-সঞ্জাতা—পরিবেশ তাকে পূর্ণতা দিয়েছে মাত্র।

ঠিক এই কারণেই 'নিশীথে' এবং 'মণিহারা' চড়া পর্দার রোম্যান্টিক গল্প হয়ে উঠেছে। 'নিশীথে' দক্ষিণচরণের অপরাধ বোধ এবং হীনম্মন্যতার ফল, 'মণিহারা' ফণিভূষণের উদগ্র কামনারই প্রতিফলন। দ্বিতীয় গল্পটির শেষে কিছু ভৌতিক আমেজ থাকলেও ফণিভূষণের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণেই এই ভৌতিকতার আবরণ সম্পূর্ণ ভেঙে যায়। এগুলিকে রোম্যান্টিক্ গল্প হিসেবে গ্রহণ করাই সব চাইতে সমীচীন।

রোম্যান্টিকতার আর একদিক "মহামায়া"। রোমান্স-সৃষ্টির একটি প্রধান উপকরণ কালগত দূরত্ব রচনা করা—যার ফলে পাঠকের মন আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকে—তাকে সহজেই

গল্পটির মধ্যে আকর্ষণ করে নেওয়া যায়। 'ক্ষুধিত পাষাণে' এই ঐতিহাসিক দূরত্ব আমরা দেখতে পাই। রাজীব এবং মহামায়ার এই বিচিত্র কাহিনীটিও তাই সেই পটভূমিতেই কল্পিত হয়েছে—যেখানে কৌলীন্য এবং সহমরণ প্রথা তার নিষ্ঠুর নগ্নমূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

চিতা থেকে উঠে এসে মহামায়া মিলিত হল রাজীবের জীবনে। কিন্তু মহামায়ার মুখে কঠিন নিষেধের মতো এক অবগুণ্ঠন—যা প্রতি মুহূর্তে রাজীবের স্নায়ুকে ছিন্ন-দীর্ণ করে দিচ্ছে, অথচ যে অবগুণ্ঠন সরাবার কিছুমাত্র শক্তি বা সাহস তার নেই। এ যেন কিউপিড্ আর সাইকির পৌরাণিক গল্পের আর এক দিক। প্রতি রাত্রে মিলন, অথচ কোনোদিন কিউপিডের মুখ দেখতে পাবে না, এই ভাবনা অসহ্য হয়ে উঠেছিল সাইকির। শেষ পর্যন্ত সে আর সইতে পারল না, একদিন ঘুমন্ত কিউপিডের মুখে মোমের আলো পড়ল—সাইকির মুগ্ধ অনিমেষ চোখ বুঝতে পারল না, কী সর্বনাশ সে ডেকে আনছে—কিউপিডকে সে হারালো। এ ক্ষেত্রেও এই ট্র্যাজিডী ঘনিয়ে এল। চির-সহিষ্ণু রাজীবেরও অসহ্য হয়ে উঠল একদিন, ঘুমন্ত মহামায়ার মুখের ওপর থেকে আবরণ দিল সরিয়ে—দেখল সেই অপূর্ব আগ্নেয় সৌন্দর্য আর নেই :—"চিতানল শিখা তাহার নিষ্ঠুর লেলিহ রসনায় মহামায়ার বামগণ্ড হইতে কিয়দংশ সৌন্দর্য একেবারে লেহন করিয়া লইয়া আপনার ক্ষুধার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে"।

মহামায়া জেগে উঠল। তারপর তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। "সেই ক্ষমাহীন চিরবিদায়ের নীরব ক্রোধানল রাজীবের সমস্ত ইহজীবনে একটি সুদীর্ঘ দগ্ধচিহ্ন রাখিয়া দিয়া গেল"।

মহামায়ার এই উজ্জ্বল ভয়ঙ্কর অক্ষমার মধ্যে যে-পরিমাণে রোম্যান্টিক কল্পনা আছে, সে পরিমাণে বাস্তবতা নেই। রাজীব এবং মহামায়ার প্রেমের মধ্যে যদি কোনো সত্য থাকত, তাহ'লে

এই অবগুণ্ঠন অনেক আগেই সরে যেত। বিশেষ করে রাজীবের মতো শান্ত ভীরু ব্যক্তিত্বটি রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায় "ভালো মন্দ সুখদুঃখ মিলায়ে সকলি" মহামায়াকে জীবনে স্বীকার করে নিত। কিন্তু মহামায়ার উগ্র আত্ম-সচেতনা—চিরকাল যে রাজীবের পুজো নিয়েছে সে কখনো তার করুণার কাছে নত হবে না, এই মনস্তত্বই গল্পটিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং সম্ভাব্য জীবনধর্মের কাছ থেকে সরে গিয়ে পরিণামে বিশুদ্ধ রোম্যান্টিকতায় আশ্রিত হয়েছে।

"দুরাশাও" এই রকম রোম্যান্টিকতা-নির্ভর। ক্ষুধিত পাষাণের মতোই এটিও রবীন্দ্রনাথের একটি সেরা গল্প। সমারসেট মম এই গল্পের কোনো ইংরেজী অনুবাদ পড়ে "Red" গল্পটি লেখায় প্রবুদ্ধ হয়েছিলেন কিনা বলা যায় না।

মমের গল্পের কথক, চিত্তজিৎ নায়ক রেড্‌কে দেখবার জন্যে আকুল চিত্তে বৎসরের পর বৎসর অপেক্ষা করেছে। শেষ পর্যন্ত একটা বিকট চেহারার মাতাল নাবিক যখন নিজেকে রেড্ বলে আত্ম-পরিচয় দিল, তখন সমস্ত কাহিনীটিরই কী সকরুণ মোহভঙ্গ ঘটেছে। লোকটির এতদিনের আকুল প্রতীক্ষা কী শূন্যতাতেই হারিয়ে গেল!

'দুরাশা'কেও সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিতে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে রোমান্সের পরিমণ্ডলটি রচনা করা হয়েছে। তারপর কেশরলালের প্রত্যাখ্যান, নবাব কন্যার তপস্যা এবং শেষ পর্যন্ত নিদারুণ মোহ-ভঙ্গের আঘাত গল্পটিকে ট্র্যাজিক পরিণতি দিয়েছে। গল্পটি অতি বিখ্যাত, কোনো কোনো সমালোচকের মতে, রবীন্দ্রনাথের তিনটি সেরা গল্পের অন্যতম। নাটকীয় সূচনায়, ঐতিহাসিক পরিবেশ রচনার নৈপুণ্যে, অপূর্ব বর্ণনা-ভঙ্গিতে, অসাধারণ চরিত্রের সমাবেশে, চমৎকার ঘাত-প্রতিঘাতে এবং পরিণামের নিদারুণ 'আয়রনি'-তে, সন্দেহ নেই—এটি রবীন্দ্রনাথের একটি প্রধান-রচনা। গল্প শেষ হওয়ার পরেও এর রেশ পাঠককে অভিভূত করে রাখে। মনে হয়,

জনশূন্য ক্যাল্‌কাটা রোডের প্রভাতী কুয়াশার আবরণে যে অবাস্তব মায়ালোক সৃষ্টি হয়েছিল, সূর্যোদয়ের তীক্ষ্ণ আঘাতে তা আবার মায়াতেই মিশিয়ে গেল।

তবু এই গল্প সম্পর্কে প্রশ্ন থাকে। এর ট্র্যাজেডী যতটা রোম্যান্টিকতা-সম্ভব, সে পরিণামে জীবনসিদ্ধ নয়। দীর্ঘদিনের তপস্যা, কৃচ্ছ্রসাধন—তিলে তিলে আত্মনিগ্রহ—এই মেয়েটিকে স্বাভাবিক নিয়মেই ক্রমশ নির্মোহ এবং নিরাসক্ত করে আনত—প্রথম যৌবনের শ্রদ্ধামিশ্রিত অত্যুগ্র প্যাশান অনেক আগেই স্তিমিত হয়ে যেত, জীবনের শেষ পর্বে "সেলাম বাবু সাহেব" বলে তাকে আর ভ্রম-সংশোধন করতে হত না। এই গল্পে নবাব-কন্যার স্বাভাবিক মানস-বিকাশ ঘটেনি—তা যদি ঘটত, তা হলে ধর্ম সাধনার শক্তিতে, মোহমুক্তির প্রশান্তিতে অনেক আগেই কেশরলাল অনাবশ্যক হয়ে যেত।

সুতরাং গল্পটির ভিত্তিতে একটি রোম্যান্টিক আইডিয়াই বিদ্যমান—তারই ওপর কল্পনার ফুল ফুটিয়েছেন লেখক। এ যেন নায়িকার স্বপ্নঘোরে পথচলার কাহিনী। এখানেও সেই "বস্তু হতে সত্যতর" মায়ারই রূপায়ণ—গল্পের উৎকর্ষও তারই ওপরে নির্ভর করে আছে।

রাজনৈতিকরূপে কয়েকটি গল্পকে চিহ্নিত করেছি বটে, কিন্তু ঠিক রাজনীতি-নির্ভর এদের বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ স্বাদেশিক (ইংরেজীমতে কখনোই ন্যাশনালিস্ট নন—সে বস্তুটির তিনি চিরবিরোধী), এই স্বাদেশিকতার মূল ভারতীয় ভাব-ধারণার গভীরে নিহিত। "পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব তোমার উত্তরীয়"—এ তাঁরই সংকল্প-বাক্য; কিন্তু দেশের চলিত রাজনীতির কার্যক্রমের সঙ্গে

বারে বারে তাঁর বিরোধ ঘটেছে। তাঁর বক্তব্য অনুসারে জীবন সমস্ত রাজনৈতিক আলোড়নের উর্ধ্বে—সেই জীবনের পূর্ণ মূল্য দিয়েই মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সম্ভব হতে পারে। এই কারণেই "এক রাত্রি"র নায়ককে "ভারত উদ্ধারের" ক্ষেত্রে কটাক্ষ করা হয়েছে, নিখিলেশ বিমলার ভাবদ্বন্দ্ব হিউম্যানিজমের বিস্তৃতির মধ্যে মুক্তি পেয়েছে, বাংলাদেশের বিপ্লবী আন্দোলনকে সম্পূর্ণ অপব্যাখ্যা করে অতীন আর এলার ট্র্যাজিডীকে টেনে আনা হয়েছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্পূর্ণ চেনা যাবে "মেঘ ও রৌদ্র" গল্পে। অতিবিস্তারের ফলে এই গল্পটির ভারসাম্য থাকেনি, বক্তব্য হয়েছে দ্বিধাগ্রস্ত এবং শিল্পগত "ইউনিটি"ও রক্ষিত হয়নি। প্রকৃতির বুকে মেঘ আর রৌদ্রের খেলার মতো শশিভূষণ আর গিরিবালার মধ্যে যে সম্পর্কটি গড়ে উঠেছিল (ঠিক প্রেম বলা যায় কি?), সেই আলোছায়ার দোলাটুকুই যে জীবনের সবচাইতে বড়ো সঞ্চয়—সে কথা গল্পের নায়ক শশিভূষণ ভুলে গিয়েছিলেন। বাইরের ক্ষীণ দৃষ্টির মতো তাঁর মনের দৃষ্টিও ছিল নিষ্প্রভ, তাই 'এক রাত্রি'র নায়কের মতোই এই সহজ প্রাপ্তিটুকুকে তুচ্ছ করে তিনিও ছুটে ছিলেন কর্তব্যের দুঃসাধ্য সাধনায়। তারপর জেল থেকে যখন প্রায় অন্ধ হয়ে নিঃসঙ্গ, রিক্ত, হতাশ শশিভূষণ বেরিয়ে এলেন, তখন বিধবা গিরিবালার শুভ্র-শুচি বেদনাটিই তাঁকে বরণ করে নিলে:

"এসো এসো ফিরে এসো—নাথ হে ফিরে এসো!
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত
বঁধু হে ফিরে এসো।
ওগো নিষ্ঠুর ফিরে এসো হে,
আমার করুণ কোমল এসো....
···আমার সব-সুখ-দুঃখ-মন্থন-ধন
অন্তরে ফিরে এসো।"

এই গল্পে আমলাতান্ত্রিক, ইংরেজের মদমত্ত বর্বরতাকে চূড়ান্ত

ধিক্কারে জর্জরিত করা হয়েছে, দাসমনোবৃত্তির তাড়নায় মেরুদণ্ডহীন দেশবাসীও সেই মহৎ ক্রোধের আঘাত থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। কিন্তু গল্পের গতি সেদিকে অগ্রসর হয় নি। "ছিন্নপত্রে" এই গল্পটির জন্মলগ্ন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: "আজ সকাল বেলায় তাই গিরিবালানাম্নী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি ছোট অভিমানিনী মেয়েকে আমার কল্পনার রাজ্যে অবতারণা করা গেছে। সবে মাত্র পাঁচটি লাইন লিখেছি এবং সে পাঁচটি লাইনে কেবল এই কথা বলেছি যে, কাল বৃষ্টি হয়ে গেছে, আজ বর্ষণ অন্তে চঞ্চল মেঘ এবং চঞ্চল রৌদ্রের পরস্পর শিকার চলছে—হেনকালে পূর্বসঞ্চিত বিন্দু বিন্দু শীকরবর্ষী তরুতলে গ্রামপথে উক্ত গিরিবালার আসা উচিত ছিল, তা না হয়ে আমার বোটে আমলাবর্গে"র আগমন যেমন লেখকের অবাঞ্ছিত, তেমনি শশিভূষণের জীবনে বহির্জগতের বৃহৎ কর্মের আহ্বানও রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগেনি।

"মেঘ ও রৌদ্রে"র যে সমাধান টানা হয়েছে, তা পাঠকের মনকে কতখানি তৃপ্ত করবে বলা কঠিন। এই সিদ্ধান্ত কিন্তু সমগ্রভাবে রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিমিশ্র কথা-সাহিত্যের সর্বত্রই লক্ষণীয়। পরে এ সম্বন্ধে আরো কিছু আলোচনা করা যাবে।

"দুর্বুদ্ধি" দেশী আমলাতন্ত্রের হৃদয়হীনতা এবং নির্লজ্জ লোভের এক ভয়ঙ্কর কাহিনী। অসাধারণ বলিষ্ঠ এই গল্প—অপূর্ব বাস্তব। দারোগা এবং ডাক্তারের যে পাপচক্র এই গল্পে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে শোষিত অবমানিত জনসাধারণের বেদনা যে ভাবে এর মধ্যে উপস্থাপিত করা হয়েছে—রবীন্দ্রনাথের আর কোনো ছোটগল্পে তা দেখা যায় নি। আগেও বলেছি, "মাঝে মাঝে গেছি আমি ও-পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে" কিন্তু ভেতরে প্রবেশ না করতে পারার যে স্বীকারোক্তি আধুনিক কালের কাছে তিনি উপস্থিত করেছিলেন তার মধ্যে সম্পূর্ণ সত্য নেই। "দুর্বুদ্ধি"ই তার অন্যতম প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং প্রায়-অপঠিত গল্পটি সত্যাশ্রয়ী

সৎসাহসী রবীন্দ্রনাথকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। আমলাতান্ত্রিক অত্যাচারের কী ভয়ঙ্কর বিবরণ নীচের এই উদ্ধৃতির মধ্যে লভ্য!

"সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া দেখি তখনো লোকটা অভিভূতের মতো বসিয়া আছে, কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে পারে না, মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। এখন তাহার কাছে এই নদী, ঐ গ্রাম, ঐ থানা, এই মেঘাচ্ছন্ন আর্দ্র পঙ্কিল পৃথিবীটা স্বপ্নের মতো। বারংবার প্রশ্নের দ্বারা জানিলাম, একজন কন্‌স্টেবল্ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ট্যাঁকে কিছু আছে কিনা। সে উত্তর করিয়াছিল, সে নিতান্তই গরীব, তাহার কিছুই নাই। কন্‌স্টেবল্ বলিয়া গেছে, থাক্ বেটা তবে এখন বসিয়া থাক্।"

সর্পাঘাতে মৃতা কন্যাকে দাহ করবার জন্যে পুলিশের অনুমতি নিতে এসে নিঃস্ব দরিদ্র পিতার এই দুঃসহ দুর্গতি। সামনে কন্যার শব পড়ে আছে—সারাদিন অনাহার, মাথার উপর রৌদ্র-বৃষ্টি—সব মিলে কী নিদারুণ যন্ত্রণার ছবি আব মানুষের লোভের কী বীভৎস উদ্‌ঘাটন!

অন্যায়ের প্রতি মহত্তম ঘৃণা যদি শ্রেষ্ঠ শিল্পীর অন্যতম ধর্ম হয়, তা হলে 'দুর্বুদ্ধি' গল্পে সেই পবিত্র ঘৃণার তীব্র নীল শিখার উদ্ভাস। এমন কঠোর রিয়ালিস্টিক গল্প সমকালে অকল্পনীয়—উত্তরকালেও সুদুর্লভ। তিক্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া এ গল্প লেখাই সম্ভব নয়। মাত্র এই গল্পটির জন্যেই কবির কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

"রাজটীকা" গল্পটি কিছুটা কৌতুকভিত্তিক হয়েও স্বাদেশিকতায় অনুপ্রাণিত। ঠাকুরবাড়ীর জাতীয়তাবাদের বিশিষ্ট মনোভঙ্গিটি এই গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে।

অন্যান্য বিচিত্র রসের গল্পগুলির মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় "কঙ্কাল" এবং "গিন্নী"। প্রথম গল্পটিতে একটুখানি অতিলৌকিক মুখবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছে বটে, কিন্তু এটি নারীর ব্যর্থ প্রেম

এবং প্রতিহিংসার একটি দারুণ কাহিনী। কামনা এবং তার হিংস্র পরিণতির এই ধরণের প্রখর গল্প রবীন্দ্রনাথ খুব বেশি লেখেন নি। "কঙ্কালে"র নায়িকা "চোখের বালি"র বিনোদিনীতে খানিকটা আভাসিত হয়েছে, হয়তো "বউঠাকুরাণীর হাটে"ও রুক্মিণীর চরিত্রে এর সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু গল্পের ক্ষেত্রে এই নায়িকা অনন্যা।

বালবিধবা এই মেয়েটি মহামায়ার মতোই নিজের রূপ সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন ছিল। "আমি যখন চলিতাম, তখন আপনি বুঝিতে পারিতাম যে, একখণ্ড হীরা নড়াইলে তাহার চারিদিক হইতে যেমন আলো ঝক্‌মক্ করিয়া উঠে, আমার দেহের প্রত্যেক গতিতে তেমনি সৌন্দর্যের ভঙ্গি নানা স্বাভাবিক হিল্লোলে চারিদিকে ভাঙিয়া পড়িত। আমি মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ ধরিয়া নিজের দুখানি হাত নিজে দেখিতাম—পৃথিবীর সমস্ত উদ্ধত পৌরুষের মুখে রাশ লাগাইয়া মধুরভাবে বাগাইয়া ধরিতে পারে, এমন দুইখানি হাত—"

এই রূপের আলোয় জ্বলতে এল এক মুগ্ধ পতঙ্গ, নায়িকার দাদার বন্ধু ডাক্তার শশিশেখর। যে সমাজে বালবিধবার পুনর্বিবাহের প্রচলন ছিল না, হয়তো যখন নায়িকা এবং শশিশেখরের মধ্যে বর্ণগত পার্থক্যও ছিল—সেই সমাজে, সেই কালে এই প্রেমের ব্যর্থতা ছাড়া আর কি পরিণতি সম্ভব? কিন্তু "কঙ্কালে"র নায়িকা মহামায়ার মতো আত্মসচেতন হলেও—আত্মমর্যাদায় দীপিত ছিল না; তার কামনা বাঘিনীর মতো ক্ষমাহীন—'আমি যদি না-ই পাই, আর কাউকেই পেতে দেব না।' ফল, বিবাহের দিনে শশিশেখরের মদের গ্লাসে বিষ মেশানো, এবং আত্মহত্যা! এ সেই ভয়ঙ্কর আর্টিমিস—যে প্রবঞ্চক প্রণয়ীর ঘুমন্ত বক্ষে বসে বজ্রনখরে তার দুই চোখ উপড়ে নিয়ে আত্মবিনাশ ঘটিয়েছিল।

নার্সিসিজম এবং তার ওপর আঘাতের সঙ্গে যদি তীব্র কামনার যন্ত্রণা মেশানো থাকে, তা হলে তা কতদূরে নিয়ে যেতে পারে,

"কঙ্কাল" তারই উদাহরণ। এই গল্পে লেখকের শক্তির প্রবল প্রকাশ ঘটেছে বটে, তবু একে রবীন্দ্রনাথের প্রতিনিধি গল্প বলা যায় না। এই চিন্তা-চেতনার সঙ্গে তাঁর শিল্প চেতনার মিল নেই—এ গল্প যেন গী-দ্য মোপাঁসার হাতেই ভালো খুলত!

"গিন্নী" আরো সার্থক সৃষ্টি। আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে লেখা এই ছোটগল্পটি এ-যুগের পথেও অসাধারণ আধুনিক। কী তুচ্ছ বিষয়ের মধ্যে জীবনের কতখানি গভীরতাকে আভাসিত করা যায়—এই গল্পেই তার প্রমাণ। পড়তে পড়তে প্রসঙ্গত মোপাসঁার "মাদ্‌মোয়াজ্যাল" মনে আসে, কিন্তু শেষাংশে যৌনতার প্রক্ষেপে ফরাসী গল্পটি রুচি হারিয়েছে। অনেক অল্প উপকরণে 'গিন্নী' তার চাইতে অনেক উঁচু দরের গল্প।

"সাধনা"র সঙ্গে সঙ্গেই ("ভারতী" এবং বঙ্গদর্শনে"ও কয়েকটি ছিল) রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের গল্পগুলি শেষ হয়েছে। এদের মধ্যে বস্তুবৈচিত্র্য এবং চরিত্রবৈশিষ্ট্য যাই থাক—সামগ্রিক ভাবে যেন প্রকৃতির একটি নিবিড় ছায়া—পদ্মার ওপর বিকীর্ণ একটি অবারিত আকাশের আলো, জলের কল্লোল আর জীবন-সম্ভোগের আনন্দই মিশে আছে। নষ্টনীড় এই পর্বের হয়তো কিছুটা ব্যতিক্রম, কিন্তু মোটের ওপর পদ্মাবিহারী একটি মুক্তমনের রসোল্লাসেই এরা সঞ্জীবিত। দীর্ঘকাল পরে একখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> "অল্পবয়সে বাংলা দেশের পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গে যখন আমার চোখে চোখে পরিচয় হয়েছিল তখন প্রতিদিন আমার মনে যে আনন্দ ধারা উদ্বারিত হয়েছিল তাই সহজে প্রবাহিত হয়েছিল ঐ নিরলংকৃত সরল গল্পগুলির ভিতর দিয়ে। আমার নিজের বিশ্বাস এই আনন্দ বিস্মিত দৃষ্টির ভিতর দিয়ে বাংলা দেশকে দেখা আমাদের সাহিত্যে কোথাও নেই। বাংলা পল্লীর সেই অন্তরঙ্গ আতিথ্য থেকে সরে এসেছি, তাই সাহিত্যের সেই শ্যামল

ছায়া-শীতল নিভৃত বীথিকার ভিতর দিয়ে আমার বর্ত্তমান মোটরচলা কলম আর কোনদিন চলতেই পারবে না।”
(রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প, প্রমথনাথ বিশী, সংযোজন)।

এ ছাড়াও ‘সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা’ নামে বুদ্ধদেব বসুকে লেখা যে পত্রটি রবীন্দ্র-রচনাবলীর সপ্তবিংশতি খণ্ডে যোজিত হয়েছে—তাতেও তাঁর মর্মলোকের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে।

“সবুজপত্র” রবীন্দ্রনাথের গল্প-সাহিত্যে দ্বিতীয় অধ্যায় যোজনা করল। “পল্লীর আতিথ্য” থেকে বেরিয়ে এসে “মোটরচলা কলম” শহরের পথ ধরল। প্রথম যুগের গল্পগুলিতে কবিকে বলা যায় গ্রামীণ, এই পর্বে তিনি নাগরিক। এই নগর-পর্যায় সুরু হল “কৃষ্ণ-নাগরিক” প্রমথ চৌধুরীর “সবুজপত্রে”। “হালদারগোষ্ঠী,” হৈমন্তী”, “স্ত্রীর পত্র” এবং “পয়লা নম্বর” প্রমুখ দশটি গল্প তিনি লিখলেন “সবুজপত্রে”র পাতায়।

“হালদারগোষ্ঠী” রবীন্দ্রনাথের তর্কাতীত একটি সুমহান্ গল্প। এই গল্পের নায়ক বনোয়ারীলালের মধ্যে একটি চিরকালীন সমস্যার ছায়াভাস ঘটেছে। শিল্পীর আইডিয়ালিস্ট সত্তার সঙ্গে পারিপার্শ্বিক বাস্তব-জগতের স্থূল লোকযাত্রা, আর স্বার্থপরতার যে সংঘাত বাধে—এই গল্প তারই তির্যক আখ্যান। পৃথিবীর বহু স্মরণীয় মানুষের জীবন, সাহিত্য এবং শিল্পকর্ম এই দ্বন্দ্বের ইতিহাস—এর মধ্যে রোমান্টিক বেদনার চরম আকৃতি। বনোয়ারী আঁন্দ্রিয়া-দেল-সার্তো, ভ্যান গখ্, শেলী, পল গগ্যাঁর মতোই অভিশপ্ত; বোদল্যারের অ্যাল্‌বাট্রসের মতোই বিশাল বনোয়ারী ইতরের কৌতুকের উপকরণ। শক্তি, সত্য ও সৌন্দর্যবোধের সম্পূর্ণ প্রকাশ

ঘটেছে এই চরিত্রে, তাই রক্ষণশীল বৈষয়িক হালদার গোষ্ঠীর সঙ্গে তার কোথাও মনের মিল ঘটল না—কোনোদিন সে বুঝতে পারল না "সম্পূর্ণ রূপে এ বাড়ির বড়োবাবু হওয়াই তাহার উচিত ছিল।" যে কিরণের ওপর নিজের কল্প-বাসনা আরোপ করে বনোয়ারি সমস্ত দুঃখ লজ্জা অপমানকে সহ্য করত, শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করা গেল; "সেই তন্বী তো এখন তন্বী নাই, কখন মোটা হইয়াছে সে তাহা লক্ষ্য করে নাই। এতদিনে হালদার গোষ্ঠীর বড়োবউয়ের উপযুক্ত চেহারা তাহার ভরিয়া উঠিয়াছে। আর কেন, এখন অমরুশতকের কবিতাগুলাও বনোয়ারির অন্য সমস্ত সম্পত্তির সঙ্গে বিসর্জন দেওয়াই ভালো।" অতএব "সেই রাত্রেই বনোয়ারির আর দেখা নাই।"

সৌন্দর্যবোধ আর শিল্পিমনের সঙ্গে সাংসারিক স্থূলতার এই বিরোধই পূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে "যোগাযোগ" উপন্যাসে। হালদারগোষ্ঠী তারই একদিক। "প্রবাসী"র পাতায় প্রকাশিত "চিত্রকর" গল্পটির সংক্ষিপ্ত আয়তনে এবং স্পষ্ট রেখায় এই কথাটিকে আরো ভালো করে বোঝা যাবে।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সৌন্দর্য-চেতনা আর শৈল্পিক শুচিতার প্রতীক হল নারী। এই নারীই "নন্দিনী" হয়ে রাজাকে ত্রাণ করবার জন্য আবির্ভূত হয়েছে "রক্তকরবী"তে। শিল্প ও সুষমার অপমৃত্যু বাঙালী মেয়ের ব্যর্থ বিড়ম্বিত জীবনের মধ্যে তাঁর কাছে ধরা দিয়েছে বারবার। তাই বনোয়ারির বেদনা আর একভাবে প্রতীকিত হয়েছে "হৈমন্তী"তে।

"দেনা-পাওনা"র নিরুপমার আর এই গল্পের হৈমন্তীর মৃত্যুর মধ্যে সাদৃশ্য আছে, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যও গড়ে উঠেছে যুগ-প্রভাবেই। "দেনা-পাওনা" অনাড়ম্বর সামাজিক গল্প, "হৈমন্তী" সৌন্দর্য আর স্থূলতার ভাবগত দ্বন্দ্বের ওপরে আশ্রিত। শিক্ষাব্রতী বাপের প্রভাবে যে "নির্মল সত্যে এবং উদার আলোকে তাহার

প্রকৃতি এমন ঋজু শুভ্র ও সবল হইয়া উঠিয়াছে” তা থেকে স্বার্থ-কুৎসিত সংসারে “হৈম যে কিরূপ নিরতিশয় ও নিষ্ঠুর রূপে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে”—এই বেদনায় “হৈমন্তী” অশ্রুসজল। সুন্দরের সকরুণ অপঘাতেই গল্পটি শেষ হয়েছে।

কিন্তু “সবুজপত্রে”র আশ্রয়ে রবীন্দ্রনাথের যুগসজাগ মন এইখান থেকে একটা নতুন মোড় নিয়েছে। হেনরিক ইবসেন আর বার্নার্ড শর নাটক, “ফরসাইট সাগার” আইরিন, ইংল্যাণ্ডের সাফ্রেজিস্ট আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া—নারীর অধিকার, তার মর্যাদা, তার মুক্তি সম্পর্কে ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলছে। “পলাতকা”র মঞ্জুলিকা বেরিয়েছে পারিবারিক শাসনের বাঁধ ভেঙে—রবীন্দ্রনাথের গল্পেও নারীশক্তি উদ্বুদ্ধ হয়েছে। স্মরণীয়, এই কালেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘পলাতকা’ রচনা করছেন, এই যুগেই মৃত্যুযাত্রিণী মেয়েটি মরণ-মহেশ্বরের সঙ্গে মিলনের প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হয়ে এই মূঢ় তুচ্ছ জীবনের বন্ধন ছিন্ন করছে :

“তুচ্ছ বাইশ বছর আমার ঘরের কোণের
ধূলোয় পড়ে থাক।
মরণ-বাসর ঘরে আমায় যে দিয়েছে ডাক,
দ্বারে আমার প্রার্থী সে যে, নয় সে আমার প্রভু,
হেলা আমায় করবে না সে কভু।
চায় সে আমার কাছে
আমার মাঝে গভীর গোপন যে সুধারস আছে”—

হোক মৃত্যু-মুক্তি, তবু এই উদ্বোধনের মেঘ-ডম্বর পাওয়া গেল “স্ত্রীর পত্রে”। গল্পের চাইতেও বক্তব্য এতে প্রধান—আক্রমণের মধ্যে কোথাও কোনো আবরণ নেই, কোনো কোনো অংশ স্পষ্টতই প্রবন্ধধর্মী। হৈমন্তীর অবক্ষয় মেজো বৌ স্বীকার করেনি। বিন্দুর বিড়ম্বিত জীবনের চরম দুর্ভাগ্যের মধ্যে দিয়ে তার আত্মদর্শন

হয়েছে: "আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়ে মানুষের পরিচয়টা যে কী তা আমি পেয়েছি"।

অতএব "সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলি" থেকে মেজো-বউয়ের মুক্তি—মাথার ওপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জের ছায়ায়—প্রসারিত নীল সমুদ্রের সামনে।

সাধারণ রক্ষণশীল বাঙালী পরিবার এবং তার রীতি-পদ্ধতির তীক্ষ্ণতম সমালোচনা আছে এই গল্পে। সমাপ্তিতে কবি রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি—আকাশ আর সমুদ্রের একই অ্যাবস্ট্রাকট্ মুক্তি-ব্যঞ্জনা, ফলে গল্পটির উজ্জ্বল রিয়ালিজ্‌মের ওপর ভাবালুতার খানিকটা কুয়াশাই ছড়িয়ে পড়েছে। এবং, সেই সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে 'মুক্তি'র নায়িকার মতো মেজো বউয়েরও মনে হয়েছে:

"জনম মরণ এক হয়েছে ওই যে অকূল
বিরাট মোহানায়,
ঐ অতলে কোথায় মিলে যায়
ভাঁড়ার ঘরের দেওয়াল যত
একটু ফেনার মতো।"

কিন্তু তা সত্ত্বেও মেজ বউয়ের এই পত্র-কাহিনী বাংলা দেশে তখন প্রচণ্ড দোলা জাগিয়ে দিয়েছিল। প্রতিবাদ করেছিলেন ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আর বিপিনচন্দ্র পাল—"সবুজপত্রে"র প্রতিদ্বন্দ্বী "নারায়ণ" পত্রিকায়। কিন্তু সে প্রতিবাদে মেজো বউয়ের জ্বলন্ত অভিযোগ মিথ্যে হয়ে যায়নি।

মেজো বউয়ের বক্তব্যে নারীর মর্যাদাবোধ এবং জাগরণ যতটা তত্ত্ব হয়ে দেখা দিয়েছে, সে পরিমাণ শিল্প হয়ে আসেনি, যদিও বিন্দুর আনুষঙ্গিক কাহিনীটি অপূর্ব। "অপরিচিতা" গল্পে কল্যাণীর শক্তিময়তা অনেকখানি নিজের মধ্যে টেনে নিয়েছেন তার বাবা শম্ভুনাথ সেন। শেষের দিকে ট্রেনের কামরায় কল্যাণীর আত্ম-প্রকাশের মহিমাটি কিছু পরিমাণে চলতি বাংলা গল্পের অনুবর্তন।

এই গল্পে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য "মামাগ্রস্ত" নায়কের পৌরুষের পূর্ণ বিকাশ—যা হৈমন্তীতে মাত্র ব্যর্থ বেদনায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছে।

নারীর অন্তর্বেদনা এবং পুরুষের আচ্ছন্ন বুদ্ধিতে তার অবমাননার স্বরূপ সবচাইতে সার্থক হয়ে দেখা দিয়েছে "পয়লা নম্বরের" অনিলায়। "স্ত্রীর পত্রে"র রচনায় রবীন্দ্রনাথের নাগরিক চাতুর্য এবং বাগ্-বৈদগ্ধ্যের পরিচয় মেলে, এখানে সে নৈপুণ্য রীতিমতো চমকপ্রদ। উইটের দীপ্তিতে ঘনঘন বিদ্যুৎ ঝলকিত, ইঙ্গিত-সংকেতে এমন গূঢ় এবং মন্তব্যে এত ক্ষুরধার স্মার্ট গল্প বাংলা সাহিত্যে "চারইয়ারী কথা" ছাড়া আর লেখা হয়নি। দুই নম্বরের বাসিন্দা গ্রন্থকীট অদ্বৈতচরণ বিদ্যা ও বুদ্ধিচর্চার উগ্র আধুনিকতার কেন্দ্রে মধ্যমণি হয়ে বসে আছে, তার চারদিকে জড়ো হয়েছে দ্বৈতাদ্বৈত সম্প্রদায়ের ভক্তবৃন্দ। এই অদ্বৈতচরণের স্ত্রী অনিলা। স্বামী এবং তাঁর শিষ্যবর্গের জন্য মাছের কচুরি, ছানার পায়েস, কিংবা আমড়ার চাটনি, সময়ে-অসময়ে করে দেওয়া ছাড়া তার আর কোনো ভূমিকাই নেই। অদ্বৈতচরণের জীবনে সে নিতান্তই প্রয়োজন এবং স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ মাত্র। অন্যদিকে পয়লা নম্বর বাড়ীতে এসেছে জমিদার সিতাংশুমৌলি, যে পরিপূর্ণ উদ্দাম যৌবনের প্রতীক; বলিষ্ঠ পৌরুষের দর্পে ঘোড়ায় চড়ে, ব্রুহাম হাঁকায়—টেনিস খেলে, নানা রকম বাদ্যযন্ত্রেও তার সমান অধিকার। স্থবির অদ্বৈতচরণ অনিলাকে উপেক্ষা করেছে, আর উদ্দাম সিতাংশুমৌলি তাকে ডাক পাঠিয়েছে যৌবনের পূজার অর্ঘ্য সাজিয়ে।

শেষ পর্যন্ত অদ্বৈতচরণ অনিলাকে হারিয়েছে, সিতাংশুমৌলিও তাকে পায়নি। একখানি নীল কাগজ ছিঁড়ে সে দুজনকে একই চিঠি লিখেছে: "আমি চললুম, আমাকে খুঁজতে চেষ্টা করো না। করলেও খোঁজ পাবে না।" বিন্দুর মৃত্যু মেজো বউকে মুক্তি দিয়েছিল, অনিলা ছুটি পেয়েছে ছোট ভাই সরোজের আত্মহত্যায়।

তার নীল কাগজের চিঠিটা অসীম নীল আকাশ আর নীল সমুদ্রের প্রতীক ছাড়া আর কিছুই নয়।

অদ্বৈতচরণ অনিলাকে কেন হারাল—তার কারণ সুস্পষ্ট। কিন্তু কেন সে সিতাংশুমৌলির কাছেও ধরা দিল না? সিতাংশুমৌলি তার নারীত্বকে মূল্য দিয়েছিল বলেই তার চিঠি ছিঁড়তে চেয়েও ছিঁড়তে পারেনি অনিলা; তবু সিতাংশুমৌলিও তাকে সম্পূর্ণ করে দেখতে পায়নি। অদ্বৈতচরণ তাকে আংশিকভাবে দেখেছে সাংসারিকতার সীমায়, সিতাংশুমৌলিও তাকে খণ্ডিত করে দেখেছে ভাবুক রোম্যান্টিকতার মধ্যে। তার পূর্ণ মহিমা কারো কাছেই প্রকাশিত হয়নি। চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে বলেছিলেন, "দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী"—অনিলারও ঠিক সেইটিই মর্মকথা।

এই বক্তব্য নতুন নয়—"চিত্রাঙ্গদা"য় আছে, "তপতী"তে আছে। কিন্তু নতুনত্ব আছে গল্পটির গঠনে—অনিলার আশ্চর্য সংক্ষিপ্ত বিদায়ের মধ্যে, নীল চিঠির সাংকেতিকতায়। "নষ্টনীড়ে"র সঙ্গেও এই গল্পের কিছুটা সাদৃশ্য অনুভব করা যায়—অদ্বৈতচরণ অনেকখানি ভূপতি, সিতাংশুমৌলি কিছু পরিমাণে অমল। কিন্তু হৈমন্তী আর দেনা-পাওনার ক্ষেত্রে যেমন দেখেছি—এখানেও ঠিক একইভাবে পারিবারিক কাহিনী যুগ-প্রভাবের ফলে ব্যক্তি সাপেক্ষতা পার হয়ে বিস্তৃততর সামাজিক ব্যঞ্জনায় ব্যাপ্ত হয়েছে।

॥ সাত ॥

রাজনৈতিক ঘূর্ণিচক্রের মধ্যে পড়ে মানুষ যতটা মাতে—ততটা সত্যাশ্রিত হয় না, রবীন্দ্রনাথের এই সুস্পষ্ট অভিযোগ ধরা পড়েছে "ঘরে বাইরে"তে, "চার অধ্যায়ে"। এই অভিযোগ প্রমাণের জন্য সন্দীপকে তিনি যে-ভাবে চিত্রিত করেছেন এবং অতীন আর এলার কাহিনীকে যে-ভাবে তুলে ধরেছেন তাতে ঠিক সুবিচার হয়েছে বলা যায় না, কিন্তু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবটি যে কী, তা-ও এ থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, এবং "মেঘ ও রৌদ্র" থেকে বোঝা যায়, জীবনের ছোট সুখ ছোট বেদনার মধ্যেই মানুষের পরম প্রাপ্তিটি লুকিয়ে আছে—বাইরের ঝড়-ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে দুঃসহ কর্তব্য-সাধ্যনে তার চরম চরিতার্থতাটির সন্ধান মিলবে না। ব্যক্তিক উৎকর্ষ সাধন, জাতীয় চরিত্র রচনা করা এবং জীবনাসক্তিতে সুধাস্নিগ্ধ হয়ে সংগঠনমূলক কর্মপথে এগিয়ে যাওয়া—রবীন্দ্রনাথের বিবিধ প্রবন্ধ এবং বিবিধ কথা-সাহিত্য থেকে দেশপ্রেমের স্বরূপধর্ম সম্পর্কে এই নির্যাসটুকুই আহরণ করা যায়। বলা অনাবশ্যক, এই সংস্কার-বাদিতার সঙ্গে সকলেই একমত হবেন না।

নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে, বক্তব্যমূল্যে গুরুত্বপূর্ণ এবং শিল্পকলায় দুর্বল, অন্তত দুটি গল্পে সমকালীন রাজনৈতিক কর্মপ্রণালীর তীব্র সমালোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

"প্রবাসী"র পাতায় প্রকাশিত এই গল্পদুটি যথাক্রমে "নামঞ্জুর গল্প" এবং "সংস্কার"। প্রথম গল্পটির নামকরণের মধ্যেই ব্যঙ্গটি সন্নিহিত : রাজনৈতিক মাতলামির যুগে তাঁর গল্পটি পাঠকদের কাছে মঞ্জুরি পাবে না। একজন প্রাক্তন আদর্শনিষ্ঠ বিপ্লববাদীর চোখ দিয়ে অসহযোগ আন্দোলন এবং বিদেশী বর্জনের একটি অধ্যায়কে তিনি দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন। এই গল্পে একসঙ্গে তিনি

দুটি জিনিসকে আক্রমণ করেছেন: অসংযত রাজনৈতিক মত্ততা একদিকে মানবিক স্নেহ-মমতার সত্যকে উপেক্ষা করছে; অন্যদিকে অমিয়ার হীনজন্ম-কাহিনী শোনাবার সঙ্গে সঙ্গে "স্বদেশলক্ষ্মী" সম্পর্কে মোহমুক্ত অনিলের উর্ধ্বশ্বাসে কুমিল্লায় পলায়ন থেকে প্রমাণিত হয়েছে—বাইরে যতই দুঃসাহসিকতার আচ্ছাদন থাক, ভেতরে ভেতরে আমরা কুসংস্কারের শৃঙ্খলে পাকে পাকে জড়ানো। গল্পের বাক্-চাতুর্য এই আক্রমণকে তীক্ষ্ণতর করে তুলেছে।

"সংস্কার" গল্পে দ্বিতীয় বক্তব্যটিকে অত্যন্ত মোটা টানে আনা হয়েছে শখের দেশসেবিকা কলিকার মধ্য দিয়ে, তত্ত্ববিদ অধ্যাপক নয়নমোহনও লেখকের ক্রুদ্ধ ব্যঙ্গ থেকে নিস্তার পাননি। অসহযোগ বা অস্পৃশ্যতা-বর্জন আন্দোলনের সার্থকতা সম্বন্ধে মতভেদ থাকতেই পারে, কিন্তু এ দুটি গল্পের সাহায্যে তাকে যে-ভাবে typify করা হয়েছে তাতে নিরপেক্ষ মন খুশি হয় না। এইসব আন্দোলনের প্রতিভূ হিসাবে মাত্র অনিল আর কলিকার চরিত্রই যদি রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়ে তা হলে সেটাকে বাংলা-দেশের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। সেই সঙ্গে এ কথাও বলতে হবে সিতাংশুমৌলি এবং অদ্বৈতচরণ যেমন খণ্ডিতভাবে অনিলাকে দেখেছিল, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিও এইসব ক্ষেত্রে আংশিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে।

"আগে আত্মার স্বাধীনতা আনো, তারপরই দেশের স্বাধীনতা আসবে"—এটা নিঃসন্দেহেই দামী কথা। এই উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ যে নিজস্ব গঠনমূলকতার আশ্রয় নিয়েছিলেন তাতে তাঁর সম্পূর্ণ অধিকারও আছে। ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই বিভিন্ন মানুষের কাছে একই জিনিস বিভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে দেখা দেবে, তাও ঠিক। কিন্তু একটি সামগ্রিক সত্যের ভাষ্য করবার সময় লেখক যদি এমন প্রতীক বেছে নেন যা অংশতঃ এবং বৈকল্পিক, তা হলে সঙ্গতভাবেই অনুযোগের কারণ ঘটে।

॥ আট ॥

গল্পকার রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার শেষ রশ্মি পড়েছে "তিন সঙ্গী"র তিনটি গল্পে। প্রথম গল্প "রবিবার" একটি মনোরম প্রেমকাহিনী। দ্বিতীয়টি আরণ্যক জৈবতার মতো অন্ধ আকর্ষণ থেকে অচিরার পুনরুদ্বোধন এবং নবীনমাধবের অনিচ্ছালব্ধ মুক্তি ("শেষ কথা") এবং তৃতীয়টিতে সোহিনী নামিকা এক জ্যোতির্ময়ীর প্রলোভনের অগ্নিচক্র রচনা করে নন্দকিশোরের অসমাপ্ত বিজ্ঞান-যজ্ঞের ঋত্বিককে বিফল-সন্ধান ("ল্যাবরেটরি")। এই গল্প তিনটি বিচ্ছিন্নভাবে রচিত হয়েও একটি মর্মগত ঐক্যসূত্রে বাঁধা আছে এবং 'চতুরঙ্গ'-পর্যায়ী একটি সামগ্রিক উপন্যাসের মতোই স্বতন্ত্র ভাবে বিশ্লেষণযোগ্য। তাই "তিন সঙ্গী"র আলোচনা অন্য প্রবন্ধে করা হল। এ-ছাড়াও অসংকলিত গল্প 'বদ্‌নাম', 'মুসলমানী গল্প', 'শেষ পুরস্কার' এবং 'প্রগতি সংহারে'র খসড়া আর উল্লেখযোগ্য ভাবে আলোচ্য নয়।

১২৯৮ থেকে ১৩৪০ পর্যন্ত—অর্থাৎ মোটামুটি বেয়াল্লিশ বছরের গণ্ডীরেখার ভেতরে রবীন্দ্রনাথের গল্প-সাধনার একটি সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা করা গেল। তাঁর সমস্ত গল্পের আলোচনা বা উল্লেখও এখানে করা সম্ভব হয়নি, কিছু কিছু স্মরণীয় রচনার পরিচয়ও নিশ্চয়ই বাদ পড়ল। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি মহান প্রতিভার ব্যাপকতা এ থেকেই অনুমান করা যাবে এবং বলা যাবে, একমাত্র গল্পলেখক হিসেবেই রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার অধিকারী হতে পারতেন। যখন সর্বপ্রথম তিনি গল্প লেখা আরম্ভ করেন—তখন তাঁর সামনে আধুনিক ছোট গল্পের কোনো আদর্শ উপস্থিত ছিল কিনা বলা কঠিন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ত্রয়ী : পো, মোপাসাঁ, এবং চেখভের মধ্যে শেষের দুজন প্রায় তাঁর সমকালীন, প্রথম জন

পূর্বগামী। পো'র প্রভাব কতটা তাঁর ওপর পড়েছিল? চেখভ কি তখন আদৌ এ-দেশে পৌঁছেছিলেন? মোপাসাঁকে এবং ফরাসী সাহিত্যকে প্রমথ চৌধুরীই কি এদেশে প্রথম পরিচিত করাননি? রবীন্দ্রনাথের গল্পে বিদেশীয় প্রভাব-প্রসঙ্গে এ-সব আলোচনা বহুব্যাপ্ত এবং তর্কসাপেক্ষ। তবু মনে হয়, প্রভাব যদি কিছু থাকেও, বাংলা ছোট গল্পের সিংহদ্বার মুক্ত করার জন্যে পাথর কাটতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথকেই। নিজস্ব প্রতিভায় গল্পের রূপ এবং রীতি আবিষ্কার করতে হয়েছে, নানা পরীক্ষা, নানা অনুশীলনের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পকে রূপে রসে প্রতিষ্ঠা দিতে হয়েছে। মাত্র বাংলা সাহিত্যেই নয়—নিজের গল্পকে আন্ত-র্জাতিক মানে সমুন্নত করেছেন তিনি এবং নিরপেক্ষ সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে পূর্বোক্ত ত্রয়ীর তালিকায় চতুর্থ সংযোজন।

কালের সঙ্গে পদক্ষেপ এবং বারে বারে নবতম আন্দোলনের অধিনায়কত্ব গ্রহণ—এই চিরমহান প্রগতিশীলতাই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সৃষ্টিগর্ভ এবং সমুজ্জ্বল করে রেখেছে। তাঁর ছোটগল্পও কালের সহগামীরূপে যুগচেতনার শীর্ষে থেকে রীতি ও বক্তব্যে বারে বারে নবীনায়িত হয়েছে। 'ঘাটের কথা', 'দেনা-পাওনা' দিয়ে সূত্রপাত—'ক্ষুধিত পাষাণ' থেকে 'হালদারগোষ্ঠী'তে পদক্ষেপ এবং সেখান থেকে 'ল্যাবরেটরি'তে উত্তরণ—এই বৈপ্লবিক বিবর্তনের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব আমাদের কাছে সম্পূর্ণ ভাবে উদ্ভাসিত হয়। আর, এক কথায় বলা যায়: বেয়াল্লিশ বছরের সীমার মধ্যে আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের আবির্ভাব ও ক্রম-বিকাশ এককভাবে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই লভ্য।

"ভারতী" পত্রিকার আশ্রয়ে উত্তরকালীন আধুনিকতা এবং সেই আধুনিকতাসম্ভব ছোট গল্পকে রবীন্দ্রনাথই প্রেরণা দিয়েছিলেন। সেই ঋণের স্বীকৃতি দিয়েছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, দিয়েছেন চারু বন্দ্যোপাধ্যায়; তার পরে যখন

"কল্লোল" এল, তখন তার আধুনিকতম গল্পও "ভারতী"র কাছ থেকে অনেকখানি ঋণ গ্রহণ করল—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের পরোক্ষ প্রভাব "কল্লোল"-ও এড়াতে পারল না।

কিন্তু সে আলাদা প্রসঙ্গ। এখানে বাংলা ছোট গল্পের ইতিহাস নির্ণয় করবার অবকাশ নেই।

'লিপিকা'র ছোটগল্প

॥ ১ ॥

'লিপিকা' বইখানি লেখার উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন 'পুনশ্চে'র ভূমিকায়। ইংরেজিতে 'গীতাঞ্জলি'র গানগুলি অনুবাদ করতে গিয়ে তাঁর মনে জিজ্ঞাসা জেগেছিল যে, কবিতার সুস্পষ্ট ঝঙ্কার না তুলেও গদ্যের মাধ্যমে কাব্যরস সৃষ্টি করা সম্ভব কিনা। —'মনে আছে, সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেম, তিনি স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু চেষ্টা করেন নি। তখন আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি, 'লিপিকা'র অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে। ছাপবার সময় কাব্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি—বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।' পুনশ্চের কবিতাগুলো রচনা করবার সময় এই ভীরুতা অতিক্রম করা লেখকের পক্ষে সম্ভব হয়েছে, বাংলা সাহিত্যে নতুন গদ্যছন্দের প্রবর্তন করেছেন তিনি।

এই নতুন ছন্দরীতির নেপথ্য প্রেরণা যে ফরাসী কাব্য, তাতে সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু আমাদের একথাটিও স্মরণে রাখতে হবে যে ফরাসী গদ্যছন্দের প্রথম সূচনা গদ্যে নয়—পদ্যছন্দের মুক্তিতে। এর আদিতে লা ফঁত্যান—তাঁর বিখ্যাত গল্পগুলো (fable)-র রূপায়ণে হ্রস্ব-দীর্ঘ পংক্তির স্বাধীনতা নিয়েছিলেন। এই মুক্তিটুকু দীর্ঘকাল ধরে বয়ে এসে একটা বৈপ্লবিক প্রেরণা পেলো পল ভ্যার্লেনের হাতে। তাঁর সুপরিচিত 'Art Poétique'-এ মধুসূদনের 'মিত্রাক্ষরে'র মতোই বন্ধনমোচনের দাবি জানালেন তিনি: "Et pour cela préfère l'Impair"—অসম-মাত্রার পংক্তি চান তিনি। ভ্যার্লেনের তত্ত্বকে এগিয়ে নিলেন আরো দুজন কবি, গুস্তাভ কা'ন এবং এমিল ভ্যার্‌আয়র্‌। শুধু অসম-মাত্রিক পংক্তি নয়, এঁরা মুক্ত ছন্দ বা 'Vers libre'-কে একটা সম্পূর্ণ রূপ দিলেন।

কিন্তু মুক্ত-ছন্দ আরো মুক্ত হল আঁরি দ্য রেনিয়ে-র হাতে। তিনি কবিতার সুরের টান রাখলেন বটে, কিন্তু গদ্যের চাল এনে দিলেন তার চলায়। পথকে সম্ভাষণ করে রেনিয়ে বলেছেন :

"Je n'irai pas vers vos chênes
Ni le long de vos bouleaux et de vos frênes
Et ni vers vos soleils, vos villes et vos eaux,
O route !
J'entends venir les pas the mon passé qui saigne,
Les pas que j'ai crus mort, hélas ! et qui reviennent,
Et qui semblent me précéder en vos échos,
O route—"

এর মোটামুটি একটা অনুবাদ এই রকম দাঁড়ায় :

"আমি চলবনা তোমার ওক শ্রেণীর দিকে
চলবনা তোমার বার্চ আর অ্যাশতরুর দীর্ঘ বীথি পথে
এবং তোমার সূর্য, তোমার শহর আর জলরাশির অভিমুখেও নয়,
হে পথ।
আমি শুনতে পাচ্ছি আসছে আমারই অতীতের রক্তাক্ত পদক্ষেপ
যে পদপাতকে আমি মৃত বলে ভেবেছি,
হায়—যা ফিরে আসছে আবার,
এবং তোমারই প্রতিধ্বনির মধ্যে যাকে আমার পুরোবর্তী বলে
মনে হয়,
হে পথ—"

আমার অনুবাদ খুব যে মনোরম হল তা নয়, কিন্তু আশা করি, এই পঙ্গু অনুবাদেও কবিতার মর্মার্থ বোঝা যাবে। মূল কবিতাটি পড়তে ছন্দের টান নিশ্চয় পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু গদ্যই এর আসল চরিত্র। কবিতার ভেতরেও 'O route' সম্পূর্ণই গদ্য। এর সঙ্গে

আপাতঃ ছন্দোময় অথচ গদ্যধর্মী 'পুনশ্চে'র দুটি-একটি কবিতাকে স্মরণ করা যায়। যেমন 'ভীরু' তে পাচ্ছি :

ম্যাট্রিকুলেশনে পড়ে
ব্যঙ্গ সুচতুর
বটেকৃষ্ট, ভীরু ছেলেদের বিভীষিকা।
একদিন কী কারণে
সুনীতকে দিয়েছিল উপাধি 'পরমহংস' ব'লে।
ক্রমে সেটা হ'ল 'পাতিহাঁস।'
শেষকালে হ'ল 'হাঁসখালি'—

রেনিয়ের পরে আধুনিক কাল এল, Vers libre পরিপূর্ণ গদ্যে উত্তীর্ণ হল। মিলিয়ে গেল সুরের টান; অন্ত্যমিলেরও কোনো আর প্রয়োজন রইল না। মুক্ত-ছন্দের ওপর প্রচণ্ড জোর পড়ল মার্কিন কবি ওয়াল্‌ট্ হুইট্‌ম্যানের কবিতায়—সতেজ গদ্যকেই তিনি কবিতার বাহন করলেন :

"As to me I know nothing else but miracles,
Whether I walk the streets of Manhattan,
Or dart my sight over the roofs of houses towards
the sky,
Or wade with naked feet along the beach just in the
edge of water—"

পল ক্লোদেল, গীওম আপোলিন্যার ইত্যাদি আধুনিক কবির হাতে কাব্যধারার পুরোণো ট্রাডিশন, হুইট্‌ম্যানের দুঃসাহসিকতা এবং নতুন কালের সাংকেতিকতায় মণ্ডিত হয়ে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই মুক্ত ছন্দ তার আধুনিক গদ্যময় রূপ নিল। এলিয়ট-প্রমুখ জর্জীয় কবিদের রচনা থেকে রবীন্দ্রনাথ এটিকে সম্পূর্ণ দেখতে পেলেন। ছন্দ-মুক্তির সাধনা তাঁর বাল্যজীবন থেকেই ছিল, 'বলাকা'য় একবার বাঁধন ভেঙেছিলেন তিনি, ইংরাজ

কবিদের রচনা পড়বার আগেই তাঁর পরীক্ষা চলছিল। "পুনশ্চে" তিনি নির্ভয়ে গদ্য-ছন্দ প্রয়োগ করলেন। তাঁর 'লিপিকা' একটি মধ্য মুহূর্ত—সেখানে আঁরি রেইনে পূর্ণ গদ্যের আশ্রয়ে বিদ্যমান। রেইনের 'রুত্' এর সঙ্গে 'লিপিকা'র 'পায়ে চলার পথ'-এর কি কোনো সম্পর্ক আছে?

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতা এই প্রসঙ্গে আলোচ্য নয়। তবু ছন্দ-সম্পর্কে এইটুকু আলোচনা যে করা গেল, তার কারণ, 'লিপিকা'র বিষয়ের সঙ্গে তার আঙ্গিক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই রীতি না থাকলে প্রসঙ্গগুলির আবেদন অনেক ক্ষীণ হয়ে যেত, তাদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যেরও অপহ্নব ঘটত। কবিতার ব্যঞ্জনা, অথচ গদ্যের মুক্ত গতি—এই রীতিই এদের সবচেয়ে সহায়ক। তাই রবীন্দ্রনাথ ছন্দোঝঙ্কৃত গদ্যের একটি আনন্দিত পরীক্ষা করলেন 'লিপিকা'য়।

কবির পূর্বোদ্ধৃত বিজ্ঞপ্তিটি থেকে দেখা যাচ্ছে 'লিপিকা'র অল্প কয়েকটি লেখাই গদ্যাশ্রয়ী কাব্যরচনার প্রয়াস। কিন্তু পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করেছেন যে, 'লিপিকা' মাত্র সামান্য কয়েকটি লেখারই সংকলন মাত্র নয়—ছোটো-বড়োতে মিলিয়ে মোট আটত্রিশটি প্রসঙ্গ এতে আছে। 'মেঘলা দিনে', 'বাণী', 'মেঘদূত', 'সন্ধ্যা ও প্রভাত', 'বাঁশী', 'একটি দিন', 'সতেরো বছর', 'প্রথম শোক', 'প্রশ্ন'— ইত্যাদি লেখাগুলো নিঃসন্দেহেই কবিতা, 'পুনশ্চ' কাব্যেরই তারা প্রাথমিক পদধ্বনি। কিন্তু 'মীনু', 'নামের খেলা', 'বিদূষক', 'পট', 'নতুন পুতুল', 'উপসংহার', 'পুনরাবৃত্তি', কিংবা 'পরীর পরিচয়'—নিঃসন্দেহেই কয়েকটি ছোট গল্প। গদ্য-ছন্দের একটা বিশিষ্ট রীতিতে রচিত হয়ে এদের ব্যঞ্জনা হয়েছে সুগভীর, ব্যাপ্তি হয়েছে সুবিশাল। রবীন্দ্রনাথের গল্প-সাহিত্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে এগুলি উল্লিখিত হয় না বলেই এদের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করি।

অথচ, প্রথম প্রকাশের পর এদের যে গল্পরূপেই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন তৎকালীন বিশিষ্ট পাঠকেরা, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ১৩৩১ সালে রবীন্দ্রনাথের ১৫টি ছোটগল্প নির্বাচন করে দেবার জন্য 'বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়' থেকে এক প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সেই উপলক্ষে 'প্রবাসী'তে লিখেছিলেন :

"আমরা যখন এই নির্বাচন পুরস্কারের কথা শুনিয়াছিলাম তখন মনে করিয়াছিলাম 'লিপিকা'র গল্পগুলির মধ্য হইতেও নির্বাচন চলিবে। পরে জানিলাম, 'লিপিকা' এখন বাদ দেওয়া হইয়াছে।

'লিপিকা'র মত লেখা রবিবাবুর কলম হইতেও আগে বাহির হয় নাই। শুনিয়াছি, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ গল্প নির্বাচনের পুরস্কার পরে দেওয়া হইবে।"

(সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গ' পত্রিকা, কার্তিক, ১৩৩২ দ্রষ্টব্য)

॥ ২ ॥

'লিপিকা'র এই গল্পগুলি সংক্ষিপ্ত এবং লিরিক্যাল্। ছোটগল্পের সঙ্গে লিরিকের রূপ এবং রীতিতে যে পার্থক্যই থাক, তাদের ভাবগত সহমর্মিতা শিল্পবিচারে সর্বথা স্বীকার্য। মোপাসাঁর ছোট গল্পের আসল উৎকর্ষ যে তার লিরিকধর্মিতার মধ্যেই, নন্দনতত্ত্ব-বিশারদ ক্রোচে তা এইভাবে দেখতে পেয়েছিলেন :

'Maupassant's stories are lyrical stories, not because they are written with emphasis and lyricism (things of which they show themselves altogether free), but because of the lyric is really intrinsic to

the form of narrative, and shapes each part of it, without mixtures and without leaving any residue. In the like manner those parts which are pointed as to be the especially lyrical, in the rhetorical sense of the word, never separate themselves from the narrative and discursive tone of the prose, and speaking thus simply, gradually accelerate the rhythm and rise spontaneously to poetry.'

অর্থাৎ বস্তুসাপেক্ষতা এবং লিরিকের কাব্যব্যঞ্জনার অদ্বৈত-সিদ্ধিতেই মোপাসাঁর গল্পগুলি পরিপূর্ণতা অর্জন করেছে, কোনোটিই অপরটিকে আচ্ছন্ন করেনি, কায়ার সঙ্গে আত্মার অচ্ছেদ্য-সম্পৃক্তির মতো একীভূত হয়ে গেছে।

পৃথিবীর অপর মহত্তম গল্পকার অ্যান্তন চেখভের লিরিসিজ্‌ম্ আরো স্পষ্টোচ্চার। তাঁর 'চুম্বন', 'স্তেপ্' (The Steppe), 'কুকুর সঙ্গে ভদ্রমহিলা', 'স্কুল মিস্‌ট্রেস্' কিংবা 'সাহিত্যের অধ্যাপক' প্রমুখ যে-কোনো গল্পেই চরিত্র বা বক্তব্যকে ছাড়িয়ে লিরিকের একটি সুস্পষ্ট অনুরণন শোনা যাবে। চেকভের গল্পের এই সংগীত-গুঞ্জন আরো বেশি করে ধ্বনিত হচ্ছে পশ্চাৎপটে অবস্থিত প্রকৃতির নিরবচ্ছিন্ন ঐকতানে। চেখফ সেই সুস্থ রোম্যান্টিক্‌দের একজন, যাঁরা প্রকৃতিকে ভালোবাসেন; বিস্তীর্ণ তৃণভূমির ওপর দিয়ে তরঙ্গিত বাতাসে, রাত্রির নদীতে শান্ত গভীর কলতানে এবং পত্রমোচী অরণ্যের মর্মর জীবনের যে পরিপূর্ণ তাৎপর্যের সন্ধান তাঁরা পান,—যে আশ্চর্য সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করেন, মানুষের বিড়ম্বিত পীড়িত সত্তায় তা-ই তাঁরা সঞ্চার করে দিতে চান:

'The beauty of nature is used as a constant criterion in evaluating a given social reality and as a reminder of what life could and should be on this

lovely earth. This theme underlines the invariably lyrical vigour of Chekove's landscape and its *social character.*'—(V. Yermilov)

রবীন্দ্রনাথের গল্প পড়তে গিয়ে মোপাসাঁ এবং চেকভের এই যুগ্ম বৈশিষ্ট্যই আমরা লক্ষ্য করতে পারি। সেই সঙ্গে তৃতীয় আর একজন—গল্পের সঙ্গে লিরিক মিশিয়ে প্রকৃতির সবুজ-সঞ্জীবনী যিনি রচনা করেছেন—সেই আল্‌ফঁস্‌ দোদেও আমাদের স্মরণে আসেন। একদিকে রবীন্দ্রনাথের প্রধানাংশ গল্পই যেমন লিরিকের সুরে বাঁধা—পূর্বাপর ছন্দোময়তার সুমিত সংগতিতে ঘনপিনদ্ধ; পাশাপাশি অন্যদিকে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মিলিত স্নায়ুস্পন্দন,—প্রকৃতির প্রেক্ষাভূমিতে জীবনরহস্যের বিশ্লেষণ, এই দুটি বস্তুই তাঁর 'গল্পগুচ্ছে'র পাতায় পাতায় পাওয়া যাবে। 'লিপিকা'র গল্পগুলি এই কারণেই গদ্য-কবিতার পাশে পাশে থেকেও সুরবিচ্যুতি ঘটায় না—সমগোত্রীয় এক রাগিণী থেকে আর এক রাগিণীর মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ার মতো কবিতার নদীস্রোত থেকে গল্পের পুষ্পিত তটে অনায়াসেই পাঠকের সানন্দ উত্তরণ ঘটে। একই ভাবকল্পনার হিমবাহ থেকে অবতরণ করে কবিতা এবং গল্প মৃদ্বিহারের পথে ধীরে ধীরে আজ অনেক পৃথক হয়ে গেছে, কিন্তু 'লিপিকা'র গল্পগুলিকে অনুসরণ করলে আমরা যেন ক্রমশ উজানের দিকে পর্বতসানুর সেই ক্ষেত্রটিতে গিয়ে পৌঁছুতে পারি—যেখানে গল্প এবং কবিতার বিচ্ছেদের প্রথম সন্ধিরেখা।

॥ ৩ ॥

'মীনু' গল্পটিকেই ধরা যাক। একটি সন্তান হয়ে মারা যাওয়ার পর থেকে মীনু চিররুগ্না। তবু "ওর অল্প বয়েস। কাঁচা ফলটির মতো ওর কাঁচা প্রাণ পৃথিবীর বোঁটা শক্ত করে আঁকড়ে ছিল। যা-কিছু কচি, যা-কিছু সবুজ, যা-কিছু সজীব, তার 'পরেই ওর বড়ো টান।" এই টান, আর নিষ্ঠুর পৃথিবীর সেই টানটিকে বার বার ছিন্ন করবার চেষ্টা,—তিনটি ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে তারই বেদনা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গল্প আর কবিতার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে লেখাটি। বাড়াবার সুযোগ ছিল, কিন্তু প্রতীক তিনটিকে (কুকুর ভোঁতা, গোলক চাঁপার গাছ আর চৌধুরীদের ফুটফুটে ছোট ছেলেটি) এমন ভাবে নির্বাচন করা হয়েছে যে, কোনোটিই যেন সম্পূর্ণ করে গল্পের রেখায় আনা যায় না,—আনলে তাদের ব্যঞ্জনাটুকু ফিকে হয়ে যায়। 'পট'ও ঠিক এই জাতের। নতুন মন্ত্রীর প্রতি ঘৃণায় এবং বিদ্বেষে পটুয়া অভিরাম কখন যে তার সৌন্দর্যের ধ্যান হারিয়ে ফেলেছিল, তা সে নিজেই জানে না। যেদিন জানল, সেদিন স্পষ্ট দেখলে :

"তার দেবতার মুখ মন্ত্রীর মুখের মতো হয়ে উঠেছে।

তুলি মাটিতে ফেলে দিয়ে বললে, 'মন্ত্রীরই জিত হল।"

সেইদিনই পট নিয়ে গিয়ে মন্ত্রীকে অভিরাম বললে 'এই নাও সেই পট, তোমার ছেলেকে দিয়ো।'

মন্ত্রী বললে, 'কত দাম ?'

অভিরাম বললে, আমার 'দেবতার ধ্যান তুমি কেড়ে নিয়েছিলে, এই পট দিয়ে সেই ধ্যান ফিরে নেব।'

মন্ত্রী কিছুই বুঝতে পারলে না।"

মন্ত্রীর এই বুঝতে না-পারাটুকুই গল্পের সৌন্দর্য, তার কাব্যময়

সুরভি। মন্ত্রীর ওপর তীব্র মানসিক বিতৃষ্ণায় ধীরে ধীরে অভিরাম নিজের শিল্প-সাধনায় সুন্দরকে হারিয়ে ফেলেছে, ঘৃণার মূর্তি কখন এসে নিঃশব্দে অধিকার করে বসেছেন তার দেবতার আসন। এর চাইতে বড়ো পরাভব শিল্পীর আর নেই। তাই ক্ষমা আর ঔদার্যের মধ্য দিয়ে দেবতার ধ্যান সে ফিরে পেতে চায়—আর তার সেই পরম প্রাপ্তির অর্থটি বৈষয়িক মন্ত্রী কোনোদিনই বুঝতে পারবে না।

একেবারে আধুনিক কালের একটি অতি বাস্তব গল্পকে কিভাবে কবিতার গভীরতায় ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তারই নিদর্শন 'রাজপুত্তুর'। রূপকথার আবরণে এ-কালের গল্প রূপক-রূপে নতুনভাবে শিল্পিত হয়েছে। এই রাজপুত্র বন্দিনী রাজকন্যাকে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করতে পারেনি, তাকে জেল খাটতে হয়েছে। সে যখন বেরিয়ে এসেছে, তখন "দীর্ঘ পথ আর শেষ হয় না। তেপান্তরের মাঠের চেয়েও সে দীর্ঘ এবং সঙ্গীহীন। কতবার অন্ধকারে তাকে শুনতে হল, 'হাঁউ মাউ খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ।' মানুষকে খাবার জন্যে চারিদিকে এত লোভ!"

অবশেষে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে অভাগা রাজপুত্রকে যিনি মুক্তি দিলেন, তিনি যম। এই অবধি গল্পটি রূপকের মধ্য দিয়েই বয়ে এসেছে। এর পরেই এল কবির পালা। যদি বাস্তব একটি কাহিনী হত, তা হলে একবার দীর্ঘশ্বাস মোচন করেই ছোটগল্পের লেখক যতি টেনে দিতেন। কিন্তু কবি এখানেই থামলেন না। তিনি জানেন, রাজপুত্রের অভিযান এত সহজেই শেষ হবার নয়। জন্ম থেকে জন্মান্তরের পথ দিয়ে এগিয়ে চলবে নতুন কালের শিশু, নতুন মায়ের কোলে ফিরে এসে শুনবে নতুন কালের রূপকথা। আবার সে দুঃসাহসী রাজপুত্র হয়ে পথে বেরোবে, ইতিহাসের অনুবর্তনে বারবার হারিয়ে যাব দুঃখ বেদনা-ব্যর্থতার ভেতরে। তবু নিরবধিকাল অপেক্ষা করেই আছে, সে জানে রাজপুত্রের 'কপালে অসীম-কালের রাজটিকা।' কোনো একদিন 'দৈত্যপুরীর দ্বার সে

ভাঙবে, রাজকন্যার শিকল সে খুলবে ; যুগে যুগে শিশুরা মায়ের কোলে বসে খবর পায়—সেই ঘরছাড়া মানুষ তেপান্তর মাঠ দিয়ে কোথায় চলল। তার সামনের দিকে শত সমুদ্রের ঢেউ গর্জন করছে। ইতিহাসের মধ্যে তার বিচিত্র চেহারা ; ইতিহাসের পরপারে তার একই রূপ, রাজপুত্তুর।' এই শেষ অংশটুকুই গল্পকে কবিতা করে তুলেছে—কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে অনাগত কালের তেপান্তরের মাঠে, সাত সমুদ্রের চিরকালীন তরঙ্গ-গর্জনে। কবি আর গল্পলেখক অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে দেখা দিয়েছেন এখানে।

'অস্পষ্ট'ও এই রকম একটি বাস্তবধর্মী গল্প হতে পারত ; কিন্তু অচেনা মেয়েটিকে ঘিরে যে কুয়াশার বাতাবরণ, তার বেদনার যে দুর্বোধ্য আভাস এবং মেয়েলি হাতের চিঠিকে আলোর সামনে তুলে ধরে জীবন-যাত্রার অস্পষ্ট ছবির মতো কয়েকটি অস্পষ্ট অক্ষর দেখে বনমালীর যে শপথ, 'এ চিঠি কোনোদিন খুলব না—'এদের মিলিত মোহময়তা গল্পটিকে কবিতার মধ্যেই মুক্তি দিয়েছে। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম-ক্ষেত্রের মতো গল্প আর কবিতার দুটি শুভ্র-নীল ধারা পাশে পাশে এগিয়ে যাচ্ছে—মিশেও মিশছে না, কবি-চিত্তের আলোয় শুধু মাঝখানে একটি সূক্ষ্ম ফেনরেখা থেকে থেকে ঝিকমিক করে জ্বলে উঠছে।

'পরীর পরিচয়' রূপক গল্প—আশ্চর্য সৌন্দর্য দিয়ে গড়া। 'তোতাকাহিনী'ও রূপক—তার মধ্যে তীক্ষ্ণতম সমাজ-সচেতনতা, 'কর্তার ভূতে' নিষ্ঠুর আত্মসমালোচনা। সৌন্দর্যমগ্নতা এবং জীবন-জিজ্ঞাসার সমাবেশে লিপিকার গল্পগুলো শ্বেত এবং কৃষ্ণ ভুজঙ্গের মিলন-বন্ধে বিচিত্রবর্ণ পাকে পাকে জড়ানো।

'নামের খেলা' পুরো গল্প—আর একটু বিস্তার করলে 'গল্পগুচ্ছে'ই জায়গা পেতে পারত। 'নতুন পুতুল'ও তাই। 'পুনরাবৃত্তি'র সঙ্গে 'জয় পরাজয়ের' প্রেরণাগত সম্পর্ক খুঁজে পেতে পাঠকের অসুবিধে হয় না। 'বিদূষক' সংক্ষিপ্ত হলেও গল্পের দিকেই

প্রধানভাবে আকর্ষিত; 'ভুল স্বর্গ' 'একটি আষাঢ়ে গল্পে'র পাশে নিজের স্থান করে নিলে অভিযোগের অবকাশ থাকে না।

বস্তুত 'লিপিকা'র গল্পগুলি পড়তে পড়তে মনে হয় যেন কবি-কল্পনার একটি সামুদ্রিক দ্বীপে সারাদিনের ক্লান্তির পর আরক্তিম আলোয় কতগুলি পাখি এসে একসঙ্গে রাত্রির জন্যে আশ্রয় নিয়েছে। দুটি ঝাঁক এসে গায়ে গায়ে মিশে বসেছে; তাদের আলাদা জাত—আলাদা পাখার রঙ এখন এক হয়ে গেছে, পৃথক কাকলিধ্বনি মিলিত মধুরোলে পরিণত হয়েছে এই মুহূর্তে। একটি ঘনীভূত রাত একত্রে যাপন করে, সকালে সূর্য উঠবার পরে দুটি ঝাঁক আবার দুদিকে উড়ে যাবে—গল্পেরা যাবে গল্পের কোন্ দিগন্ত-সীমায়, কবিতারা যাবে কবিতার কোন্ দুর্লক্ষ্য দূর চক্রবালে। লিপিকা তাদের সেই মিলিত মায়া রাত্রিটিকেই ধরে রেখেছে।

॥ ৪ ॥

তবুও প্রশ্ন উঠবে। এই মিশ্র চারিত্রিকতার জন্যে এদের গল্পরূপে স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব কি না? ছোটগল্প বলতে যা আমরা বুঝি—এরা কি তার পর্যায়ভুক্ত হতে পারে? ছোটগল্পের অন্তরচারী লিরিকধর্মিতাকে স্বীকার করে নিয়েও, তার মাত্রা সম্পর্কে আমাদের কোনো রকম দায়িত্ব আছে কিনা?

কয়েক বৎসর আগেও এই প্রশ্ন করা যেতে পারত। কিন্তু এ-কালের সাহিত্য-পাঠক নিঃসংশয়েই জানেন যে, ছোটগল্পের জন্যে আজ কোনো 'watertight compartment'ই নেই; কোনো আঙ্গিকই আর ছোটগল্পের পক্ষে অনিবার্য ভাবে নিজস্ব নয়—যে-কোনো বক্তব্য, যে-কোনো বিষয়, যে কোনো উপলব্ধিই আজ তার অবলম্বন হতে পারে। ঘটনাশ্রয়িতার কথা ছেড়েই দেওয়া যাক,—

দার্শনিকতায়, মনস্তত্ত্বে, কবিচেতনায় কিংবা সমাজ-সমীক্ষণে এখন তার সার্বভৌমিক বিহার। গল্প এখন মেণ্টাল্ ক্লিনিকের রিপোর্টাজ হতে পারে, দার্শনিক চিন্তার শিল্পিত ভাষ্য হতে পারে, কবিতার অনুপূরকও হতে পারে। এ কালের গল্প কোনো বিশিষ্ট চরিত্রনিষ্ঠ নয়, সে বিচিত্র-চরিত্র। হেমিংওয়ে, জেরোম ওয়াইড্ম্যান, জন কোলিয়ার, গ্রাহাম গ্রীন, ইভ্লিন ওয়া, পার লাগের্কভিস্ট এবং আরও অসংখ্য গল্পলেখকের লেখা তার নিদর্শন।

মাত্র আজই নয়; গল্প ও কবিতার এই সীমারেখা বহুকাল থেকেই লেখকেরা পেরিয়ে আসবার চেষ্টা করছেন। খুব সম্ভব, ন্যাথানিয়াল হথর্নের মধ্যেই এর বলিষ্ঠতম সর্বাগ্র প্রয়াস লক্ষ্য করা যাবে। কবিতার সঙ্গে গল্পের আলো ছায়ার মিলন তাঁর অনেক লেখাতেই চোখে পড়বে। প্রসঙ্গতঃ 'David Swan'কে স্মরণ করা যাক। ডেভিড্ সোয়ান নামে ছেলেটি একখানা স্টেজ কোচের জন্যে প্রতীক্ষা করতে করতে পথের ধারের মনোরম বনের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মাথার ওপর মেপ্ল গাছের স্নিগ্ধ ছায়া, পাশে জলের শব্দ—ডেভিড সোয়ান তলিয়ে গিয়েছিল স্বপ্নহীন ঘুমের মধ্যে। আর, তার সেই ঘুমের অবসরে এল নিঃসন্তান বণিক-দম্পতি—মুগ্ধ হয়ে তারা চেয়ে রইল তার তরুণ মুখের দিকে; সেই সময় যদি ডেভিড্ জাগত, তা হলে হয়তো বণিক-দম্পতির মৃত পুত্রের স্থান অধিকার করে লক্ষপতি হতে পারত সে। এল অর্থবান ধনীর রূপসী তরুণী কন্যা, তার হৃদয়ের মধ্যে আঁকা হয়ে গেল ডেভিডের রূপ; যদি তখনো সে জাগত তা হলে পেতো এই সুন্দরী নারীটিকে—সেই সঙ্গে প্রচুর অর্থ আর উত্তরাধিকার। তারপর এল দুই খুনী—ডেভিড্ হঠাৎ জেগে উঠলে তাদের হাতে তার প্রাণ যেত। কিন্তু ডেভিড্ কিছুতেই জাগল না। অর্থ, প্রেম, আর মৃত্যু কখন যে তার পাশে এসে বসেছিল, সে তা জানতেও পারল না। তার ঘুম ভাঙল স্টেজ কোচের আওয়াজে। গাড়িতে ঠাঁই নেই, তবু তার ছাদে

চেপেই সে সানন্দে স্টেশনের দিকে যাত্রা করল। লেখক বলেছেন: 'Does it not argue a superintending Providence that, while viewless and unexpected events thrust themselves continually athwart our path, there should still be regularity enough in mortal life to render foresight even partially available?' এর মধ্যে ন্যাথানিয়াল হথর্ণের নিজস্ব একটি জীবনদর্শন আছে, কিন্তু এ-প্রসঙ্গে সেটি আলোচ্য নয়। আসল কথা হল, সমস্ত গল্পটিই পরিবেশ রচনায় এবং প্রতীক নির্বাচনে একটি কাব্যময় গভীরত্বে মগ্ন হয়েছে। এর সৌন্দর্য সেখানেই।

সেকালের কাব্যবিলসিত এই যে ভাবধর্মী গল্পের সূচনা, নিত্যগতিশীল কালের সঙ্গে সঙ্গে তার বিবর্তন ঘটে আসছে বহু গল্পলেখকের আনুকূল্যে। সেই বিস্তৃত ইতিহাস-পঞ্জী রচনার স্থান এ নয়। বক্তব্যের লিরিকধর্মিতাকে স্বীকৃতি দিয়েও যাঁরা বহিরঙ্গে গল্পের জন্যে কিছু বিধি-বিধান নির্ণয় করতে চান, আধুনিক লাগের্কভিস্ট সম্পূর্ণভাবেই তাঁদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন। তাঁর 'The Experiment World' নামে যে দু'পাতার গল্পটি আছে সেটি মোটামুটি এই রকম:

এক সময় এক পৃথিবী ছিল,—সেটি সত্য নয়, পরীক্ষামূলক। যেন বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগার। গাছ, পাখি, ফুল, নদী সব কিছুর মডেল তৈরি করা হত সেখানে। কয়েক ঝাঁক মানুষও তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু তারা হল সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং কিছুদিনের মধ্যেই ভেঙেচুরে একাকার হয়ে গেল। তারপর:

'Then came the idea to try just one or two; it was no use with such a lot of people. A boy and a girl-child were chosen who were to grow up in the most beautiful part of the earth. They were allowed to run

about in the woods and romp, play under the tree and take delight in everything. They were allowed to become a young man and a woman who loved one another, their happiness was complete, their eyes met openly as if their love had been but a clear summer's day.' অবশেষে প্রেমের পরিপূর্ণতায় মিলনবাসরে তারা পরম সুখে ঘুমিয়ে পড়ল—'They fell asleep in bliss, in the ecstasy and perfect beauty of love, locked in each other's arms. They awakened no more; they were dead. They were to be used elsewhere.'

গল্প এইখানেই শেষ হয়েছে। সংলাপহীন, সংক্ষিপ্ত একটি বিবৃতিমাত্র,—লাগের্কভিস্টের অস্তি-নাস্তি চেতনার সসংশয় গোধূলি-রাগ ছড়িয়ে আছে গল্পটির ওপর।

'লিপিকা' থেকে রবীন্দ্রনাথের 'গল্প' নামে রচনাটি এই প্রসঙ্গে মনে আসে :

'তারপরে কখন শুরু হল প্রাণের পত্তন। জাগল ঘাস, উঠল গাছ, ছুটল পশু, উড়ল পাখি। কেউবা মাটিতে বাঁধা থেকে আকাশে অঞ্জলি পেতে দাঁড়াল, কেউবা ছাড়া পেয়ে পৃথিবীময় আপনাকে বহুধা বিস্তার করে চলল, কেউ বা জলের যবনিকাতলে নিঃশব্দ নৃত্যে, পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে ব্যস্ত, কেউ বা আকাশে ডানা মেলে সূর্যালোকের বেদীতলে গানের অর্ঘ রচনায় উৎসুক। এখন থেকেই ধরা পড়তে লাগল বিধাতার মনের চাঞ্চল্য।

এমন করে বহু যুগ কেটে যায়। হঠাৎ এক সময়ে কোন্ খেয়ালে সৃষ্টিকর্তার কারখানায় ঊনপঞ্চাশ পবনের তলব পড়ল। তাদের সব ক'টাকে নিয়ে তিনি মানুষ গড়লেন। এতদিন পরে আরম্ভ হল তাঁর গল্পের পালা। বহুকাল কেটেছে তাঁর বিজ্ঞানে, কারুশিল্পে; এইবার তাঁর শুরু হল সাহিত্য।

মানুষকে তিনি গল্পে গল্পে ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন। পশুপাখির জীবন হল আহার নিদ্রা সন্তান পালন; মানুষের জীবন হল গল্প। কত বেদনা, কত ঘটনা; সুখদুঃখ রাগবিরাগ ভালোমন্দের কত ঘাত প্রতিঘাত—’

লাগের্কভিস্টের উদ্ধৃত গল্পটি এবং রবীন্দ্রনাথের লেখাটির মধ্যে বিষয়বস্তুগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়; সেই সঙ্গে লক্ষণীয় সংশয়ী লাগের্কভিস্টের নৈরাশ্যবাদ এবং জীবন-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথের মর্ত্যচেতনার পার্থক্য।

আলফঁস দোদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মানসগত ঐক্য ইতঃপূর্বে অন্য প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করেছি। ‘লিপিকা’র গল্পগুলির ভেতরেও দোদের সঙ্গে কবির মানস-সাদৃশ্য ফুটে বেরিয়েছে। বিশেষ করে দোদের ‘Ballades en Prose’-এর ‘Le Sous-Préfect Aux Champs’ (‘পল্লী-প্রান্তরের বুকে উপশাসক মহাশয়’) যেন ‘লিপিকা’র মেজাজেই লেখা; তেমনি আশ্চর্য প্রকৃতির বর্ণনা, ভাষায় ছন্দের সুরঝঙ্কার, সব মিলিয়ে একটি নিবিড় স্বপ্ন-মদিরতা। (‘La Mort Du Dauphin’ অর্থাৎ ‘যুবরাজের মৃত্যু’ ও ‘লিপিকা’র আত্মজন।) আমরা প্রথম গল্পটিই লক্ষ্য করছি।

মাননীয় উপশাসং পল্লী-প্রকৃতির বুকে বসে তাঁর জরুরি সরকারী বক্তৃতা তৈরী করতে চাইছেন। তরুণ ওক গাছের ছায়া, কোমল শ্যাওলা, নির্ঝরিত ঝর্ণা, রাশি রাশি ফুল, পাখির দল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে এখানে দেখে তাদের আর বিস্ময়ের সীমা নেই। কে এ লোকটি? শিল্পী? রাজপুত্র? কিন্তু বুড়ো নাইটিঙেল (rossignol) জানিয়ে দেয়: ‘উনি ছোট ম্যাজিস্ট্রেট’!

“C’est un sous-préfet! C’est un sous-préfet!”…

Les Violettes demandent:

“Est-ce que c’est méchant?”

“Est-ce que c’est méchant?” demandent les violettes.

(লোকটা কি খারাপ ? ভায়োলেট ফুলেরা জানতে চায়।)

Le vieux rossignol répond : "Pas du tout !"

(বুড়ো পাপিয়া জবাব দেয় : না—না, মোটেই না।)

তখন নির্ভয়ে পাখিরা আবার গান ধরে, ঝর্ণার জল খুশিতে উছলে ছোটে, ভায়োলেটেরা মিষ্টি গন্ধ বিলোয়—সবাই যেন মানুষটার অস্তিত্বই ভুলে যায় :

"Et sur cette assurance, les oiseux se remettent à chanter, les sources à courir, les violettes à embaumer, comme si monsieur n'était pas là......"

উপশাসকমশাই বক্তৃতায় মন দিতে চান—কিছুতেই পারেন না। শুধু চারদিকের থেকেই যেন প্রশ্ন শোনেন : কী হবে এতে ? "কী লাভ এ-সবে ?" "A quoi bon ?"

ম্যাজিস্ট্রেট চটেন—বক্তৃতাটা তৈরী করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সব মিথ্যে। প্রকৃতি তাঁকে আত্মসাৎ করে—তার মোহমদিরতা তাঁকে গ্রাস করে, এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত গুরুতর সরকারী কাজের কথা ভুলে গিয়ে, পোশাক খুলে ঘাসের ওপর পেট পেতে দিয়ে ফুলের ডাঁটা চিবুতে চিবুতে তিনি ভবঘুরের মতো কবিতা মেলাতে থাকেন :

"M. le sous-préfet était couché sur le ventre, dans l'herbe, débraillé comme un bohême. It avait mis son habit bas, et, tout en mâchonnant des violettes, M. le sous- préfet faisait des vers."

এই গল্প, এই ভাষা, এই বক্তব্য রবীন্দ্রনাথের। মনে আসে "খেয়ার" 'নিরুদ্যম' কবিতাটি :

"ভুলে গেলেম কিসের তরে
বাহির হলেম পথের 'পরে,
মেলে দিলেম চেতনা মোর
ছায়ায় গন্ধে গানে !"

কিন্তু এইসব তুলনামূলক আলোচনা ভুলে গিয়ে, 'লিপিকা'র পাঠকের মনে এবারে এই জিজ্ঞাসাই জেগে উঠবে,—ডেভিড সোয়ানের গল্পত্বে যদি সংশয় না থাকে, যদি দোদের লেখাটি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পের স্বীকৃতি পায়, আর লাগের্কভিস্টের এই ধরনের রচনাগুলিও যদি গল্পের সম্মান লাভ করে, তা হলে 'লিপিকা'র গল্পেরাই বা কেন সে মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হবে?

'তিন সঙ্গী'

রবীন্দ্রনাথের শেষ তিনটি গল্প নিয়ে 'তিন সঙ্গী' বইখানি সংকলিত। এর সর্বশেষ গল্প 'ল্যাবরেটরি'ই বইখানার সব চাইতে বড়ো আকর্ষণ। ১৩৪৭ সালের 'শারদীয়া আনন্দবাজার'-এ গল্পটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন কিছুটা চঞ্চলতার সৃষ্টিও হয়েছিল। সোহিনী চরিত্রের কল্পনায় আপাত-দুঃসাহসিকতাই তার কারণ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মুখে বাংলা ছোটগল্পে তখন ভাঁটার টান। মন্বন্তরের আগুন থেকে ক্রোধাহুত নতুন লেখকদের তখনো আবির্ভাব হয় নি। কল্লোলীয়েরা শ্রান্ত এবং স্তিমিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থ চিন্তা এবং অস্বচ্ছ আঙ্গিকে আচ্ছন্ন; প্রেমেন্দ্র মিত্র নীরব, শৈলজানন্দ চলচ্চিত্রচারী, অচিন্ত্যকুমার সরকারী চাকরি-সূত্রে তখনো উপকরণ সংগ্রহরত, দুর্গত প্রাচীন জগদীশ গুপ্ত নিষ্প্রভ, অপূর্ব সুবোধ ঘোষ নেপথ্যে। এই সময়েই 'তিন সঙ্গী'র গল্পত্রয়ীর আবির্ভাব।

স্বভাবতই বাঙালী পাঠক উচ্চকিত হয়ে উঠেছিলেন। রচনার দিক থেকে গল্প ক'টি তীক্ষ্ণ-ঝলকিত, আশ্চর্য রকমের আধুনিক। স্ট্রীম-লাইন ভাষা, বাঁকে বাঁকে সূর্যকরোজ্জ্বল উইটের ফেনপুঞ্জ, বহিরঙ্গের কলধ্বনি পরিণামে গভীর-মন্দ্রিত। ছাত্র-জীবনের শেষ পর্যায়ে এই গল্পগুলি পড়ে আমরা সেদিন ভেবেছিলাম আশী বছরের সীমান্তে এসেও এমন আধুনিক গল্প একমাত্র রবীন্দ্রনাথই লিখতে পারেন—যিনি চিরকাল আধুনিকতার অধিনায়কত্ব করেছেন।

এতদিন পরে গল্প তিনটি পড়তে গিয়ে সে বিস্ময় আর জাগে না। জাগা স্বাভাবিকও নয়। দীর্ঘকালের ব্যবধানে এখন রবীন্দ্রনাথের মন ও মননের একটা মোটামুটি বৃত্তরেখা আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে। সমকালীন ব্যক্তিত্বের সেই বিপুল প্রভাব

আর নেই, এখন মুগ্ধতার আবরণ সরে গিয়ে মহান্ শিল্পী রবীন্দ্রনাথ আরো উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত; আজকে তাঁর শিল্প-মানসের পরিণাম সূত্রেই 'তিন সঙ্গী'র গল্প তিনটিকে চেনা যায়।

'শেষের কবিতা' লেখবার সময় তার নায়ক অমিত রায়কে উগ্রতম আধুনিকতার প্রতিনিধিরূপেই রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করেছিলেন। নিবারণ চক্রবর্তীর দুর্নিবার ভূমিকায় নেমে সে রবি ঠাকুরের দলবলকে বিধ্বস্ত করতে চেয়েছিল। কিন্তু ভাষার সমস্ত তীক্ষ্ণতা, আধুনিকতার সমস্ত বাতাবরণ ভেঙে শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে এল লাবণ্য—'সুরদাসের প্রার্থনা' থেকে আরম্ভ করে যার শান্ত-শুচিস্মিত লাবণ্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চেতনা বারে বারে অবগাহন করেছে। শেষের কবিতার শেষ কবিতায় রবীন্দ্রনাথেরই জয় হল, আধুনিক অমিত রায়ের নয়। সুনীতি চাটুজ্যের পাণ্ডিত্য-কণ্টকিত ভাষা তত্ত্বের বই শিলং পাহাড়ের পাইন বনের কোমল ছায়ায় রূপালী ঝরণার স্রোতে কোথায় ভেসে গেল—তার আর কোনো সন্ধানই মিলল না। "হে বন্ধু বিদায়"-এর সুকুমার ভীরু মিনতির সঙ্গে মিশে গেল বাসনা-বিমুক্ত সুরদাসের কণ্ঠস্বর:

"বাসনা-মলিন আঁখি-কলঙ্ক ছায়া ফেলিবে না তায়,
আঁধার হৃদয় নীল-উৎপল চিরদিন রবে পায়।
তোমাতে হেরিব আমার দেবতা, হেরিব আমার হরি,
তোমার আলোকে রহিব জাগিয়া অনন্ত বিভাবরী।"

'তিন সঙ্গী'র উপকরণ এবং আঙ্গিকগত আধুনিকতার অন্তরালেও রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক মানস-প্রবাহ অন্তঃশীলা কি না, তারই একটু অনুসন্ধান করা যাক। আশা করি, তা থেকে গল্প তিনটির স্বরূপ এবং তাদের বিশিষ্টতাও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এই তিনটি গল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় সমালোচক

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী লক্ষ্য করেছেন যে বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানচিত্ত নায়ক এবং একটি বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডল রচনা করবার সচেতন প্রয়াস এদের প্রতিটির মধ্যেই রয়েছে। আর এদিক থেকে তিনটি গল্পেরই একটা সাধারণ ধর্ম অনুভব করা যায়। এই সঙ্গে একটি জিজ্ঞাসাও জাগে। এ কি শুদ্ধমাত্র উত্তরজীবনে বিজ্ঞান-চর্চার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আসক্তিরই প্রতিফলন? অথবা, এর মধ্যে তাঁর একটি ব্যাপকতর বক্তব্যের তির্যক আভাস নিহিত?

শ্রেষ্ঠ জীবনবাদী শিল্পীর মতো রবীন্দ্রনাথ চিরদিন যুগ-সচেতন, আশ্চর্য তাঁর গ্রহণশীলতা, অকুণ্ঠ তাঁর চিত্তৌদার্য। অগ্রণী কালের সঙ্গে তাঁর অদ্বৈধ পদচারণা। বিশ্বমানবের সামগ্রিক শুভ-পরিণামের প্রতি তাঁর অবিচল প্রত্যয়। ইয়োরোপের দুরন্ত যান্ত্রিক অভিযানের প্রতি সশ্রদ্ধ বিস্ময়সত্ত্বেও এইখানেই একটি সংশয় তাঁর অটল আশাবাদ এবং যুগ-চেতনাকে বারবার পীড়ন করেছে। আশৈশব ভারতীয় ভাবসাধনার একটি স্থির আদর্শ তাঁর চিত্তক্ষেত্রে ধ্যানস্থ শিবের মতো স্থির-প্রতিষ্ঠিত—শোষণবাদী যান্ত্রিকতার বিকৃতি এবং রূঢ়তা সেই শিল্পবোধের ওপর আঘাত হেনেছে, তাঁর যন্ত্রণা প্রকাশিত হয়েছে 'রক্তকরবী'তে, দেখা দিয়েছে 'মুক্তধারা'য়।

শেলী যান্ত্রিক-শোষণবাদের বিপক্ষে রক্তাক্ত মুখে প্রতিবাদ তুলেছেন, অথচ মানুষের বিজ্ঞানদীপ্ত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর আশার অন্ত ছিল না। রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক বিরূপতাও যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধেই, যন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়। তা ছাড়া শেলীর চাইতে আরো বেশি একটি সমস্যা ছিল রবীন্দ্রনাথের। তা হল ভারতীয় ভাব-সত্যের সঙ্গে ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান চেষ্টার মিলন ঘটানো, এই দুইয়ের মধ্যে একটা সুষম সামঞ্জস্য গড়ে তোলা। আমার মনে হয়, 'তিন সঙ্গী'র তিনটি গল্পের ওপর সেই মানস-সংকটেরও ছায়া পড়েছে।

একটু বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

প্রথম গল্পটির নাম 'রবিবার'। গল্পের সঙ্গে এই নামকরণের কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নেই—মাত্র অভীক যেদিন বিভার হাঁরছড়া নিয়ে ইয়োরোপে চলে যায়, সেই দিনটি রবিবার। কিন্তু সেটি বুধবার হলেও ক্ষতি ছিল না—মূল গল্পের সঙ্গে তার কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক পাওয়া যাবে না।

'যোগাযোগ' উপন্যাসের নামকরণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলেছিলেন, নামের একটা নির্দিষ্ট অর্থ-বন্ধনে গ্রন্থকে আগে থেকেই বন্দী করতে তাঁর মন সায় দেয় না। অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য এই যে, উপন্যাস, নাটক কিংবা কাব্যের যে নিজস্ব স্বাভাবিক ব্যঞ্জনাটুকু থাকে, নামের শাসন-চিহ্ন তাকে সীমায়িত করে—শিল্পীর কল্পনায় বাধার সৃষ্টি করে। 'রবিবার' নামটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা এই বাধ্যতামূলক দাসত্ব থেকে মুক্তি নিয়েছে। সমস্ত কর্মচেষ্টা, সমস্ত চাঞ্চল্য-ব্যতিরিক্ত ছুটির দিনের একটি শান্ত মাধুর্য দিয়ে গল্পটি গড়া। এই নামকরণে গল্পটি ব্যাখ্যাত হয় নি, ব্যঞ্জিত হয়েছে।

একটি মাত্র চরিত্রের ওপর গল্পটি দাঁড়িয়ে—সে নায়িকা বিভার "নাস্তিক ভক্ত অভীক"—যার পিতৃদত্ত নাম "অভয়াচরণ"। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশের ছেলে হয়েও সে দুর্দান্ত কালা পাহাড়। "চেহারাটা আশ্চর্য রকমের বিলিতি ছাঁদের", "মুষ্টিযোগ অমোঘ", আর্ট স্কুলের বাঁধা পথ ছেড়ে অতি আধুনিক শিল্পরীতিতে বেপরোয়া, সমস্ত সংস্কার-ভাঙা দুরন্ত পৌরুষের আকর্ষণে নিজের চারদিকে জড়ো করে নিয়েছে শিষ্যামণ্ডলী: "চশমাপরা তরুণীরা তার স্টুডিয়োতে আধুনিক বে-আব্রু রীতিতে যে সব নগ্ন মনস্তত্ত্বের আলাপ-আলোচনা করতে লাগল, ঘন সিগারেটের ধোঁয়া জমল তার কালিমা আবৃত করে।"

এই একান্ত দুঃসাহসী অভীক, শীলার মতো অনেক মেয়ের হৃৎপিণ্ডে "লাল রঙের আগুন" জ্বালানো যার বিলাস, মনীষার মৃত্যু-

বেদনার স্মৃতি-জড়ানো ঘড়িটি বেচতে যার বিন্দুমাত্র দ্বিধাও নেই ("এখন সে তো সুখদুঃখের অতীত") সে এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে বিভার অচঞ্চল স্নিগ্ধতার সামনে। বিভাকে পাওয়ায় যত বাধা—তার উন্মাদনা ততই বেশি। শেষ পর্যন্ত অঙ্কের অধ্যাপক 'অমরবাবু' সম্পর্কে পুরুষসুলভ অর্ধচেতন ঈর্ষ্যা এবং বিভার কাছে নিজের মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করবার দুঃসাধ্য সাধনার তাড়ায় অভীক দেশ-ত্যাগী। মনীষার ঘড়ি সম্পর্কে নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য তার কাছেই যে কতখানি মিথ্যা সেইটেই প্রমাণ হয়ে গেল, যখন দেখা গেল অভীক আর বিভার প্রথম পরিচয়ের স্মৃতিরঞ্জিত "চুনির সঙ্গে মুক্তোর মিল করা" হারছড়া বিক্রি করবার বেদনা সে কোনোমতেই সইতে পারল না।

"বী, আমার মধুকরী"—মনের সমস্ত মাধুরী দিয়ে রচিত এই সম্ভাষণের মধ্য দিয়েই রোম্যান্টিক অভীক তার আধুনিকতার সমস্ত আবরণ ফেলে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, যেমন করে অমিত রায় লাবণ্যের কাছে এসে ধরা দিয়েছিল। আসলে যৌবনসুলভ কিছু অত্যুচ্চারিত উগ্রতা ছাড়া অমিতের সঙ্গে অভীকের কোনো পার্থক্যই নেই। তার শেষ চিঠির প্রতিশ্রুতি থেকে দেখা যাচ্ছে, উগ্র আধুনিকতার জয়ধ্বজা তুলে সে বিভার কাছে ফিরে আসবে না, আসবে সার্থক শিল্পী হয়ে; শিল্পের সঙ্গে সুন্দরের মিলন রোম্যান্টিক চিন্তায় যেমন অপরিহার্য, তেমনিভাবেই বিভার কাছে এসে অভীক সেদিন সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে।

এই গল্পে অভীকের ওপর আধুনিকতার চড়া রঙ যে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আধুনিকতাকে ব্যঙ্গ করবার জন্যেই—সে সত্য এর কোথাও গোপন নেই। সংযত শান্ত-সৌন্দর্য এবং অচঞ্চল গভীর প্রেমের মহিমাই এই গল্পের শেষ কথা। রূপ এবং প্রেম সম্পর্কে এই একতম বক্তব্যই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে সর্বত্র লভ্য। আর আধুনিকতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মানসিক প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়

'শোধবোধে'র নেলীর চরিত্রে, কেটি মিত্রের "এনামেল করা গালের ওপর" চোখের জল গড়িয়ে পড়ায়, চূড়ান্তভাবে 'প্রহাসিনী'র 'আধুনিকা' কবিতায় :

"অতএব, মন, তোর কলসী ও দড়ি আন্,
অতলে মারিস ডুব মিড্-ভিক্টোরিয়ান !
কোনো ফল ফলিবে না আঁখি জল-সিচনে ;
শুকনো হাসিটা তবে রেখে যাই পিছনে !
গদ্‌গদ সুর কেন বিদায়ের পাঠটায়,
শেষ বেলা কেটে যাক্ ঠাট্টায় ঠাট্টায়।"

অতএব অভীকের চরিত্র-রচনার বহিরঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "শেষ বেলার ঠাট্টা"র আবরণ, অন্তরলোকে সুরদাসের প্রার্থনার অশ্রু আকুতি। আর তার নাস্তিকতা? বারোয়ারীর চাঁদা আদায় কাহিনী এবং সেই টাকার সদ্ব্যবহারের মধ্যেই তার নাস্তিক্যের গূঢ় অর্থটি ধরা পড়েছে। ধর্মচর্চার আচারগত তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে যে সর্বাতিশায়ী হিউম্যানিজ্‌মের মন্ত্রে 'চতুরঙ্গে'র জ্যাঠামশাই উদ্বুদ্ধ, সে সত্য তো রবীন্দ্রনাথেরও নিজস্ব।

তাই রবিবার একান্তই রাবীন্দ্রিক। নতুনত্বটুকু ভাষার তীক্ষ্ণতা আর যুগগত পরিবেশ রচনার মধ্যে।

দ্বিতীয় গল্পটির নাম 'শেষ কথা'—'ছোটগল্প' নাম দিয়ে এর আর একটি সামান্য রূপান্তরিত পাঠও প্রকাশিত হয়েছিল।

এই গল্পের নায়ক নবীনমাধব সেনগুপ্ত প্রাক্তন বিপ্লবী। বিপ্লববাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত বিরূপতা নবীনমাধবের চিন্তাতেই প্রকাশ : "সে যেন আতশবাজিতে পটকা ছোঁড়ার মতো, তাতে নিজের পোড়া কপাল পুড়িয়েছি অনেকবার, দাগ পড়েনি ব্রিটিশ রাজতক্তে।" অতএব আমেরিকা-প্রবাসী মোহমুক্ত বিপ্লবী

দেশকে গড়বার নতুন পথ খুঁজে পেল, বুঝল, বড়ো হতে গেলে "এ যুগে যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রের দিতে হবে পাল্লা।"

নবীনমাধব ফিরল ভূতত্ত্ববিদ্ হয়ে। সে-ও অতীকের মতোই শক্ত, কঠিন,—কাজের মানুষ, বাঙালী-সুলভ ললিত-লাবণ্য তার দেহে মনে কোথাও নেই। দেশের কল্যাণ-সাধনায় নিজের সমস্ত বাসনা-বেদনাকে সে বিসর্জন দিয়েছে, বিদেশিনী ক্যাথারিনের প্রেমকেও উপেক্ষা করতে পেরেছে একই সংকল্পে।

কিন্তু ছোটনাগপুরের শ্যামল বনভূমিতে একদিন বিজ্ঞান-তপস্বীর ধ্যানভঙ্গ হল অকস্মাৎ। অচিরা দেখা দিল "কুসুমিত শালগাছের ছায়ালোকের বন্ধনে।" আর মনে হল, বাঙালী মেয়ের "শ্যামল দেহের কোমলতায় বনের লতাপাতা আপন ভাষা যোগ করে দিলে।...জানিনে কেন মনে হোলো সেই গানের সহজ রাগিণীতে ওই বাঙালী মেয়েটির রূপের ভূমিকা—মনে রইল সই মনের বেদনা।"

তারপর অচিরার সঙ্গে পরিচয়—তার দাদু ডক্টর অনিলকুমার সরকারের সন্নিধ্যে আসা। অচিরার নিভৃত বেদনার কেন্দ্রটি যে কোথায় তাও জানতে বাকী রইল না। দাদু এবং নাতনীর বানপ্রস্থের নেপথ্যে আই. সি. এস ভবতোষ মজুমদারের হীন ভূমিকাটিও স্পষ্ট হয়ে উঠল অবিলম্বেই।

সবই অনুকূল ছিল। নবীনমাধবের পৌরুষ-প্রখর জ্ঞানসাধক সত্তা অচিরাকে আকর্ষণ করেছিল, আরণ্য-প্রকৃতির সঙ্গে শ্যামল রূপের ছন্দ মেলানো অচিরা নবীনমাধবের শ্রান্ত-নিঃসঙ্গতায় ছায়াশ্রয়ের প্রত্যাশা নিয়েও এসেছিল। তবু নবীনমাধব অচিরাকে পেল না। বাধাটা এল অচিরার দিক থেকেই।

ভবতোষ তাকে ঠকিয়েছে। তবু তার প্রতি "ভালোবাসার সতীত্ব" থেকে অচিরা বিচ্যুত হতে রাজী নয়। ভবতোষকে সে শ্রদ্ধা করতে পারে না, তার কাছে সে ফিরেও যেতে চায় না;

কিন্তু "সে আর আমার সেই জীবনের প্রথম ভালোবাসা, এক নয়। এখন আমার কাছে সেই ভালোবাসা ইম্পার্সোনাল। কোনো আধারের দরকার নেই।"

প্লেটোর সিম্পোসিয়ামের চরম উদাহরণ এইখানেই। এর অবস্থান রোম্যাণ্টিকতার কুয়াশায় ঢাকা কোনো তুঙ্গতম শিখরে। কিন্তু আরো ছুটি কথা আছে।

প্রকৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি বিরোধী মনোভাব এই গল্পে দেখা দিয়েছে। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রবণতা-অনুযায়ী প্রকৃতি এখানে অপাপবিদ্ধ ঐশ্বরিক শুচি-সৌন্দর্যের পরিবাহ নয়; অচিরা এই বনভূমির মধ্যে আদিম অন্ধ-শক্তির একটা দুঃসহ আকর্ষণকে উপলব্ধি করেছে, যা মানুষের চিত্তশক্তিসঞ্জাত আদর্শকে ভেঙে দেয়—এবং যা অচিরার "ভালোবাসার সতীত্ব"কে বিচলিত করে তুলেছিল। তাই আদর্শের সত্যকে রক্ষা করতে গিয়ে নবীনমাধবের প্রতি তার মনের যে জৈব আদিম আকর্ষণ তীব্র হয়ে উঠেছিল, তাকে কঠিনভাবে প্রতিরোধ করেছে অচিরা।

কিন্তু প্রকৃতি এখানে প্রতীক মাত্র—আসল কথাটা হল প্রাকৃতিক। জৈবতা-সমুদ্ভ যে প্রেম, যার ওপর আরক্তিম লালসার বর্ণরাগ—সে প্রেম যে শেষ পর্যন্ত কল্যাণ আনে না, এ প্রত্যয় রবীন্দ্রনাথের প্রেম-সিদ্ধান্তের অঙ্গাঙ্গী। অচিরার ভালোবাসার ইম্পার্সোনাল রূপ অদেহী ভবতোষকে কেন্দ্র করে স্তব্ধ হয়ে আছে, আর দেহজ কামনা ছুটে চলেছে নবীনমাধবের দিকে। এই কামনাকে কি কখনো স্বীকার করতে পারেন রবীন্দ্রনাথ—কখনো তাকে প্রশ্রয় দিতে পারেন? লাবণ্য তার মনকে অমিত আর শোভনলালের জন্য দ্বিধা বিভক্ত করে নিতে পেরেছে কিন্তু নবীন-মাধব তো স্তিমিত শোভনলাল নয়। তার পৌরুষ প্রখর—তার চাওয়ার মধ্যে কোন ফাঁকিকে সে স্বীকার করতে পারবে না। সে বৈজ্ঞানিক মানুষ, পূজাময় প্রেম তার ক্ষুধা মেটাবে না।

সেই জন্যই নবীনমাধবকে বঞ্চনা করতে পারে নি অচিরা, তার পক্ষে আরো কঠিন হয়েছে জৈব-বাসনার কাছে আত্মসমর্পণ করা।

শেষ কথার আর একটি শেষ কথা আছে। এ যেন 'কচ ও দেবযানী'কে বিপরীত ভাবে উপস্থিত করা—এখানে দেবযানী স্বেচ্ছায় তাপস কচকে মুক্তি দিয়েছে। কুমার-সম্ভবের পূর্বপর্যায়ে শঙ্করের অগ্নিনেত্রের সম্মুখে মদন ভস্ম হয়েছিল, অসীম স্পর্ধায় যোগীর ধ্যান ভঙ্গ করতে চেয়েছিল সে; অচিরাও তার রূপমোহ দিয়ে তপস্যাশ্রিত নবীনমাধবের বিঘ্ন ঘটাতে চায় না—তাই অজ্ঞাতে যে শৃঙ্খল সে গড়ে তুলছিল, সচেতন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই তা ছিন্ন করে দিয়ে গেছে।

প্রেম দিয়ে যে গল্পের আরম্ভ, আইডিয়া উপস্থিত করে তার সমাপ্তি। ঠিক সমাপ্তি বলব না, কারণ বাস্তবের বিচারে অচিরার ইম্পার্সোনাল ভাবের আধারটি এবং "ভালোবাসার সতীত্ব" কতখানি টেঁকে বলা শক্ত। এ আইডিয়ালিস্ট রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সুপরিচিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি সমাধান মাত্র। গল্প এখানে বক্তৃতা দিয়ে শেষ হয়েছে। 'তিন সঙ্গী'র দলে 'শেষ কথা'ই দুর্বলতম এবং সব চাইতে অনাধুনিক।

'তিন সঙ্গী'র শেষতম, দীর্ঘতম এবং সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর গল্প হল 'ল্যাবরেটরি'। প্রসঙ্গত, এটি কবির উল্লেখযোগ্য শেষ গল্প রূপেও প্রচারিত।

এই গল্প লিখে রবীন্দ্রনাথ দেশের কাছ থেকে কী প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশা করেছিলেন তা অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশের কাছে তাঁর উক্তিতেই প্রকাশ:

"আর সকলে কি বলছে? একেবারে ছি ছি কাণ্ড তো?

নিন্দায় আর মুখ দেখানো যাবে না। আশি বছর বয়সে রবি ঠাকুরের মাথা খারাপ হয়েছে—সোহিনীর মতো এমন একটা মেয়ের সম্বন্ধে এমন করে লিখেছে।”

রবীন্দ্রনাথ আরো অনুমান করেছিলেন, তাঁর এই গল্পটি সকলে বুঝবে না, এর অন্তরাল-নিহিত তাৎপর্যটি অনুধাবন করা অসতর্ক পাঠকের পক্ষে সম্ভবও হবে না; সোহিনীর চরিত্র-রহস্যের গভীরতাও তাদের কাছে অপরিচিত থেকে যাবে। এই আশঙ্কা আংশিক ভাবে হয়তো সত্য, কিন্তু বাংলা দেশের পাঠক ‘ল্যাবরেটরি’ গল্পটির ক্ষেত্রে অতখানি বেরসিক মনের পরিচয় দেয়নি, এ কথাটি নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

বৈজ্ঞানিক এবং সর্ববিধ সংস্কারমুক্ত নন্দকিশোরের ব্যক্তিত্বের ছায়া সমস্ত গল্পটির ওপর দিয়ে পূর্বাপর বিকীর্ণ হয়ে আছে, যদিও গল্পের সূচনাতেই তাঁর কায়িক মৃত্যু ঘটেছে। তাঁর জীবনসঙ্গিনী (স্ত্রী বলা সম্ভব কিনা জানি না) সোহিনী এই গল্পের অধিনায়িকা। নন্দকিশোরের ল্যাবরেটরির যোগ্য অধিকারীর জন্য সোহিনীর সন্ধান এবং পরিণামে তার সকরুণ ব্যর্থতাই গল্পের বক্তব্য। কাহিনীটির স্তর-বিন্যাসও অপূর্ব।

‘তিন সঙ্গী’র প্রথম গল্পদুটি প্রেমকেন্দ্রিক—‘ল্যাবরেটরি’ আইডিয়া এবং প্রতীক প্রধান। ‘রবিবার’ বা ‘শেষ কথা’র নামকরণ বিশেষভাবে কোনো অর্থবহ নয়, কিন্তু ‘ল্যাবরেটরি’র ক্ষেত্রে ঠিক উল্‌টো—নামের মধ্যেই গল্পটির বক্তব্য উচ্চারিত হয়েছে।

কিসের ল্যাবরেটরি? মনে হয় ফিজিক্সের। কিন্তু কী আসে যায় তাতে? আসলে এই ল্যাবরেটরিতে সোহিনী পৌরুষের পরীক্ষা নিতে বসেছে। কে আছে এমন দৃঢ়চেতা পুরুষ যে বজ্রদৃঢ় মন নিয়ে এই ল্যাবরেটরিতে জ্ঞানের সাধনায় বসতে পারে—এমন নির্মোহ জিতেন্দ্রিয় কে আছে যে উগ্র মদের মতো নীলার বিষাক্ত যৌবনের প্রলোভন এড়িয়ে তপস্যায় মগ্ন হয়ে যেতে পারে?

সোহিনীর পরীক্ষার ফল 'নেগেটিভ'—ডক্টর রেবতী ভট্টাচার্যের পরাভব সোহিনীর করুণতম বেদনায় রঞ্জিত।

সোহিনী পাঞ্জাবের মেয়ে—কোনো সুরুচিময় ভদ্র পরিবেশ থেকে তার আবির্ভাব হয় নি। নন্দকিশোরের সঙ্গে তার মিলন শয়তানের সঙ্গে শয়তানীর আত্মিক ঐক্যে। নৈতিক-চরিত্রের বিচারে সে নিরঙ্কুশ—নন্দকিশোরের মেয়ে বলে পরিচিতা নীলা আসলে যে কার সন্তান তা সোহিনী নিজেও জানে না। তবুও আমৃত্যু সোহিনী নন্দকিশোরের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয় নি, তার কারণ সোহিনীর শক্তি—তার "ক্যারেকটরের তেজ।" সেই জন্যেই মৃত্যুকালে নন্দকিশোর তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আর ল্যাবরেটরির ভার তারই ওপর সঁপে দিয়ে গেছেন, তিনি জানেন সোহিনীই এর সত্যিকাবের মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে।

সুতরাং শুরু হয়েছে সোহিনীর উপযুক্ত উত্তর-সাধকের সন্ধান—তার সঙ্গী আছেন অধ্যাপক মন্মথ চৌধুরী—যিনি পরিণত বয়সে, প্রখর বুদ্ধি এবং নির্মোহ প্রজ্ঞার অধিকারী। সোহিনীর তাঁর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা। এই অধ্যাপক চৌধুবীই রেবতী ভট্টাচার্যের সন্ধান দিয়েছেন। অসীম সম্ভাবনা আছে বেবতীর মধ্যে; অসামান্য মেধাবী পুরুষ সে। কিন্তু তার ভাগ্যাকাশ জুড়ে আছেন একটি 'স্ত্রী রাহু"—তিনি তার পিসীমা। এই পিসীমাগ্রস্ত রেবতীকেই উদ্ধার করে বসাতে হবে সার্থকতার কর্মযজ্ঞে।

এক নারীর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ থেকে উদ্ধার করার জন্য আর এক নারীকে ব্যবহার করল সোহিনী—সে নীলা, তারই গর্ভজাতা কন্যা। উগ্র রূপ, অর্থের লোভ আর সোহিনীর কামনার সমস্ত কলুষ নিয়ে গড়া এই নীলা—রেবতীকে টেনে আনবার জন্য মেয়ের সম্মোহনী মাদকতাকেই উপচার করল সোহিনী। রেবতী এল। তখন নীলা চাইল মোহের জালে রেবতীকে জড়িয়ে তাকে দিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে, সোহিনী চাইল তাকে নন্দকিশোরের সাধনার

আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে। মা আর মেয়ের এই নগ্ন নিষ্ঠুর প্রতি-যোগিতায় শেষ পর্যন্ত কারোই জিত হল না, হঠাৎ একটা ছায়া পড়ল দেওয়ালে। পিসিমা এসে দাঁড়ালেন। বললেন, "রেবি, চলে আয়।"

'সুড় সুড় করে রেবতী পিসিমার পেছন পেছন চলে গেল, একবার ফিরেও তাকাল না।'

পিসিমাই ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন রেবতীকে। একটা চরম ট্র্যাজিডির মধ্যে গল্প শেষ হল।

সোহিনীর কনভেনশ্যন-ভাঙা চরিত্র-কল্পনায়, নীলার লালসার নির্লজ্জতায় কিংবা অতি আধুনিকদের বোহেমিয়ান উদ্দামতায় আপাতদৃষ্টিতে 'ল্যাবরেটরি' চমকপ্রদ। কিন্তু বক্তব্যের প্রয়োজনে চরিত্রগুলি যেখানে প্রতীকের মধ্যে প্রসারিত—সেখানে তাদের বাইরের পরিচয় 'ল্যাবরেটরি'র মূল উদ্দেশ্যকে প্রভাবিত করে না। স্বামীর সাধনাকে সম্পূর্ণ করবার জন্য ব্রতচারিণীর মতো ঋত্বিক-সন্ধানের যে দায়িত্ব সোহিনী নিয়েছে তাতে তার ব্যক্তি-জীবনের সতীত্ব-অসতীত্বের সমস্ত প্রসঙ্গই অবান্তর হয়ে গেছে। নীলার চরিত্রকে এতটা উদগ্র এবং জান্তব করে তোলা হয়েছে শুধু রেবতীর চরিত্র-শক্তিকে যাচাই করে নেওয়ার জন্যেই—পৌরাণিক গল্পের ঋষির তপস্যাকে যেমন অপ্সরীর ছলনা দিয়ে পরীক্ষা করে নেওয়া হত। কিন্তু সমস্ত ঋষিই যেমন জিতেন্দ্রিয়তার খ্যাতি অক্ষুণ্ন রাখতে পারেন নি, তেমনি রেবতীর ক্ষেত্রেও সোহিনীর প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়ে গেছে। 'বীরের বীর্যপরীক্ষায়' মোহিনী মায়ারই জয় হয়েছে শেষ পর্যন্ত। অথবা তারও অধম—পিসীমার আঁচলের তলায় রেবতীর অপমৃত্যু হয়েছে।

নীলার রূপবর্ণনা থেকে আরম্ভ করে "জাগানী ক্লাবে"র নারীহরণের রিহার্সাল পর্যন্ত যে উগ্র আধুনিকতার অঙ্গসজ্জা এই গল্পে আছে, 'ল্যাবরেটরির' ক্লাসিক নীতিমূলকতার তা প্রেক্ষাপট মাত্র। এর জ্ঞান-জিজ্ঞাসার উজ্জ্বল সত্যটিকে ফুটিয়ে তুলতে এরা কনট্রাস্টের ভূমিকা নিয়েছে। আসলে এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি

পিউরিটান। পাপের রঙ গভীর কালো হলেই পুণ্যের শুভ্রতা যেমন বেশি প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে, 'ল্যাবরেটরি'র কল্যাণ-ধ্রুব বক্তব্যটিও তেমনি করে এর আপাত-অসংযমের ওপর শিখার মতো প্রজ্বলিত।

প্রাচীন ভারতীয় সাধনার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করাই এই গল্পের মর্মবাণী। যেমন অতীতের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায়, তেমনি এযুগের বস্তু-জিজ্ঞাসায়ও সাধকের একই পদ্ধতি—একই পরীক্ষা। সংযতেন্দ্রিয়, অটলচিত্ত, প্রলোভনবিজয়ী। সে প্রযোজন ভারতীয় শুকদেবের, ইয়োরোপীয় আইনস্টাইনের। অপ্সরার রূপে ভারতের সাধক আত্ম-বিস্মৃত হন না—বিদেশী সরকারের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ ডলার ঘুষের বিনিময়েও কি তাদের কাছে নিজের নতুন আবিষ্কার বিক্রী করে দিতে পারেন কোনো সুবুদ্ধি, দেশপ্রেমিক বৈজ্ঞানিক ?

তাহলে 'ল্যাবরেটরি' গল্পেও 'স্বদেশ' এবং 'শান্তিনিকেতনে'র রবীন্দ্রনাথকেই পাওয়া গেল। এখানে যদি রবীন্দ্রতর কিছু পাওয়াই যায়, তা হলেও রাবীন্দ্রিকতাই তারই ভিত্তি।

সূচনাতেই বলেছিলাম, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে একটা ভাবগত সামঞ্জস্য রচনা করাই রবীন্দ্রনাথের আমৃত্যু কামনা ছিল। 'তিন সঙ্গী'র তিনটি গল্পেও তার তির্যক রূপায়ণ দেখতে পাচ্ছি। ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানবুদ্ধির প্রতি পক্ষপাত প্রতিটি গল্পেই পরিস্ফুট, কিন্তু শান্তি আর সংযমের মধ্যেই যে তার চরম পরিণতি—তা-ও এই সব গল্পের শেষ কথা। রবীন্দ্রনাথ ইয়োরোপে দেখেছেন শক্তি, ভারতবর্ষে পেয়েছেন সুষমা। অভীকের শক্তি তাই বিভার সুষমার মধ্যে এসে পূর্ণতা পেয়েছে, বৈজ্ঞানিক নবীনমাধব ভারতীয় আদর্শ অনুযায়ী তপস্বী কচের মতো দেবযানীর প্রভাব প্রাকৃতিক থেকে মুক্তিলাভ করেছে আর সোহিনীর যজ্ঞবেদী এখনো প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে—ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানের শক্তিতে মন্ত্রসিদ্ধ হয়ে ভারতীয় কঠিন সংযমে তাতে অগ্নিচয়ন করবে—এমন ঋত্বিক আজো পাওয়া যায়নি।

"সে"

॥ এক ॥

একেবারে একই সময়ে, মাত্র কয়েক মাসের আগে পরে, দু খানি বই প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। 'সে' এবং 'খাপছাড়া।' 'খাপছাড়ার' ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ তারিখ দিয়েছেন ১৬ই পৌষ, ১৩৪৩, 'সে'র উৎসর্গ কবিতার নীচে তারিখ রয়েছে 'পৌষ, ১৩৪৩'। 'খাপছাড়া'র প্রথম মুদ্রণ 'মাঘ, ১৩৪৩', 'সে'র প্রথম প্রকাশ 'বৈশাখ, ১৩৪৪'।

'খাপছাড়া' ছড়ার বই, 'সে' গল্পের। তারিখের এই আগে-পিছেটুকু খুব সম্ভব গদ্য এবং পদ্য ছাপবার মধ্যে যে সময়ের হের-ফের ঘটে থাকে, তারই জন্যে। দুই যমজ ভাইবোনের মতো এই বই দুখানিও সহজন্মসূত্রে বাঁধা—দুটি বইয়েরই উদ্দেশ্য এক।

উদ্দেশ্য কী? "একেবারে যা-ইচ্ছে তাই; মাথা নেই, মুণ্ডু নেই, মানে নেই মোদ্দা নেই এমন একটা কিছু।" শরতের আকাশে হাল্‌কা মেঘ যেমন থেকে থেকে রূপ বদলায়—কখনো বাঘের মাথা, কখনো রূপকথার দৈত্য, কখনো ঝিমুনির ঘোর-লাগা কোনো আদ্যিকালের বুড়ী, কখনো বা একটা পাল-তোলা নৌকো—পলে পলে এইরকম খেয়ালের বদল, রূপ-রঙ-রেখার বদল। যে কাজের মানুষ প্রজাপতি সারাদিন গুরু-গম্ভীর বাঁধা নিয়মে সৃষ্টি করবার পর সন্ধ্যার ঘুমে মুক্তি আর চিন্তার পারম্পর্যহীন স্বপ্নের জাল বুনে চলেন—তাঁর সেই স্বপ্নগুলোর মতো 'ভারহীন-দায়হীন' কিছু গড়ে-তোলা। 'সে'র উৎসর্গে বলা হয়েছে:

"মেঘের ফুরোল কাজ এইবার।
সময় পেরিয়ে দিয়ে ঢেলেছিল জলধার,
সুদীর্ঘকালের পরে নিল ছুটি।

উদাসী হাওয়ার সাথে জুটি'
রয়েছে যেন সে অন্যমনে
আকাশের কোণে কোণে
ছবির খেয়ালে রাশি রাশি,
মিশেছে তাহার সাথে হেমন্তে কুয়াশা-ছোঁওয়া হাসি।
দেব পিতামহ হাসে স্বর্গের কর্মের হেরি হেলা,
ইন্দ্রের প্রাঙ্গণতলে দেবতার অর্থহীন খেলা।

আমারো খেয়াল ছবি মনের গহন হোতে
ভেসে আসে বায়ুস্রোতে।
নিয়মের দিগন্ত পারায়ে
যায় সে হারায়ে
নিরুদ্দেশে
বাউলের বেশে—"

'সে'-র উৎসর্গে যে-কথাগুলো গভীর সুরে বলা হয়েছে, তারই লঘু প্রতিধ্বনি 'খাপছাড়া'র উৎসর্গে। চতুরানন ব্রহ্মার তিনটি মুখে দর্শন, বেদ এবং কবিতার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থিতি, কিন্তু চতুর্থমুখে?

"নিশ্চয় জেনো তবে
একটাতে হো হো রবে
পাগ্‌লামি বেড়া ভেঙে উঠে উচ্ছ্বাসিয়া।
তাই তারি ধাক্কায়
বাজে কথা পাক খায়
আওড় পাকাতে থাকে মগজেতে আসিয়া।"

প্রথম বইটিতে ব্রহ্মার খেয়ালের স্বপ্ন, দ্বিতীয়টিতে তাঁর পাগলামির অট্টহাসি। কিন্তু দুই-ই এক। অবসরের আনন্দে, খেলার খুশিতে, স্বপ্নের জাল বোনবার খেয়ালিপনায়, রবীন্দ্রনাথের উত্তর-জীবনে এই বই দুখানির আবির্ভাব।

॥ দুই ॥

কিন্তু এতো গেল বাইবের দিক থেকে। আরো সতর্কভাবে দেখ্‌তে গেলে প্রথমেই মনে হবে যে বইদুটি নামতঃ শিশুদের জন্যে হলেও আসলে এরা শিশু-সাহিত্য নয়। 'খাপছাড়া'য় বিশুদ্ধ ছোটদের ছড়া অবশ্য অনেকগুলোই আছে; খেয়াল এবং কৌতুক-নির্ভর এই ছড়াগুলোর সঙ্গে এডোয়ার্ড লীয়রের লিমারিকের মিল আছে, বাংলা দেশের ছড়ার সঙ্গেও এদের অলক্ষ্য যোগসূত্র অনুভব করা যায়। এদের ভেতরে 'দামোদর শেঠ' আছে, 'ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির পাঁচ বোনেরা' আছে, 'আধখানা বেল খেয়ে' যে 'একখানা বেল' চায় সেই কানু আছে, 'বহুকোটি যুগ পরে সহসা বাণীর বরে' জলচর প্রাণীরা কণ্ঠ লাভ করলে কী ঘটতে পারে তার বিবরণ আছে, "স্বপ্নে দেখি নৌকো আমার নদীর ঘাটে বাঁধা"র মতো চমৎকার শিশু-কবিতা আছে, 'হাতির হাঁচি' শোনবার জন্যে যে কেষ্টা নেপালের বনে বনে ঘুরেছিল, তার মনোরম আখ্যান আছে। আবার নন্‌সেন্স-রাইমের অপূর্ব উদাহরণ আছে এইসব কবিতায়ঃ

"ভূত হয়ে দেখা দিল
বড়ো কোলা ব্যাঙ,
এক পা টেবিলে রাখে
কাঁধে এক ঠ্যাঙ্‌—"

কিংবাঃ "দাড়ীশ্বরকে মানৎ করে
গোঁপ-গাঁ গেল হাবল
স্বপ্নে শেয়াল কাঁটা পাখী
গালে মারল খাবল—" ইত্যাদি।

তবুও 'খাপছাড়া' ছোটদের জন্যে নয়। সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল'-এর সঙ্গেও তুলনা করা চলবে না—তার কবিতাগুলোর

বহিরঙ্গে শিশুদের জন্যে কৌতুক, অন্তরঙ্গে বড়োদের জন্যে রূপক। 'খাপছাড়া'র দশ আনা ছড়াতেই রবীন্দ্রনাথ এই রূপকের আবরণটুকুও রাখেননি। অসংখ্যের ভেতর থেকে একটি উদাহরণই যথেষ্ট :

দিন চলে না যে নিলেমে চড়েছে
খাট-টিপাই ;
ব্যবসা ধরেছি গল্পেরে করা
নাট্যি-fy।
ক্রিটিক মহল করেছি ঠাণ্ডা,
মুর্গি এবং মুর্গি আণ্ডা
খেয়ে করে শেষ, আমি হাড় দুটি-চারটি পাই,
ভোজন-ওজনে লেখা করে দেয় certify॥

'খাপছাড়া'র পরিচয় এই প্রসঙ্গে আলোচ্য নয়; কিন্তু এই বইটির সহজাতক 'সে'র চরিত্র-ধর্মও এর থেকেই খানিকটা বুঝতে পারা যাবে। 'সে'-তেও প্রধান প্রেরণা নীলোজ্জ্বল আকাশে লঘু মেঘ ভাসিয়ে দেওয়ার মতো কিছুটা সহজ কৌতুক—দুটি একটি গল্প একেবারেই ছোটদের মন ভোলাবার জন্যে। কিন্তু এর আসল রহস্য অন্য জায়গায়। এই বইতে বড়োদের দৃষ্টি দিয়ে ছোটদের মনের রহস্য বোঝবার চেষ্টা; ছোটদের গল্প কী হতে পারে তাই নিয়ে নানা ধরণের এক্‌সপেরিমেণ্ট; ভাঙচুর করা; প্রসঙ্গত আধুনিক সাহিত্য আর একালের মানসিকতাকে কিছু কিছু নির্মল কৌতুকের আঘাত দেওয়া; আর সব শেষে সুকুমার আর পুপে দিদিকে নিয়ে একটি গভীর গল্পের ব্যঞ্জনা—জীবনের সমস্ত হাসিই যে অশ্রুর বৃন্তে মুকুলিত—সেই নিবিড় সত্যটিকে আভাসিত করা।

এই বইয়ে গল্প গড়বার কাজে ভূমিকা তিনজনের। লেখক আছেন, ন-বছরের নাৎনী পুপে আছে, আর আছে "সে"। রাজপুত্র

নয়, সওদাগরপুত্র নয়—একেবারে কাছের রক্তমাংসের মানুষ—খিদে পেলে যে 'ফরমাস করে মুড়োর ঘণ্ট,-লাউ-চিংড়ি, কাঁটাচচ্চড়ি, বড়োবাজারের মালাই পেলে বাটিটা চেঁচেপুঁছে খায়।' বর্ষার দিনে সারা গায়ে জল-কাদা মেখে ঘরে ঢোকে, বেসুরো বিকট গলায় গান ধরে :

'ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে
নিতান্ত কৃতান্ত ভবান্ত হবে ভবে।'

এই "সে"-কে নায়ক করেই বেশির ভাগ গল্প—অন্য গল্পও দু-একটি আছে। লেখক এ-কথাও বলে নিয়েছেন, "সে" আসলে বাস্তব মানুষ, সুপুরুষ, সুগম্ভীর। 'রাত্তিরে যেমন তারার আলোর ছড়াছড়ি, ওর গাম্ভীর্য তেমনি চাপা হাসিতে ভরা। ও পয়লা নম্বরের মানুষ, তাই কোনো ঠাট্টা মস্‌করায় ওকে জখম করতে পারে না।' এহেন একটি বাস্তব মানুষকে যত বিদ্‌ঘুটে গল্পের নায়ক করা হয়েছে কেন? রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'ওকে বোকার মতো সাজাতে আমার মজা লাগে, কেননা ও আমার চেয়ে বুদ্ধিমান। অবুঝের ভান করলেও ওর মান হানি হয় না; সুবিধে হয়, পুপুর সঙ্গে ওর স্বভাবের মিল হয়ে যায়।'

॥ তিন ॥

সুতরাং শুরু হল ন-বছরের একটি মেয়ের জন্যে গল্প তৈরীর কাজে দুটি বয়স্ক পুরুষের সরস আলোচনা, বিচার আর পরীক্ষার পালা। প্রথমেই লেখক তৈরী করলেন হুঁ হাঁউ দ্বীপ নিয়ে একটি বৈজ্ঞানিক রসিকতা—যেখানে নির্বাক পণ্ডিতেরা হৃৎযন্ত্রকে দুর্বিপাক থেকে বাঁচাবার জন্যে হামাগুড়ি দিয়ে চলে, আর ঘাসের থেকে সবুজ সার নিষ্কাশিত করে তারই নস্যি মুঠো মুঠো নাকের ভেতরে

ঠেসে দিতে থাকে। দেখা গেল গল্প তেমন জমল না—কাহিনীটা পুপেদিদির একটুও পছন্দ হয়নি। কিন্তু গল্পের শেষে যে সিদ্ধান্ত বাক্যটি পাওয়া গেল সেটি একেবারে লেখকের মনের কথা—"আমি ভাবছি, হুঁ হাউ দ্বীপে গিয়ে বাস করব, জম্বুদ্বীপ বকিয়ে মারল আমাকে, আর পেরে উঠছিনে।"

দ্বিতীয় গল্প এল। এটি "শিবাশোধন সমিতি"র রিপোর্ট। গল্পের নায়ক হৌ-হৌ নামে একটি উচ্চাভিলাষী শেয়াল—সে আত্মিক উন্নতির জন্যে মানুষ হতে চেয়েছিল।

সেই শুভকাজে প্রথমেই তার নাম "হৌ-হৌ" বদলে করতে হল শিবুরাম, সেটা শেয়ালের পছন্দ না হলেও মেনে নিতে হল। তারপর এল ল্যাজ কাটবার পালা—শেয়ালের মুখ একেবারে শুকিয়ে গেল। কারণ 'সাধারণ শেয়ালেরা ওর নাম দিয়েছিল, "খাসা লেজুড়ি।"যারা 'শেয়ালি সংস্কৃত জানত তারা সেই ভাষায় ওকে বলত "সুলোম-লাঙ্গুলী"। মানুষ হওয়ার আশায় সেই প্রিয়তম ল্যাজও তাকে বিসর্জন দিতে হল। সব শেষে রোঁয়াচাঁছার নিদারুণ পর্ব এবং উপসংহারে মোহ-মুক্ত শেয়ালের মনের দুঃখে কেঁদে কেঁদে বেড়ানো :

ওরে ল্যাজ, হারা ল্যাজ, চক্ষে দেখি ধুঁয়া।
বক্ষ মোর গেল ফেটে হুক্কা হুয়া হুয়া।

কিন্তু এ গল্পও জমল না। কারণ, ছোটদের গল্পে তত্ত্ব আর বুদ্ধির চাতুর্য অচল। 'সে' লেখককে বলেছে, "বুদ্ধির ঝাঁজে তোমার রস যাচ্চে শুকিয়ে।...ল্যাজকাটা শেয়ালের কথা শুনে পুপুদিদির চোখ জলে ভরে এসেছিল দেখতে পাওনি বুঝি?"

তা হলে এই গল্পও শিশুর জন্যে নয়। এবার 'সে' নামল আসরে, শোনালো 'গেছো বাবা'র উপাখ্যান। যে দেবতা বাঁদরের রূপ ধরে চালতে গাছ, কয়েৎ বেল গাছের ডালে ডালে লাফিয়ে

বেড়ান, তাঁর "শ্রীল্যাজ গলায় বেঁধে অন্তিমে চক্ষু বন্ধ" করবার জন্যে গোবরা-উধো পঞ্চুর আকুল প্রার্থনা। কিন্তু :

"ওহে কমবুদ্ধি, হাসাতে পারলে ?"

না। যে-মানুষ সবই বিনা বিচারে বিশ্বাস করতে পারে তাকে হাসানো সোজা নয়।"

'সে'-র কাহিনীমালায় অতঃপর একটির পর একটি গল্প রচনার চেষ্টা। তাতে চূড়ান্ত খামখেয়ালী দিয়ে গড়া, স্বপ্ন আর রসিকতার মালা গাঁথা 'সে-'র মেয়ে দেখা আর বিয়ের কাহিনী আছে ; বাঘেরা যে আসলে কত অন্তরঙ্গ, রসিক আর 'হাসিয়ে', সেইটে বোঝাবার জন্যে পুপেদিদির সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা আছে, পুঁটুর কাছে গায়ের কালো দাগ ওঠাবার জন্যে বাঘের 'গ্লিসারিন সোপ' প্রার্থনা আছে, বটুরাম ন্যাড়ার পাল্লায় পড়ে লোভী বাঘের দুর্গতির বিবরণ আছে। সরস গল্প হিসেবে সব চাইতে জমে উঠেছে গাঁজাখোর পাতু ঘোষালের গায়ের মধ্যে 'সে'র প্রবেশ-বৃত্তান্ত, একেবারে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ডমরুধরের কাহিনীকে মনে করিয়ে দেয়। 'সে'র মাথায় বানরের মগজও মন্দ নয়—যদিও তার লক্ষ্য বা ব্যঙ্গ অন্যত্র। এই পর্যায়ের শেষ গল্প এসেছে খরগোষের পিঠে চেপে পুপুর চাঁদের দেশে যাত্রায়—ঘণ্টাকর্ণের দু কানে বাঁধা ঘণ্টার শব্দ শুনতে শুনতে।

এই গল্পেই দেখি তিনজনের আসরে চতুর্থ সংযোজন—'সুকুমার।' সে রূপকথার সেই রাজপুত্র—যে পক্ষীরাজের পিঠে উঠে চাঁদের দেশে পুপের সন্ধান করতে যাবে। পুপে বড়ো হয়েছে—এখন ছেলেবেলাকার ছেলেমানুষি গল্প শুনতে সে কৌতুক বোধ করে। 'সে'কে আবার দেখা যায়, কিন্তু গল্পের প্রয়োজনে নয়—বেসুরো আধুনিকতার সরস ব্যাখানের আসরে। বইয়ের সমাপ্তি ঘটেছে সুকুমারের আকাশ-প্রদক্ষিণের পথে হারিয়ে যাওয়ার ভেতরে—যে ছবি আঁকা শিখতে চেয়েও অনুমতি পেলনা, শেষে

ইয়োরোপে গেল 'কলের পক্ষীরাজকে বাগ মানাতে।' আর সুকুমারের হারিয়ে যাওয়ার ভেতরে তার চিরকালের প্রতিদ্বন্দ্বিনী পুপু যে বেদনায় বিবর্ণ হয়ে গেছে, তারই ওপরে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলে লেখক বই শেষ করেছেন।

অর্থাৎ, গল্প গড়তে গিয়ে চেষ্টা তো অনেক করা হল; কিন্তু কিছুতেই মনের মতো গল্প মিললনা। জীবনের গল্পই যে সব চাইতে সত্য—মানুষের হৃদয়ের পটে চিরকালের বেদনার অক্ষরেই যে সব চেয়ে মহৎ গল্প লেখা হয়ে চলেছে, যেন বইয়ের শেষ পাতায় সেই কথাই রবীন্দ্রনাথ নতুনভাবে মনে করিয়ে দিলেন।

'সে'তে খুঁটিনাটি আরো কিছু গল্পের ধরণ পাই। স্মৃতিরত্নের মনুমেণ্ট চাটার উৎকল্পনা আছে, মাস্টার মশাইয়ের আখ্যান রয়েছে, তাসমানিয়ার উৎকট ভোজের বিকট বিবরণ আছে। কিন্তু তাদের পরিচয় দেবার আর প্রয়োজন নেই। 'সে' খেয়ালী মনের আনন্দ, গল্প তৈয়ারী খেলা, বড়োদের মন দিয়ে ছোটদের মনের রহস্য বোঝবার চেষ্টা, বিদ্যুৎ-ঝলকিত উইট-এপিগ্রামের উৎসব, আর সব মিলে এক নতুন স্বাদের সাহিত্য। এ-রকম বই একমাত্র তিনিই লিখতে পারেন—যিনি বিশ্বস্রষ্টার মতো শক্তিমান, কাদার তাল থেকে তরল লোহার পিণ্ড—সব কিছুকে যিনি পলকে পলকে ইচ্ছেমতো রূপান্তরিত করতে পারেন।

চকিতে চকিতে রূপ-বদলানো বর্ষণহীন মেঘ আকাশে ছিল; তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দেখা দিল রবীন্দ্রনাথের 'সে'।

॥ চার ॥

যে কথা বলেছি, এই বইটি গল্প গড়বার খেলা। এই খেলার আনন্দ এক একটি গল্পে চমৎকার জমে উঠেছে, অপূর্ব পরিবেশ ফুটে উঠেছে কোথাও, কখনো কখনো শিশু চিত্তের অকৃত্রিম আনন্দ উচ্ছলিত হয়ে পড়েছে। ভালো গল্পের উদাহরণ ৭ নম্বর—পুকুরে চান করতে গিয়ে "সে"র গা-হারানোর কাহিনী—তারপর পাতু খুড়োর শরীরে তার অনধিকার-প্রবেশ। শিশু-মনস্তত্ত্বের মনোরম প্রকাশ আছে বাঘের গল্পে, খরগোষের পুপে-হরণ কাহিনীতে। দ্বিতীয় গল্পটিতে দাদু-নাত্‌নীর সংলাপ এই রকম ঃ

"আচ্ছা বলো দেখি, খরগোষ কী ক'রে আমাকে পিঠে ক'রে নিলে।

নিশ্চয় তখন তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে।

ঘুমুলে কি মানুষ হাল্‌কা হয়ে যায় ?

হয় বই কি। তুমি ঘুমিয়ে কখনো ওড়োনি ?

হাঁ উড়েছি তো।

তবে আর শক্তটা কী। খরগোষ তো সহজ, ইচ্ছে করলে কোলাব্যাঙের পিঠে চড়িয়ে তোমাকে মাঠময় ব্যাং-দৌড় করিয়ে বেড়াতে পারত।

ব্যাং! ছী ছি ছি। শুনলেও গা কেমন করে।

না, ভয় নেই—ব্যাঙের উৎপাত নেই চাঁদের দেশে। একটা কথা জিগেস করি, পথে ব্যাঙ্গমা দাদার সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি কি ?

হাঁ, হয়েছিল বই কি।

কী রকম!

ঝাউ গাছের উপর থেকে নিচে এসে খাড়া হয়ে দাঁড়াল।

বললে, পুপে দিদিকে কে চুরি করে নিয়ে যায়। শুনে খরগোষ এমন দৌড় মারল যে ব্যাঙ্গমা দাদা পারল না তাকে ধরতে।”

পরিবেশ সৃষ্টিতে খেয়ালী নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যাবে ৪ নম্বরে :

“গাড়িতে চড়ে বসলুম।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলেছি, ঘোর অন্ধকার। পুকুরধারে আসসেওড়ার ঝোপ। হঠাৎ তার ভিতর থেকে খেঁকশেয়ালী উঠল ডেকে। তখন রাত সাড়ে তিনটে হবে। যেমনি ডাক, পুত্তুলাল চমকে উঠে গাড়িশুদ্ধ গিয়ে পড়ল এক গলা জলের মধ্যে। এদিকে তার পিঠের কাপড়ের ভিতরে একটা ব্যাঙ ঢুকে লাফালাফি করছে। আর পুত্তুলালের সে কী চেঁচানি! আমি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, পুত্তুলাল, তোর পিঠে বাত আছে, ব্যাঙটাকে খুব কষে লাফাতে দে, বিনি পয়সায় অমন ভালো মালিষ আর পাবিনে।······এদিকে পাঁকের জলে আমার চুলগুলো গেছে ভিজে। না আঁচড়ে নিয়ে ওর বৌদিদির ওখানে যাই কী ক'রে। গোলমাল শুনে পুকুরপাড়ে হাঁসগুলো প্যাঁক প্যাঁক ক'রে ডেকে উঠেছে। এক লাফ দিয়ে পড়লুম তাদের মধ্যে ; একটাকে চেপে ধরে তার ডানা দিয়ে ঘষে ঘষে চুলটা এক রকম ঠিক ক'রে নিলুম। পুত্তুলাল বললে, ঠিক বলেছ দাদাবাবু। ব্যাঙের লাফে বড়ো আরাম বোধ হচ্চে। ঘুম পাচ্চে।”

কিন্তু সম্পূর্ণ গল্প তৈরী করা তো নয়, নানা ধরণের উপকরণ মিশিয়ে ছোটদের মনের উপযোগী গল্প তৈরী করার খেলাটাই লক্ষ্য। এই খেলায় লেখকের সঙ্গী দুজন—'সে' আর পুপে দিদি। 'সে'কে নিয়ে লেখক অদ্ভুত ধরণের গল্প বানিয়েছেন বটে, কিন্তু তার সঙ্গে সরস তত্ত্ব আলোচনাটাই তাঁর উদ্দেশ্য ; আর পুপে দিদি সহায়তা করেছে অন্যভাবে, গল্পকে সে সাজাবার কাজে সাহায্য করেছে, তার পরিণতিকেও নিয়ন্ত্রণ করেছে কখনো কখনো।

শিশু-মনস্তাত্ত্বিক মাত্রেই জানেন, ছোটদের অপরিণত মনেও একটা যুক্তি-শৃঙ্খলা কাজ করে, তারও একটা নিজস্ব নীতিবোধ আছে, বাসনালোক আছে। তার জন্যে রচিত সাহিত্যে এগুলোকেই সে একান্তভাবে প্রত্যাশা করে, না পেলে ক্ষুণ্ণ হয়, লেখাটা তার ভালো লাগে না। অতএব শিশুর নৈতিক এবং অভীপ্সাগত সমর্থনই তাদের উপযোগী রচনার সত্যিকারের মেরুদণ্ড।

ফরাসী রূপকথার বিখ্যাত সংকলক শার্ল পেরো (Perrault)-ও এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তাঁর শ্রুত এবং সংকলিত গল্পগুলো তিনি তাঁর শিশু-শ্রোতাদের দিয়ে আগে অনুমোদন করিয়ে নিয়েছেন, তারপর তাদের সম্পূর্ণতা দিয়েছেন। যেমন সেই বীভৎস পত্নীহন্তা 'নীল দাড়ি'র ব্যাখ্যানটিই ধরা যাক :

"Quand fut terminé le conte de "Barbe-Bleue", l'un des enfants qu'avait surtout intéressée l'arrivée des deux frères de la pauvre princesse qu' allait tuer Barbe-Bleue, voulut absolument savoir a quelle arme appartenaient ces deux courageux soldats.

'C'était des dragons, affirma une petite voix.

—C'était des mousquetairs ! s'écrièrent d'autres voix."

'নীল দাড়ি'র গল্প শেষ করলেন পেরো। পাষণ্ড নীল দাড়ি নিহত হল। একটি অতি কৌতূহলী শিশু জানতে চাইল, ওই দুজন সৈনিকের হাতে কী অস্ত্র ছিল। একটি শিশু বলে উঠল : 'ওরা তো ড্রাগন।' আর একদল চেঁচিয়ে উঠল : 'না—না, ওরা তো মাস্কেটিয়ার।' পেরো দুদলের কথাই রাখলেন—দুই সৈনিকের একজন হল ড্রাগন আর একজন হল মাস্কেটিয়ার :

"Et Charles Perrault mit tout le monde d'accord en écrivant dans son recit que l'un des deux frères de la princesse était mousquetaire, et l'autre, dragon."

'সে'-তেও রবীন্দ্রনাথ এই রীতি আশ্রয় করেছেন। পুপের চিন্তা আর প্রত্যাশার সঙ্গে মিলিয়ে গল্প শেষ করতে হয়েছে তাঁকে :

'এই পর্যন্ত শুনে পুপে দিদি হতাশভাবে বললে, ও কী কথা দাদামশায়, তুমি যে বলেছিলে, তুমি নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলে, তারপরে তোমার ঘরে এসেছিল পাল্লারাম।

সামলে নিলুম। আর একটু থেমেই বুদ্ধিমানের মতো বলতে যাচ্ছিলুম, আগাগোড়া স্বপ্ন। সব মাটি হোত। এখন থেকে পাল্লারামকে নিয়ে উঠে পড়ে লাগতে হবে যেমন করে পারি। স্বপ্ন যখন বিধাতা ভাঙেন নালিশ খাটে না। আমরা ভাঙলে বড়ো নিষ্ঠুর হয়।

পুপুদিদি বললে, দাদামশায়, ওদের দুজনের বিয়ে হোলো কিনা বললে না তো কিছু।

বুঝলুম বিয়ে হওয়াটা জরুর দরকার। বললুম, বিয়ে না হয়ে কি রক্ষা আছে।

তারপর তোমার সঙ্গে ওদের দেখা হয়েছে কি ?

হয়েছে বই কি। তখন ভোর সাড়ে চারটে, রাস্তার গ্যাস নেবেনি। দেখলুম, নতুন বৌ তার বরকে ধরে নিয়ে চলেছে।

কোথায় ?

নতুন বাজারে মানকচু কিনতে।'

বাঘের গল্পের সবটাই প্রায় দাদু-নাৎনীর সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে। শুরুটাও পুপুরই কীর্তি। যেমন :

"সার্কাস দেখে আসার পর থেকে পুপুদিদির মনটা যেন বাঘের বাসা হয়ে উঠল। বাঘের সঙ্গে, বাঘের মাসির সঙ্গে সর্বদা তার আলাপ চলছে। আমরা যখন কেউ থাকিনে তখনি ওদের মজলিস জমে। আমার কাছে নাপিতের খবর নিচ্ছিল—আমি বললুম, নাপিতের কী দরকার? পুপু জানালে, বাঘ ওকে অত্যন্ত ধরে পড়েছে; খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠেছে ওর গোঁফ, ও কামাতে চায়।"

এত গল্প তৈরী করেও শেষ পর্যন্ত "সে" গল্পের বই হয়ে উঠল না। এল সুকুমার—এল জীবন। শুরুর সঙ্গে সারার ছন্দ পুরোপুরি মিলল না। কিংবা জীবনের গল্পই এই রকম। আনন্দ, কৌতুক, আর খেলা দিয়ে তার শৈশব উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তারপর বয়স বাড়লে, দিনের প্রথম আলো রোদ হয়ে উঠলে, ফুল ঝরতে থাকে, প্রজাপতির পাখায় ক্লান্তি নামে, ধুলো আসে, বেদনা আসে। তারও পর সন্ধ্যার ছায়া নামলে আকাশে সেই চিরন্তনের সংবাদ—সেই দূর-দূরান্তের তারাদের ভিড়; রূপকথার রাজকুমার সুকুমার—যে শালগাছ হয়ে পৃথিবীর আলো-বাতাসে মর্মর তুলতে চেয়েছিল, সে নক্ষত্রলোকের নীরবতায় হারিয়ে যায়। তার পরে তো আর গল্প নেই।

॥ পাঁচ ॥

'সে' গল্পের বই নয়, অথচ গল্পের বই ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ এক কথায় 'অভিনব'। একই সঙ্গে সে খেলা এবং খেলা ভাঙার খেলা। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মহাদেশে যেন একটি বিচ্ছিন্ন ভূমিখণ্ড, সেখানে লেখক দায়িত্বহীনতার আনন্দে একটি নতুন দেশ গড়তে চেয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলেন স্বতন্ত্র করে রাখলেও আলাদা মাটির খণ্ডে পুরোনো-পরিচিত মাটির ধর্মই বিকশিত হয়ে ওঠে। তারও ফুল ঝরে, তারও আকাশে দিনান্তের তারা ওঠে।

তাই আলাদা হয়েও 'সে' আলাদা নয়। রবীন্দ্রনাথের মনোজগতের সঙ্গে অপরিহার্যতায় সম্বদ্ধ।

আলাপে, গল্পে, রসিকতায় 'সে' বড়োদের বই। রূপকের ফাঁকে ফাঁকে, গল্পের ছলনায় কবির নানা বক্তব্য, নানা রসিকতা।

পরিণত বয়সে আধুনিক সাহিত্য এবং সমকালীন মানবের 'আসুরিক প্রচণ্ডতা' রবীন্দ্রনাথকে পীড়া দিয়েছিল, প্রবন্ধে, কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে বহুভাবে রবীন্দ্রনাথ এই সব বস্তুকে কটাক্ষ করেছেন। প্রসঙ্গত 'প্রহাসিনী'র মাল্যতত্ত্ব মনে পড়ল :

"মালাটাই যে ঘোর সেকেলে, ওটা কি আর চলে
সরস্বতীর গলে ?
রিয়্যালিস্‌টিক প্রসাধন যা নব্য শাস্ত্রে পড়ি
সেটা গলায় দড়ি।"

অন্যত্র একটি হাল্‌কা ছড়ায় লিখেছেন :

"জাপানীরা আসে যদি
চিঁড়ে নিক, দই নিক,
আধুনিক কবিদের
যত খুশি বই নিক।"

'সে' তে এই আক্রমণ আরো প্রচণ্ডভাবে এসেছে। ১২ নম্বরে লেখক অসুর যুগ এবং বেসুর সাহিত্যের অতি উপাদেয় ব্যাখ্যা রচনা করেছেন :

"ঐ যে তুন্দিলতনু গজানন সর্বাগ্রে পেয়ে থাকেন পুজো, এটাই তো চোখ-ভোলানো দুর্বল ললিত-কলার বিরুদ্ধে সূক্ষ্মতম প্রোটেস্‌ট্‌। বর্তমান যুগে ঐ গণেশের শুঁড়ই তো চিম্‌নি মূর্তি ধরে পাশ্চাত্য পণ্য-যজ্ঞশালায় বৃংহিত ধ্বনি করছে।" অতএব নানাভাবে পরীক্ষাপর্ব চালাবার পরে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে আধুনিক কবিতার যে স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে, সেটি একেবারে চরম :

"হৈ রে হৈ মারহাট্টা
গালপাট্টা
আঁটসাট্টা।

হাড়কাট্টা ক্যাঁ কোঁ কাঁচ্
গড়গড় গড়গড়
হুড়ুদ্দুম হুদ্দাড়
ডাণ্ডা
ধপাৎ
ঠাণ্ডা
কম্পাউণ্ড ফ্র্যাক্চার—”

কবিতার এই 'কম্পাউণ্ড ফ্রাকচারের' পর একটিমাত্র কাব্যই লেখা যেতে পারে বলে রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই কাব্যের নাম “বেসুর হিড়িম্বের দিগ্বিজয়।” আধুনিক কাল এবং কাব্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মানসিক বিরূপতার এমন বিস্তৃত আর সরস পরিচয় অন্যত্র তুর্লভ।

এ ছাড়াও দেশ-কাল-সমাজ সম্পর্কে নানা প্রাসঙ্গিক মন্তব্য, লোক-চরিত্রের ওপর থেকে থেকে অপূর্ব আলোক-সম্পাত, আর বুদ্ধিঝলকিত রসোক্তি 'সে'র অসাধারণ সম্পদ। তু একটি নিদর্শন স্মরণ করা যাক :

“মাছের আঁশের হ : গেঁথে ওর গলায় পরিয়েছে, বলেছে যশঃ সৌরভ তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে।”

“দাদামশায়, গা নিয়ে এত হাঙ্গাম আমি কখনও ভাবিনি।

ঐ হাঙ্গামগুলো জোড়া দিয়েই তো যত গল্প। গায়ের ওপর সওয়ার হয়ে গল্প ছুটছে চারদিকে। কোনো গা গল্পের গাধা, কোনো গা গল্পের রাজহস্তী।”

“পুপুদিদিকে ভাবিয়ে দিলে। খানিকক্ষণ বাদে ভুরু কুঁচকিয়ে বললে, ইংরেজের ভূত তা হোলে খেতে পায় কী ক'রে?

তারা বেঁচে থেকে যা খেয়েছে তাতেই তাদের সাতজন্ম অমনি চ'লে যায়। আমরা যা খাই তাতে বৈতরণী পার হবার অনেক আগেই পেট চোঁ চোঁ করতে থাকে।”

"কাঁকড়ার ঝোল তো খেয়েছি অনেকবার। সম্পূর্ণ মন দিইনি। এবার যখন দেখলুম কানাইয়ের জিভে জল এসেছে তখন তার সিক্ত রসনার নির্দেশে খাবার সময় মনটা ঝুঁকে পড়বে কাঁকড়ার দিকে, রসটা পাব বেশি করে। কাঁকড়ার ঝোলটাকে ও যেন লাল পেনসিলে আণ্ডার লাইন্ করে দিলে, ওটাকে ভালো ক'রে মুখস্থ করবার পক্ষে সুবিধে হোলো আমার।"

কিন্তু এ ভাবে আর উদ্ধৃতি আহরণ করে লাভ নেই, তা হলে পাতার পর পাতা সংগ্রহ করে যেতে হয়। আসল কথা, সহজাত ছুখানি বই—'সে' আর 'খাপছাড়া' একই মানসসূত্রে গাঁথা, এরা ছোটদের উপলক্ষ করে বড়োদের বই। এদের রস ছোটদের জন্যে চার আনা, বড়োদের জন্যে বারো আনা। পরিণত বার্ধক্যের লঘু কল্পনার আনন্দ এদের ওপর সাতরঙের তুলি বুলিয়েছে— সেই বর্ণালীটুকুই আমাদের বাড়তি লাভ।

আর 'সে' তে ছোটদের গল্প সম্পর্কে একটি 'মর‍্যাল'ও আছে। শিশু-সাহিত্যিকদের সেটি সর্বদা স্মরণীয়:

"বিশ্বাস করবার অতীত যা তাকেও বিশ্বাস করাবার যোগ্য করতে পারো যদি তা হোলেই অদ্ভুত রসের গল্প জমে। নেহাৎ বাজার-চল্‌তি ছেলে ভোলাবার শস্তা অত্যুক্তি যদি তুমি বানাতে থাকো তা হলে তোমার অপযশ হবে এই আমি বলে রাখলুম।"

এই অপযশের আশঙ্কা নেই বলেই বাংলা দেশের শিশু-সাহিত্যে আজ নির্দ্বিধায় পরিপূর্ণ নৈরাজ্য চলেছে।

গল্পসল্প

কথা-সাহিত্যে 'গল্পসল্প' রবীন্দ্রনাথের শেষ সঞ্চয়। কবিতা আর গদ্য দিয়ে সাজানো। এরও শ্রোত্রী একজন নাত্‌নী—কুসমি তার নাম।

তখন অস্ত সূর্য একেবারে পশ্চিমের দিগন্তে। অসুস্থ শরীর, ক্লান্ত মন। মুখে মুখে কাহিনীগুলো বলে গেছেন, অনুলেখন করেছেন অধ্যাপক ক্ষিতীশ রায়। টুকরো টুকরো ছোট রচনাগুলো সব ক্ষেত্রেই একটা নির্দিষ্ট রূপ নিতে পারেনি ; তারা কখনো স্মৃতিচর্চা, কখনো লোক-চরিত্র, কখনো স্বপ্ন, কখনো বা গল্পের রেখা। সাহিত্য-হিসেবে বইটির স্বাতন্ত্র্য হয়তো বেশি নেই, কিন্তু নিঃসন্দেহে স্বাদ আছে। ভাষায় সেই পরিণত বয়েসের বুদ্ধিদীপ্ত স্বচ্ছতা, অল্প কথায় এক একটি ছবি ফুটিয়ে তোলার সেই ইন্দ্রজাল; মন্তব্যে সেই শাণিত ইঙ্গিত। জীবনের শেষ সীমান্তে দাঁড়িয়েও অদ্বিতীয় সেই রবীন্দ্রনাথ। আর শিশু সাহিত্য রচনায় তাঁর সেই অনন্য বৈশিষ্ট্য—সব বক্তব্য, সব ইঙ্গিতই ছোটদের জন্যে নয়, এই বইতে তিনি বয়স্কদের জন্যেও উপচার সাজিয়েছেন।

'গল্পসল্প' পড়তে গিয়ে 'সে'-র কথা মনে পড়বে, 'জীবন-স্মৃতি' 'ছেলেবেলা'র কিছু কিছু অংশ আরো সরস—আরো সহজ হয়ে ফিরে আসবে। কবি নিজেও সে-সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। মুখবন্ধের কবিতাটিতে তিনি বলেছেন :

'আমাদের কাল থেকে, ভাই
এ কালটা আছে বহু দূরে,
মোটা মোটা কথাগুলো তাই
ব'লে থাকি খুব মোটা সুরে।

* * *

যদি বল, পুরাতন এই কথাগুলো—
আমিও যে পুরাতন সেটা নাহি ভুলো।'

সন্দেহ নেই—'রাজার বাড়ী' (ইরাবতীর গল্প), 'মুন্‌শী' (জীবন স্মৃতির সেই মুন্‌শীজি) 'ম্যাজিসিয়ান' এবং 'মুক্তকুন্তলা' (দুটিই সেই বিখ্যাত হরিশচন্দ্র হালদারকে নিয়ে) পুরোনো গল্পই বটে। তবু বলবার ভঙ্গিতে এদের মধ্যেও কিছু কিছু নতুনত্ব এসেছে। যেমন হ. চ. হ একবার :

"বলেছিলেন, ফলের আঁটি মাটিতে পুঁতে এক ঘণ্টার মধ্যেই গাছও পাওয়া যাবে, ফলও পাওয়া যাবে।

আমরা বললুম, আশ্চর্য।

হ. চ. হ বললেন, কিছু আশ্চর্য নয়, দ্রব্যগুণ। ঐ আঁটিতে মনসাসিজের আঠা একুশবার লাগিয়ে একুশবার শুকোতে হবে। তারপর পোঁতো মাটিতে আর দেখো কী হয়।

উঠে প'ড়ে জোগাড় করতে লাগলুম। মাস দুয়েক লাগল আঠা মাখাতে আর শুকোতে। কী আশ্চর্য। গাছও হল, ফলও ধরল, কিন্তু সাত বছরে। এখন বুঝেছি কাকে বলে দ্রব্যগুণ। হ. চ. হ বললেন, ঠিক আঠা লাগানো হয়নি।

বুঝলেম, ঐ ঠিক আঠাটা দুনিয়ার কোথাও পাওয়া যায় না। বুঝতে সময় লেগেছে।"

লোক-চরিত্রের নিদর্শন বইয়ের কয়েকটি রচনাতেই আছে। আপন ভোলা পণ্ডিত কিংবা বৈজ্ঞানিক মানুষ—ব্যবহারগত জীবনে যারা সম্পূর্ণ অদ্ভুত এবং অকেজো—তাদের সম্পর্কে একটি সশ্রদ্ধ মমতা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে। এই চরিত্রের উজ্জ্বলতম বাস্তব রূপ রবীন্দ্রনাথ নিজের পারিবারিক জীবনেই দেখেছিলেন। স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তো ছিলেনই, খুব সম্ভব জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভেতরেও এই বিশিষ্ট চরিত্র-সত্তার কিছু প্রকাশ ঘটেছিল। তাই 'চন্দ্রবাবু' কিংবা 'বৈকুণ্ঠের' পরেও আমরা 'সে'র মাস্টার মশাইকে দেখতে পাই—যাঁকে "গল্‌দা চিংড়ির লোভ কাঁকড়ার লাইনে শাণ্ট্‌" করে দিতে হয়। গল্পসল্পেও তিনি আছেন

নীলমণিবাবু রূপে। বৈচিত্র্য হয়তো বেশি নেই, কিন্তু একদিকে কলম-নোট বই-ভাড়াটে বাড়ীর ঠিকানা হারানোর ছেলেমানুষি, অন্যদিকে তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা—"জগতে গ্রহতারা কোনো জিনিসই ঘুরছে না, তারা কেবলই লাফাচ্ছে," যেন "এ জগতে কোটি কোটি উচ্চিংড়ে ছাড়া পেয়েছে—" বৈজ্ঞানিক নীলমণিকে শুধু তাঁর স্ত্রী এবং লেখকের কাছেই প্রিয় করে তোলেনি—এই চরিত্র পাঠকের মনেও একটি স্নিগ্ধ মমতা উদ্রিক্ত করে।

মানুষ সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতার কিছু কিছু নমুনাও আছে—যেমন "চণ্ডী", যেমন 'ভালোমানুষে'র পাঁচকড়ি। প্রথম রচনাটিতে বিশ্বনিন্দুক চণ্ডীবাবুর একটি সকৌতুক চিত্র আছে, "আলো যার মিট্‌মিটে, স্বভাবটা খিট্‌খিটে" ইত্যাদি একটি ছড়া লিখে—"তারে নাম দিব খ্যাঁক্‌শেয়ালি" বলে কবি যেন একটু প্রতিশোধও নিয়েছেন বলে মনে হয়। রচনাটির শেষাংশে চণ্ডীবাবুর দরজায় পুলিশের পদক্ষেপ ঘটাতে একটুখানি ছোট গল্পের আমেজ এসেছে, এতক্ষণ ধরে চণ্ডীবাবু গলা খুলে যে গান্ধীজীর নিন্দে করছিলেন—দায়ে পড়ে অবশেষে তাঁরই শরণ নেওয়ায় মৃদু চমক-জাগানো একটি গল্পসুলভ সমাপ্তিও দেখা দিয়েছে। লেখাটিতে ছোটরা কিছু রস পেতেও পারে, কিন্তু বড়োরাই সার্থকভাবে এর স্বাদ গ্রহণ করবেন।

পাঁচকড়ির চরিত্র রচনাতে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ নির্মম—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কিছু কটুতাই এখানে পরিবেষিত হয়েছে বলে মনে হয়। 'কালো কুত্তা' নামকরণ, সোনা-বাঁধানো ফাউন্টেন পেন হরণের কাহিনী, সিল্কের ছাতাটি আত্মসাৎ করে কালোকুত্তার চির-প্রস্থান এবং পরিশিষ্টরূপে আর একজন সাহিত্যিক বন্ধুর হাতে ব্রাউনিঙের দুর্বিপাক—সংসারে ভালোমানুষ হয়ে থাকার দুর্ভাগ্যকে নিষ্ঠুরভাবে ফুটিয়েছে। ভদ্র, মার্জিত, মুখচোরা রবীন্দ্রনাথকে জীবনে বহুবার বহুভাবেই ভালোমানুষির

দাম দিতে হয়েছে—এই লেখাটিতে তারই সন্ধান মেলে। 'পান্নালাল'-ও লোক চরিত্রের কিছু নমুনা—একজন 'তিনক্রোশ পথ বেঁকে' বাড়ী গিয়ে মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে চায়, আর একজনের ভিটে "রেগে মাসির বাড়ীতে" দৌড় মারে—তারপর সাতহাত মাটির নীচে গিয়ে মুখ লুকোয়—তখন তাকে উদ্ধার করবার জন্য মধুসূদন জ্যোতিষী এবং নগদ টাকার দরকার পড়ে।

চরিত্র-রচনার সেরা দৃষ্টান্ত বাচস্পতি। আর কোনো কারণে নয়, তাঁর ভাষা সৃষ্টির মৌলিকতার গৌরবে। তাঁর সেই নায়িকা যখন "নায়ককে বলেছিল হাত নেড়ে 'দিনরাত তোমার ওই হিদ্ হিদ্ হিদিক্কারে আমার পাঁজঞ্জুরিতে তিড়িতঙ্ক লাগে';" কিংবা বাচস্পতি যখন 'ভুণ্ডুম্মানিত' ভাষায় ভারতবর্ষের ইতিহাস বর্ণনা করেন "সম্মম্রাট সমুদ্রগুপ্তের ক্রেঙ্কটাকৃষ্ট ত্বরিৎ ত্রম্যস্ত পর্য্যুগাসন উথ্রুংসিত"; অথবা তাঁর ইংরেজি "দি হাব্বারফ্লুয়াস ইন্‌ফ্যাচুয়েশন অব আকবর ডর্বেণ্ডিক্যালি ল্যাসেরটাইজ্‌ড্" যখন উচ্ছুসিত হয়ে ওঠে, তখন আমাদের "আন্‌তারা ফাঁচ্‌কলিয়ে" যায়, ছোটলাট "টরে টম" বনে যান এবং স্বাভাবিক ভাবেই "হেড্ পেডেঙোর টিকির চারধারে ভেরেণ্ডম্" লেগে যায় আর "সেক্রেটারি চৌকি থেকে তড়তং করে উৎখিয়ে" ওঠেন।

এই 'বুগবুলবুলি' ভাষার মধ্যে উদ্ভট রসের কৌতুক যা-ই থাক, এর মধ্যে একটি সত্যকে বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ গভীর ভাবেই বলতে চেয়েছেন। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, আপাতদৃষ্টিতে বাচস্পতির ভাষা-ভাণ্ডার যতই অর্থহীন হোক, তারা প্রলাপ নয়—নিঃসন্দেহেই একটি বিশিষ্ট ভাবব্যঞ্জনা বহন করে। কোনো বিগলিত নায়কের প্রেমের মিন্‌মিনে আলাপকে যদি "হিদ্-হিদ-হিদিক্কার' বলা যায় এবং তাতে যদি নায়িকার "পাঁজঞ্জুরিতে তিড়িতঙ্ক" লাগেই—তা হলে আমাদের কাছে তার চাইতে স্বাভাবিক আর কিছুই নেই। সেক্রেটারির চৌকি ছেড়ে "তড়তং করে উৎখিয়ে ওঠা"—চলতি

বাংলার যে-কোনো অভিধানসিদ্ধ প্রকাশভঙ্গির চেয়ে অনেক বেশি জোরালো বলে কানে ঠেকছে।

"শব্দের কাজই হচ্ছে বোঝানো, তাকে আবার বোঝাবে কে"—বাচস্পতির এই সিদ্ধান্তের মধ্যে আধুনিক শিল্প-জিজ্ঞাসার একটি প্রধান তত্ত্ব কাজ করছে। 'গল্পসল্পে' যা নিতান্তই কৌতুক—ত্রিশ বছর আগে হলে হয়তো রবীন্দ্রনাথ তাকে একটি বৈপ্লবিক আন্দোলনে রূপায়িত করতেন। ভাষা যখন বহু-ব্যবহৃত হতে হতে তার ধার এবং ব্যঞ্জনা-শক্তি হারিয়ে ফেলে—তখন স্বভাবতই শিল্পীকে নতুন ভাষা আবিষ্কার করতে হয়, নতুন শব্দকে উত্তোলিত করতে হয়। এই ভাবেই ভাষা বিস্তৃত হয়, তার নবায়ন ঘটে। কোনো কোনো স্বতন্ত্র বক্তব্যের জন্যে সম্পূর্ণ নতুন প্রকাশের প্রয়োজন পড়ে—সে কথা স্মরণে রেখেই জেম্‌স্ জয়েস তাঁর ভাষা ও ভাষ্যের সমন্বীতি সাধন করেছিলেন—তাঁকে কেউ বাচস্পতির মতো পাগল বলার স্পর্ধা রাখে না।

কিন্তু অস্ত-সমুদ্রের উপকূলচারী রবীন্দ্রনাথ তখন আর বিপ্লবের মশাল জ্বেলে ধরতে পারেন না। তখন আর 'রভসে' ব্যবহার করতে পারেন না নতুন অর্থে, সৃষ্টি করতে পারেন না 'উর্বশী'র 'ক্রন্দসী'-কে। তাই বাচস্পতির গল্পে তাঁর শেষ বেলা কেটে গেল ঠাট্টায় ঠাট্টায়।"

একটি মারাত্মক রূপক কাহিনী নিহিত রয়েছে 'বড়ো খবর'-এর ভেতর। "দাঁড়" এবং "পালে"র গল্পে এ-কালের কা'দের কথা বলা হয়েছে, তা কুসমি যদি না-ও বোঝে, বয়স্ক পাঠকের কাছে তার রহস্য গোপন থাকবে না। আর 'কালের যাত্রা'য় কবির কণ্ঠে গভীর সুরে যা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, এখানে তাকেই খুব সংক্ষেপে আভাসিত করেছেন :

"দাদামশায় বললে, ঠাট্টার মতন এখন শোনাচ্ছে। দেখতে দেখতে একদিন বড়ো খবর.বড়ো হয়েই উঠবে।

তখন ?

তখন তোমার দাদামশায় ওই দাঁড়গুলোর সঙ্গে তাল মেলানো অভ্যাস করতে বসবে।

আর, আমি ?

যেখানে দাঁড় বড়ো বেশি কচ্‌কচ্‌ করে সেখানে দেবে একটু তেল।”

জন-জীবনের সঙ্গে জীবনের ছন্দ মেলানোর আনন্দ ‘ওই দাঁড়ের সঙ্গে তাল-মেলানো’-র মধ্যেই নিহিত; মানুষের রুক্ষ কর্কশ বাস্তবতায় নারী যে সৌন্দর্যের স্নিগ্ধতা এনে তাকে কোমল মধুর করে তোলে—“দাঁড়ে তেল দেওয়ার” মধ্যে তারই ইঙ্গিত।

‘পরী’, ‘আরো-সত্য’—এরা রবীন্দ্রনাথের “বস্তু থেকে সত্যতর মায়া”র শিল্প-চিন্তা। প্রথম লেখাটিতে ‘সে’র পুপে দিদির একটি কাহিনী মনে আসে, যেখানে চাঁদের খরগোস এসে তাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। “ঘটে যা, তা সব সত্য নহে”, কবিই জীবনের খণ্ডিত সত্য, ভাঙা স্বপ্ন, বিকৃত আদর্শ আর অপমানিত প্রেমকে পুনর্যোজিত, পুনর্বোধিত, পুনর্গৌরবিত করে তুলতে পারেন; বস্তুক্ষেত্রে যদি তা দুঃসাধ্যও হয়, শিল্পলোকের বিধাতা সৃষ্টির মধ্যে তা সম্ভব করতে পারেন। এই গূঢ় বক্তব্যই এই দুটি রচনার নেপথ্য-নিহিত। সেই সত্যতর সৌন্দর্যের জগৎ দ্বিতীয় গল্পটিতে এই ভাবে ফুটে উঠেছে:

“সেটা ঘটেছিল ফুচাও নদীর ঘাটে। সাদা পাথর দিয়ে বাঁধানো ঘাট, উপরে নীল পাথরের মণ্ডপ। দুই ধারে দুই চাঁপা গাছ, তার তলায় দুই পাথরের সিংহের মূর্তি। পাশে সোনার ধুনুচি থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়া। একজন দাসী পাখা করছিল; একজন চামর দোলাচ্ছিল, একজন দিচ্ছিল চুল বেঁধে। আমি কেমন করে পড়ে গেলুম তাঁর সামনে। রাজকন্যা তখন

তাঁর দুধের মতো সাদা ময়ূরকে দাড়িমের দানা খাওয়াচ্ছিলেন, চম্‌কে উঠে বললেন, কে তুমি ?"

এ যেন অতীত বেবিলন কিংবা বলীদ্বীপের বিস্মৃত ইতিহাস থেকে আহৃত এক চিত্রল কল্পনা ; কবির তরুণ যৌবনে এই কল্পনাই "স্বপ্ন" জাতীয় কবিতায় রূপ পেতে পারত।

গল্পহিসেবে এই বইতে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন আছে তিনটি : 'রাজরাণী', 'ম্যানেজারবাবু' এবং 'চন্দনী'।

এদের মধ্যে দ্বিতীয়টি খুব সিরিয়াস ভালো গল্প হয়ে উঠতে পারত—যদি আর একটু বিস্তৃতি ঘটত, যদি এর রেখাধর্মী চরিত্রটিকে আরো কিছু ভরাট এবং গভীর করে তোলা যেত।

জমিদার কাছারীর ম্যানেজার দুধে স্নান করে গর্বে ফুলে উঠলেন এবং তাঁর ব্রাহ্মণ পাইক মিশিরজী মনিবের নিমকের মান রাখবার জন্যে একা লড়ে প্রাণ দিলে—সংবাদ হিসেবে এর মধ্যে কোনটা বেশি সত্য ? গল্পের আড়ালে রবীন্দ্রনাথ লোকবিধির একটি চিরকালীন প্রশ্নকে তুলে ধরেছেন এবং সর্বশেষে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গে মন্তব্য করেছেন "তাঁর দুধের স্নানের খ্যাতি—এতো যে সে লোকের কর্ম নয়। কিন্তু নিমক খেয়েছে যখন, তখন প্রাণ দেওয়া—এটা এতই কী আশ্চর্য। এমন তো কতই ঘটে থাকে। কিন্তু, দুধে স্নান!"

গল্পের বক্তব্য তীক্ষ্ণ, গতি দীপ্তিময়। কিন্তু আর একটু বিস্তৃতির অবকাশ ছিল, তা হলেই এটি পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠত। 'চন্দনী' গল্পটি ছোট একটি রোমান্স। রাজপুত যোদ্ধা অরিজিৎ করঞ্জরের রাজকন্যা নির্মলকুমারীকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে কিভাবে দস্যু-সর্দার পরাক্রম সিং-এর পাল্লায় পড়লেন, কেমন করে রঞ্জনকুমারী —অর্থাৎ চন্দনী তাঁকে গভীর অরণ্য থেকে মুক্তি দিলে এবং শেষে কেন অরিজিৎ এলেন একদা উপেক্ষিত চন্দনীকেই বধূবরণ করতে —এ সব যেন একটি বড়ো উপন্যাসের উপকরণ। যেন গল্পের মধ্যে সেই উপন্যাসের খসড়াটুকু করেই ছেড়ে দিয়েছেন লেখক।

কিন্তু "রাজরানী" সত্যিকারের গল্প—যেমন স্নিগ্ধ রচনা, তেমনি এর চিত্রময় সৌন্দর্য। বস্তুতঃ এই গল্পটি যেন 'লিপিকা'র পাতা থেকে আকস্মিকভাবে গল্পসল্পে এসে জুড়ে বসেছে। বিষয়বস্তুটি রূপকথার—রাজা দিগ্‌দেশভ্রমণে চলেছেন রাজমহিষীর সন্ধানে। ফৌজ নয়, সঙ্গে পাত্রমিত্র নয়, রাজহস্তী, রাজবেশ কিছুই নয়—সন্ন্যাসীর ছদ্মসাজেই রাজা বেরিয়ে পড়েছেন।

ঘুরলেন অঙ্গ বঙ্গ-কলিঙ্গ—কিন্তু কোনো একটি রাজকন্যাকে তাঁর পছন্দ হল না। কেউ বিলাসিনী, শুধু রূপচর্চ্চাতেই তন্ময়; কেউ শুধু সুধাকণ্ঠের সাধনাতেই তদ্‌গতা; কেউ বা সাম্রাজ্য লাভের অভিলাষিণী—পৃথিবীর সব রাজমুকুট এসে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ুক, এই তার একমাত্র কামনা। গ্লানিতে ভরে গেল রাজার মন। 'বললেন, ধিক'। দুঃখে, ক্ষোভে তিনি প্রবেশ করলেন গহন বনে, আর সেইখানেই পেলেন কল্যাণী সেই বনের মেয়েটিকে —সরল, নির্লোভ, প্রকৃতির বনমঞ্জরীর মতোই সহজ সুন্দর। অরণ্যলক্ষ্মী হলেন রাজরানী।

চমৎকার বর্ণনাটি উদ্ধৃত করবার লোভ সামলানো গেলনা:

"আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে নদীর ধারে দেখলেন একটি পাতার ছাউনি। সেখানে একটি ছোট চুলা বসিয়ে একটি মেয়ে শাকপাতা চড়িয়ে দিয়েছে রাঁধবার জন্যে। সে ছাগল চরায় বনে, সে মধু জোগাড় ক'রে রাজবাড়িতে যোগান দিত। বেলা কেটে গেছে এই কাজে। এখন শুকনো কাঠ জ্বালিয়ে শুরু করেছে রান্না। তার পরণের কাপড়খানি দাগ্-পড়া, তার দুই হাতে দুটি শাঁখা, কানে লাগিয়ে রেখেছে একটি ধানের শিষ। চোখ দুটি তার ভোমরার মত কালো। স্নান করে সে ভিজে চুল মেলে দিয়েছে যেন বাদল-শেষের রাত্তির।"

এই গল্প ব্রতকথার ঢঙে—বহমান কথ্য ভাষায় বলা, এর টানে

টানে ছবি, রূপকথার রূপে এটি সমুজ্জল। নিঃসন্দেহ এইটিই 'গল্পসল্পের' সবচেয়ে ভালো গল্প।

আগেই বলেছি, 'গল্পসল্পে' কবির শেষ রশ্মি মৃত্যুর ছোঁয়ায় ম্লান হতে আরম্ভ করেছে। পরিপূর্ণ সাহিত্যিক কৃতিত্ব আশা করাই বৃথা। তবুও রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য ছোট বইটিতে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, তবুও থেকে থেকে সেই অফুরন্ত শক্তির এক একটি চমক আমাদের বিস্মিত করে।

আর একটি কথা মনে হয়।

প্রতিভায় মণি-রত্নের অভাব তো ছিল না কোনোদিন—মণি-মন্দির গড়া শেষ হয়ে গেল। তারপর যা কিছু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ইতস্ততঃ পড়ে ছিল, তাই নিয়ে শিল্পীর খেয়ালের খেলা চলল। কিন্তু পাথরের টুকরোর ভেতরেও এখানে-ওখানে দু-চারটি হীরে-মানিক ছিল—গল্পসল্পের পাতায় পাতায় তারাই ঝিকমিক করে উঠেছে॥

উপন্যাসের ধারা

॥ এক ॥

[পূর্ব পর্যায়]

"কেবল বৈষ্ণব পদাবলী নহে, তখন বাংলা সাহিত্যে যে কোনো বই বাহির হইত, আমার লুব্ধ হস্ত এড়াইতে পারিত না।···এই সব বই পড়িয়া জ্ঞানের দিক হইতে আমার যে অকাল পরিণতি হইয়াছিল বাংলা গ্রাম্য ভাষায় তাহাকে বলে জ্যাঠামি—প্রথম বৎসরের ভারতীতে প্রকাশিত আমার বাংলা রচনা 'করুণা' নামক গল্প তাহার নমুনা।"

ষোলো-সতেরো বছর বয়সে লেখা এই 'করুণা' সম্পূর্ণই অপরিণত বয়সের জ্যাঠামো কিনা, তার সঠিক বিচার করবার অধিকার লেখক আমাদের দেননি। যদিও নামতঃ এটি গল্প, মূলতঃ 'করুণা' একটি অসমাপ্ত উপন্যাস—সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদের শেষে "করুণা কম্পিত হস্তে নরেন্দ্রের হাত ধরিল, কিন্তু কিছু কহিল না"—এবং নীরবতার অন্তরালেই এই করুণ কাহিনীর পরিণতিও নীরব হয়ে গেল। ঔপন্যাসিক পা বাড়ালেন ইয়োরোপের পথে।

যে উপন্যাস শেষ হল না, তার গুণাগুণ বিচার সমালোচকের অধিকারের বাইরে। কিন্তু পরবর্তী উপন্যাস 'বউ ঠাকুরাণীর হাটে'ই দেখা গেল, ভাষার দুর্বলতা এবং কল্পনার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও 'করুণা' সমাপ্ত হলে খুব সম্ভব সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয় হত না।

'বউ-ঠাকুরাণীর হাট' লেখা হয়েছে 'করুণা'-র পাঁচ-ছয় বৎসর পরে—রবীন্দ্রনাথ তখন যৌবনে পা দিয়েছেন। এই উপন্যাস রচনার কাল ব্যাপ্ত হয়েছে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে 'প্রভাত সঙ্গীতে'র

মধ্যে—বিষণ্ণ-সন্ধ্যার বেদনা থেকে সূর্যোদয়ের ভেতর, ব্যক্তিক যন্ত্রণার কেন্দ্র থেকে বিশ্ববোধের উদারতম মুক্তিতে। লক্ষ্য করবার মতো—'বউ-ঠাকুরাণীর হাটে'ও উদয়াদিত্য-বিভা-সুরমা এই বেদনার বৃত্তে বন্দী—তারপর মর্মঘাতী দুঃখের মধ্য দিয়ে তাদের অপূর্ব এক বন্ধন-মোচন। যেমন 'প্রভাত সঙ্গীতে' তরুণ কবির হৃদয় বিশ্ববোধে মুক্তি পেয়েছিল, তেমনি পারিবারিক জীবনের যন্ত্রণা ও তুচ্ছতা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সর্বমানবিক কল্যাণভূমিতে উদয়াদিত্য আর বিভার প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। এই 'মুক্তি'র পূর্ণ তাৎপর্য উপন্যাসে যদি ধরা নাও দিয়ে থাকে, 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

প্রথম উপন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ স্বতঃই কুণ্ঠিত—যে-কুণ্ঠা তাঁর প্রথম স্বীকৃত-কাব্য 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' সম্পর্কেও প্রকাশিত হয়েছে; তবু 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' তিনি যেমন তার স্বাতন্ত্র্য, তার বিশেষত্বটুকু পরবর্তীকালে স্বীকার করেছেন ("রস ধরেনি, তাই তার দাম কম। কিন্তু সেই কবিতাই প্রথম স্বকীয় রূপ ধরে আমাকে আনন্দ দিয়েছিল······সে সময়কার অন্য সমস্ত কবিতা থেকে আপন ছন্দের বিশেষ সাজ পরে এসেছিল···"), তেমনি 'বউ ঠাকুরাণীর হাট'-কেও সম্পূর্ণ অস্বীকার করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়েছে। 'রবীন্দ্র রচনাবলী' সম্পাদনার কালে বইখানিকে তিনি 'অশিক্ষিত আঙুলে'র ছবি বলেছেন, চরিত্রগুলির মধ্যে 'পুতুলের ধর্ম'ই প্রত্যক্ষ করেছেন—তবু এর 'সজীবতার স্বতশ্চাঞ্চল্য'টুকুও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। বাংলা সাহিত্যের অনন্য রত্নবিদ্ বঙ্কিমচন্দ্র যে স্বয়ং-প্রবৃত্ত হয়ে সেদিন তরুণ ঔপন্যাসিকের প্রথম বইখানির সাধুবাদ করেছিলেন, তা-ও লেখক কৃতজ্ঞ চিত্তেই স্মরণ করেছেন।

এই উপন্যাসে প্রতাপাদিত্যের যে চরিত্র-চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে, তা ঐতিহাসিকের বিতর্কের বিষয়—কিছুকাল পূর্বেও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার সেটি আরো উত্তপ্ত করে

তুলেছিলেন একটি চাঞ্চল্যকর প্রবন্ধে। উপন্যাসের বিচারে সে তর্ক আবশ্যিক বলে মনে হয় না। কিন্তু সংশোধিত আকারে বর্তমানে 'বউ-ঠাকুরাণীর হাটে'র যে রূপটি আমাদের কাছে বিদ্যমান, নিঃসন্দেহেই তার সাহিত্য-মূল্য আছে। চরিত্র, ঘটনা এবং পরিণাম নির্ধারণে উপন্যাসটির সুনিশ্চয়তা আছে—মাত্র অপটু হাতের খসড়া হিসেবে বিচার করলে বইখানির ওপরে অবিচার করা হবে। নায়ক উদয়াদিত্য, সুরমা, বিভা, বসন্ত রায় এবং প্রতাপাদিত্যের মতো প্রধান প্রধান চরিত্র যেমন জীবন্ত, তেমনি রামমোহন, রমাই, রামচন্দ্র, ফার্ণাণ্ডেজ, সীতারাম—কেউই অস্পষ্ট নয়। গল্পের গতি অব্যাহত, ঘটনাক্রম নিরূপণে কৃতিত্ব আছে, সমাপ্তিটিও সুগভীর। হয়তো আরো তীব্রতা, আরো বিশ্লেষণে উপন্যাস সমৃদ্ধতর হতে পারত, কিন্তু যেটুকু হয়েছে, তা-ও অসামান্য সম্ভাবনাদীপ্ত।

সন্দেহ নেই—এই উপন্যাসে বঙ্কিমের প্রভাব আছে। ফরাসী রোমান্স—বিশেষ করে আলেকজান্দার দ্যুমার ছায়া যে রবীন্দ্রনাথের ওপর ছিলই—বইটির নির্মিতিতে তা বোঝা যায়; উপন্যাসে রুক্মিণী বা মঙ্গলার যে চরিত্রটি আছে, তা দ্যুমার 'লে ত্রোয়া মুস্‌কেত্যার'-এর 'মাদাম'-কে মনে করিয়ে দেয়, সেই নিষ্ঠুরতা, সেই চক্রান্ত, সেই বাঘিনীবৃত্তি। তবু 'বউ-ঠাকুরাণীর হাট' রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। এই নিজস্বটুকু তাঁর সমগ্র সাহিত্য সাধনার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

শক্তির সঙ্গে সুষমার বিরোধ, প্রতাপের সঙ্গে প্রেমের সংঘাত—উপন্যাসের পারিবারিক ট্র্যাজিডীকে অতিক্রম করে একটি অখণ্ড ধ্রুবপদের মতো বেজে উঠেছে। বসন্ত রায়ের আনন্দময় প্রসন্নতার সঙ্গে উদয়াদিত্যের শান্ত গভীর দুঃখবরণ এক সঙ্গে মিলিত হয়ে এর মধ্যে যে মহান্ ব্যাপ্তি ও ব্যঞ্জনা এনেছে, তা প্রথম ঔপন্যাসিক প্রচেষ্টার সমস্ত অসম্পূর্ণতাকে একটি মহিমার আবরণে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। তাই উপন্যাসটিকে রবীন্দ্রনাথের পরিণত মন সম্পূর্ণ

স্বীকৃতি না দিলেও এই মহিমময় বক্তব্যটিকে কখনো ভুলতে পারেনি—'পরিত্রাণ' 'প্রায়শ্চিত্তে'র নির্ঝর-ঝরিত পথে অগ্রসর হয়ে 'মুক্তধারা'র সাংকেতিকতায় তা পরিপূর্ণভাবে কল্লোলিত হয়েছে। পারিবারিক কোমলতায় অশ্রুসিক্ত এই উপন্যাস একটি সুমহান্ সম্ভাবনায় অরুণ-রঞ্জিত, রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট জীবন-চিন্তায় অঙ্কুরিত।

যুগ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের অনুভাবনায় রবীন্দ্রনাথের মন তখনও ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসের গণ্ডীতেই পরিক্রমা করছিল। অতএব জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর 'বালক' পত্রিকার পাতায় যখন নিয়মিত জোগান দেবার জন্য তাঁর ডাক পড়ল, তখন দেওঘরগামী ট্রেনের কামরায় লব্ধ একটি স্বপ্নের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিহাস মিশিয়ে তিনি আরম্ভ করলেন 'রাজর্ষি' লিখতে। বালকদের জন্যই তিনি উপন্যাস লিখছিলেন, কিন্তু সেজন্য বালকোচিত কৃত্রিমতা অবলম্বন করবার প্রয়োজন বোধ করেননি। হাসি এবং তাতার সঙ্গে মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের স্নিগ্ধ সম্পর্কের সূচনা দিয়ে যে উপন্যাস আরম্ভ হল—তা ধীরে ধীরে উত্তীর্ণ হল ধর্মভিত্তিক কুটিল চক্রান্তে, ভ্রাতৃবিরোধে, নির্দোষের রক্তপাতে, রাজ্যের ভাঙাগড়ায়—প।রশেষে উপস্থিত হল ভারত ইতিহাসের এক পরম বিয়োগান্তক অধ্যায়ের উপান্তে। স্বভাবতঃই চরিত্র এল অসংখ্য, ঘটনা দেখা দিল প্রভূত পরিমাণে, বিবরণ দিতে হল পাতার পর পাতা—ভাষা নিজের প্রয়োজনেই উচ্ছ্বসিত হল। বালকদের জন্য কলম ধরেও রবীন্দ্রনাথ সর্বজনের জন্যেই সেটিকে সমাপ্ত করলেন। বৎসরকাল মাত্র জীবী 'বালক' পত্রিকা স্বাভাবিকভাবেই 'রাজর্ষি'কে ধরে রাখতে পারল না, রবীন্দ্রনাথকে পরে অন্যভাবে লেখাটি শেষ করতে হল।

'রাজর্ষি' যেমন 'বউ-ঠাকুরাণীর হাটে'র মতো ইতিহাসভিত্তিক, তেমনি বিস্ময়করভাবে মূল বক্তব্যেও এক। রচনাবলীর মুখবন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টাক্ষরে লিখেছেন: "আসল গল্পটা ছিল প্রেমের

অহিংস পূজার সঙ্গে শক্তিপূজার বিরোধ।” ঠিক এই দ্বন্দ্বই ‘বউ-ঠাকুরাণীর হাটে’ দেখতে পাই, প্রতাপাদিত্য এবং রঘুপতি বস্তুতঃ একই সত্তার প্রতীক, উদয়াদিত্য এবং বসন্ত রায় যৌথভাবে গোবিন্দমাণিক্যের মর্মসঙ্গী, জয়সিংহের আত্মদান ও সুরমার মৃত্যু একই তাৎপর্য বহন করে। সুরমার মৃত্যুতে প্রতাপাদিত্যের হিংস্রতা বিন্দুমাত্র শমিত হয়নি—জয়সিংহের মৃত্যুতে রঘুপতি আরো ক্ষিপ্ত, আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে রাজনৈতিক চক্রান্তের জাল বিস্তার করেছেন—নক্ষত্র রায়কে হাতের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন। পরিণতিতে পার্থক্য যা-ই থাক, তিন বৎসরের ব্যবধানে রচিত পূর্ণতর উপন্যাস ‘রাজর্ষি’ ‘বউ-ঠাকুরাণীর হাটে’র সঙ্গে একই ভাবসূত্রে সংগ্রথিত।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “বস্তুত উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়েছে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে।” তা হলে পরের অংশগুলো? “ফসল-খেতের যেখানে কিনারা সেদিকটাতে চাষ পড়েনি, আগাছায় জঙ্গল হয়ে উঠেছে। সাময়িক পত্রের অবিবেচনায় প্রায়ই লেখনীর জাত নষ্ট হয়।” তারও পরে শিশু-সাহিত্যের স্বধর্ম সম্পর্কেও কিছু মূল্যবান উক্তি তিনি করেছেন।

কিন্তু ‘রাজর্ষি’ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ স্বীকারযোগ্য বলে মনে হয় না। ভাষা এবং রচনাভঙ্গির দিক থেকে ‘রাজর্ষি’কে শিশু সাহিত্যের পদবাচ্য করা আদৌ চলে কিনা সন্দেহ আছে। ‘রাজর্ষি’ ‘Tom Brown’s Schooldays” নয়, মিসেস এজ্‌ওয়ার্থের ‘Katy Series’-ও নয়। স্টিভেনসনের ‘Treasure Island’ কিংবা মার্ক টোয়াইনের ‘Huckleberry Finn’ যে অর্থে শুধুই সাহিত্য, সেই গৌরবই ‘রাজর্ষি’ দাবী করতে পারে।

যদি তাই হয়, তা হলে ‘রাজর্ষি’ মোটামুটি একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। একটু অনাবশ্যক বিস্তৃতি যেন আছে, বিবৃতিধর্মিতায়

নিশ্চয়ই কিছু ক্লান্তিকর, অনেক অংশ প্রায় গতিহীন, তুলনামূলকভাবে 'বউ-ঠাকুরাণীর হাট' ঢের বেশি প্রাণদীপ্ত এবং গভীরচারী। তবু পঞ্চদশ অধ্যায়েই রাজর্ষি' কেন 'সমাপ্ত' হবে? এই উপন্যাসের মর্মমধুটুকু আহরণ করে রবীন্দ্রনাথ 'বিসর্জন' নাটকটি রচনা করেছেন; সন্দেহ নেই, উত্তরকালে 'রাজর্ষি'র মূল্য নিরূপণ করতে গিয়ে তিনি 'বিসর্জনে'র দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছেন।

উপন্যাস উপন্যাসই। তাতে নাট্য-লক্ষণ থাকতে পারে, প্রচুর নাটকীয়তাও থাকতে পারে—কিন্তু সমগ্রভাবে ঔপন্যাসিক স্বাতন্ত্র্যও তার থাকবে। 'রাজর্ষি' নামকরণের মধ্যেই জীবনীধর্মী একটি সুবৃহৎ উপন্যাসের প্রতিশ্রুতি আছে, অতএব মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের একটি পূর্বাপর পরিণতি নির্ধারণের দায়িত্ব ঔপন্যাসিক কখনোই এড়াতে পারেন না। রঘুপতির হৃৎ পরিবর্তনের ইতিবৃত্ত রচনা করেই কাহিনী সমাপ্ত হতে পারে না, তা হলে উপন্যাসের নামও 'বিসর্জন'ই হত।

বস্তুতঃ, কাহিনীধর্মী রচনায় রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ শিথিল, ভাবধর্মী বক্তব্যের ইঙ্গিত-সংকেতময় বিস্তারেই তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য। তাই 'রাজর্ষি'র কাহিনীগত আতিশয্য তাঁর কাছে গুরুভার মনে হয়েছে—তার আইডিয়াগত ব্যঞ্জনাটুকু আশ্রয় করেই 'বিসর্জনে' তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন। তাঁর এই বিশিষ্ট মানদণ্ডে 'রাজর্ষি'র বিচার কখনোই নিরপেক্ষ নয়। এ-কথা বলা যেতে পারে, আর একটু পরিমিতি বোধ থাকলে, বিবৃতিধর্মিতার মধ্যে আরো কিছু প্রাণ-সঞ্চার করতে পারলে এবং সর্বোপরি উপন্যাসটির শেষের দিকে লেখকের ক্লান্তির চিহ্ন না থাকলে—'রাজর্ষি' বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠত। হাসি, গোবিন্দমাণিক্য, রঘুপতি, জয়সিংহ, নক্ষত্র রায়, খুড়া সাহেব এবং বিল্বন ঠাকুর উল্লেখযোগ্য চরিত্রসৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে।

'বউ-ঠাকুরাণীর হাট' এবং 'রাজর্ষি' হয়তো সম্পূর্ণ সার্থক উপন্যাস

নয়; কিন্তু এই সম্ভাবনা যে-কোনো ঔপন্যাসিকের পক্ষেই গৌরবের বিষয়—অন্য ক্ষেত্রে বৃহত্তর মহিমায় উদ্ভাসিত না হলে রবীন্দ্রনাথের কাছেও এই সত্য গোপন থাকত না।

॥ দুই ॥

এর মধ্যে ষোলো বৎসর পার হয়ে গেল।

উপন্যাসের আর সাক্ষাৎ নেই বটে, কিন্তু ছোটগল্প রচনায় রবীন্দ্রনাথের শিল্পিব্যক্তিত্ব এরই মধ্যে পূর্ণ শক্তিতে উদ্ভাসিত হল। গদ্য-কাহিনী রচনায় রবীন্দ্রনাথের একটা স্বাভাবিক সংকোচ ছিল মনে হয়, একটির পর একটি আশ্চর্য ভালো গল্প লিখে সে সংকোচ তাঁর অপসারিত হল, 'মহাকায়' কাহিনী রচনার জন্য তাঁর মন প্রস্তুত হয়ে উঠল।

এই প্রস্তুতির লক্ষণ 'নষ্টনীড়'—ঔপন্যাসিক-চরিত্রে ভূষিত এই দীর্ঘ ছোট গল্পটির আলোচনা আগেই করা হয়েছে। একান্ত মনোবিশ্লেষণধর্মী এই গল্পটির পাশে পাশে তাই সহজেই আবির্ভূত হল 'চোখের বালি'—রবীন্দ্রনাথের অন্যতম স্মরণীয় উপন্যাস। শুধু তাঁরই স্মরণীয় উপন্যাস নয়—'চোখের বালি' থেকে বাংলা সাহিত্যেই এক নতুন অধ্যায় আরম্ভ হল।

যে বৎসর 'নষ্টনীড়' রচিত হল, সেই বৎসরেই শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের নির্বন্ধে রবীন্দ্রনাথকে নব পর্যায় 'বঙ্গদর্শনে'র ভার গ্রহণ করতে হয়। পাঁচ বৎসর রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদনা করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের পক্ষেও এই পাঁচটি বৎসরের গুরুত্ব অসামান্য।

কী সেই গুরুত্ব? বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক উত্তমপুরুষ রবীন্দ্রনাথ জেনেছিলেন, বঙ্কিম-প্রবর্তিত 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদনা গ্রহণ করা দায়িত্ব হিসেবে কতখানি কঠিন! কারণ:

বঙ্কিমচন্দ্র দ্বৈত মহিমায় বাঙালীর দৃষ্টির সম্মুখে সমুজ্জ্বল। একদিকে তিনি আন্তর্জাতিক মানের ঔপন্যাসিক, অন্যদিকে অনন্য চিন্তাধিনেতা। দেশপ্রেমে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ঐতিহ্যধারার বিচার বিশ্লেষণে, ভারতবর্ষের সম্মুখে অভীপ্সা এবং প্রজ্ঞার আদর্শ সংস্থাপনে—মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি সুনিষ্ঠ। 'বঙ্গদর্শনে'র নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করবার সময় সেই 'সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ' ব্যক্তিত্বকে রবীন্দ্রনাথ ঐকান্তিক শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণ করেছিলেন। উপন্যাস-শিল্পী এবং চিন্তানায়ক বঙ্কিমের দ্বৈতকর্ম তিনিও 'বঙ্গদর্শনে' সাধন করতে চাইলেন, 'বর্তমান বঙ্গচিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে উপযুক্তভাবে এই পত্রে প্রতিফলিত' করবার ব্রতই গ্রহণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদকরূপে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম উপন্যাসকার বঙ্কিমকেই স্মরণ করলেন। ১৩০৮ সালের বৈশাখ থেকেই শুরু হল তাঁর প্রথম সার্থক উপন্যাস 'চোখের বালি।'

ঐকান্ত মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের দ্বারপ্রান্তে এসে বঙ্কিমচন্দ্রকে যেখানে থেমে যেতে হয়েছিল, সেখান থেকেই রবীন্দ্রনাথকে যাত্রা আরম্ভ করতে হল। সাহিত্যের বিচারে 'চোখের বালি' থেকেই বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমোত্তর আধুনিক ধারার সূত্রপাত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রোহিণী' এবং রবীন্দ্রনাথের 'বিনোদিনী'র বিশ্লেষণেই এই পার্থক্য সব চাইতে সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যাবে। 'রচনাবলী'তে নতুনভাবে 'চোখের বালি'র ভূমিকা লিখতে গিয়ে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ নির্দেশ করে বলেছেন :

'আমরা একদা বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ উপাখ্যানের রস সম্ভোগ করেছি। তখনকার দিনে যে রস ছিল নতুন। পরে সেই বঙ্গ-দর্শনকে নব পর্যায়ে টেনে আনা যেতে পারে, কিন্তু সেই প্রথম পালার পুনরাবৃত্তি হতে পারে না। সেদিনের আসর ভেঙে গেছে, নতুন সম্পাদককে রাস্তার মোড় ফেরাতেই হবে।....ঠিক করতে হল, এবারকার গল্প বানাতে হবে এ যুগের কারখানা ঘরে।

শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনও হত, এখনও হয়; তবে কিনা তার ক্ষেত্র আলাদা, অন্তত গল্পের এলাকার মধ্যে।······তাই গল্পের আবদার যখন এড়াতে পারলুম না তখন নামতে হল মানব-সংসারের সেই কারখানা ঘরে যেখানে আগুনের জ্বলুনি, হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে। মানব বিধাতার এই নির্মম সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার বিবরণ তার পূর্বে গল্প অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় আর প্রকাশ পায়নি।'

যুগের কারখানাঘরে, মানব বিধাতার হাতুড়ি হাতে নিয়ে—আন্তর-যন্ত্রণার আগুনে যে নতুন সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথ অতঃপর প্রবৃত্ত হলেন, তাই তাঁর ঔপন্যাসিক জীবনের যথার্থ সূচনা। তিনি আরো বলেছেন, 'এই রাস্তাতে ক্রমে ক্রমে দেখা দিয়েছে গোরা, ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গ।'

অতএব 'চোখের বালি' নিঃসন্দেহে বাংলা-সাহিত্যে এক নতুন ধারার বোধক। এই নূতনত্ব যে সর্বথা অভিনব, একথাও জোর করে বলা যায় না। যদিচ বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রধানতঃ কাহিনী-নির্ভর উপন্যাসই লিখতে হয়েছে, কারণ দেশকালানুযায়ী প্রথম বাঙালী ঔপন্যাসিকের এর অতিরিক্ত কিছু করণীয় ছিল না—তবু আজ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ ভারতীয় উপন্যাসকার বঙ্কিম প্রয়োজনীয় মনোবিশ্লেষণে কোথাও কার্পণ্য করেননি। এই বিশ্লেষণের নিপুণ পরিচয় আছে 'বিষবৃক্ষে', 'কৃষ্ণকান্তের উইলে', 'চন্দ্রশেখরে'।

রবীন্দ্রনাথ যে নবধারার উল্লেখ করেছেন, আসলে এক কথায় রিয়্যালিজ্‌ম্ ছাড়া আর কিছুই নয়। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে আদর্শবাদের ভূমিকাকে কোনোদিন উপেক্ষা করতে পারেননি—যে ইংরেজি উপন্যাস সাহিত্য থেকে তিনি পাঠ নিয়েছিলেন—সেখানে নীতিমূলক কোনো সিদ্ধান্ত নিষ্পন্ন করাই ঔপন্যাসিকের একটি প্রধান কর্তব্য ছিল। কিন্তু 'চোখের বালি' রচনা করতে গিয়ে লেখক ফরাসী সাহিত্যের—বিশেষভাবে গুস্তাভ ফ্লোব্যারের সন্নিহিত

হলেন। ইংরেজ লেখক যখন "to improve the society" উপন্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করতেন, তখন "L'art pour l'art"—মন্ত্রের সাধক ফরাসীর বক্তব্য ছিল: "যা-সত্য, তাই সুন্দর, যা সুন্দর—তা সত্য হতে বাধ্য।" কবি কীট্‌সের উপলব্ধিকেই আরো বিস্তৃত করে কবি ম্যুসে বলেছিলেন: "Rien n'est vrai que le beau; rein n'est vrai sans beauté"—'সুন্দরের চেয়ে সত্য নেই, কোনো সত্যই সৌন্দর্যহীন নয়।'

ফ্লোব্যারের বস্তুতান্ত্রিকতার মূলমন্ত্রটিও এই, এই আদর্শেই রচিত 'মাদাম বোভারী', 'সালাম্বো।'

"Flaubert is a marvellous artist—art was his religion, the remedy to his mind for all evils, the very meaning of life. And his art is no more verbal intoxication working on an empty mind: it is the garment of a philosophical thought, of a strong will and personality······Flaubert combines Romanticism and Realism, imagination and observation, wide scope and *measure*, colo .r and sobriety, imagery and objectivity."

'চোখের বালি'র ধর্মও এই 'art', উপন্যাসের গঠনে ফ্লোব্যারের অনেকগুলি গুণপনা—বিশেষ করে উদ্ধৃতিটির শেষ বাক্য যেন রবীন্দ্রনাথকেও লক্ষ্য করেছে, এমন মনে করা অন্যায় নয়। মহেন্দ্র-বিনোদিনী-বিহারী-আশার এই কাহিনী ফ্ল্যোবারের শিল্পসুষমায় মণ্ডিত হয়ে প্রথম বস্তুতান্ত্রিক বাংলা উপন্যাসরূপে পদক্ষেপ করেছে।

'চোখের বালি' রচনার সময় রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প-চিন্তাকে নতুন কালের প্রয়োজনে পরিবর্ধিত করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। 'বিষবৃক্ষ' তাঁর স্মরণে ছিল, 'চোখের বালি'তে বারবার ইঙ্গিতগর্ভরূপে এই উপন্যাসের উল্লেখ আছে। যেমন:

'বিহারী কহিল, "বল কী। দ্বিতীয় বিষবৃক্ষ।"

মহেন্দ্র। ঠিক তাই। এখন উহাকে বিদায় করিবার জন্য চুনি ছটফট করিতেছে।

……বিহারী কহিল, "বিদায় করিলেও ফিরিতে কতক্ষণ। বিধবার বিবাহ দিয়া দাও—বিষদাঁত একেবারে ভাঙিবে।"

মহেন্দ্র। কুন্দরও তো বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল।'

উপন্যাসে অন্যত্র যখন বিনোদিনীর অন্তর্দাহ শুরু হয়েছে, তখন মহেন্দ্র আবিষ্কার করেছিল, বিনোদিনী 'বিষবৃক্ষ' পড়ছে। মাত্র সাহিত্য-পাঠই নয়, তার অন্যতর তাৎপর্যও ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে উপন্যাসে।

কিন্তু কেবল 'বিষবৃক্ষ' নয়—বিনোদিনীর চরিত্রের প্রখর প্রবলতার মধ্যে 'কৃষ্ণকান্তের' রোহিণীও প্রচ্ছন্ন হয়ে নেই তা বলা চলে না। সেই এক জ্বালা, বঞ্চিত-জীবনের ব্যর্থ আক্রোশ, নিরুপায় ক্ষোভে নিজের শক্তিকে যাচাই করে নেওয়া। বিনোদিনীর গুণপণা-বর্ণনাতেও রবীন্দ্রনাথ পরোক্ষভাবে গুণবতী রোহিণীর কৃতিত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন:

"বিনোদিনীর বাপ বিশেষ ধনী ছিলনা, কিন্তু তাহার একমাত্র কন্যাকে সে মিশনারী মেম রাখিয়া বহু যত্নে পড়াশুনা এবং কারুকার্য শিখাইয়াছিল।" এই শিক্ষা এবং শিল্পবোধ বিনোদিনীর বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্বের বৃত্তরূপ, রোহিণীর ক্ষেত্রেও তাই।

'বিষবৃক্ষে'র নগেন্দ্রকে বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন, মহেন্দ্র-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যও অনুরূপ। অর্থাৎ কাহিনীর এই মূল চরিত্রটির মর্মগত দুর্বলতা নির্ধারণে রবীন্দ্রনাথ বিস্ময়কর ভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুবর্তী হয়েছেন। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের উনত্রিংশ পরিচ্ছেদে 'বিষবৃক্ষ' কী, এই প্রসঙ্গের আলোচনায় নগেন্দ্র-সম্পর্কে বঙ্কিম বলেছেন, "কুন্দনন্দিনীকে লুব্ধলোচনে দেখিবার পূর্বে নগেন্দ্র কখনও লোভে পড়েন নাই; কেননা কখনও

কিছুর অভাব জানিতে পারেন নাই। সুতরাং লোভ সম্বরণ করিবার জন্য যে মানসিক অভ্যাস বা শিক্ষা আবশ্যক, তাহা তাঁহার হয় নাই। এই জন্যই তিনি চিত্তসংযমে প্রবৃত্ত হইয়াও সক্ষম হইলেন না। অবিচ্ছিন্ন সুখ, দুঃখের মূল ; পূর্বগামী দুঃখ ব্যতীত স্থায়ী সুখ জন্মে না।"—অতএব নগেন্দ্রের বিশুদ্ধীকরণের জন্য প্রলোভনজাত এই দুঃখটুকুর প্রয়োজন ছিল।

'চোখের বালি'র ৫৩ সংখ্যক অধ্যায়ে অনুতপ্ত মহেন্দ্র বলেছে: "কিন্তু আমার এ-ধূলা কিছুতেই মুছিবে না কাকী মা।

অন্নপূর্ণা। দুই-একবার ঝাড়িলেই ঝরিয়া যাইবে। মহিন, ভালোই হইয়াছে।

নিজেকে ভালো বলিয়া তোর অহংকার ছিল, নিজের 'পরে বিশ্বাস তোর বড়ো বেশি ছিল, পাপের ঝড়ে তোর সেই গর্বটুকুই ভাঙিয়া দিয়াছে, আর কোনো অনিষ্ট করে নাই।

মহেন্দ্র। কাকীমা, এবার তোমাকে আর ছাড়িয়া দিব না, তুমি গিয়াই আমার এই দুর্গতি হইয়াছে।

অন্নপূর্ণা। আমি থাকিয়া যে-দুর্গতি ঠেকাইয়া রাখিতাম, সে-দুর্গতি একবার ঘটিয়া যাওয়া ভালো। এখন আর তোর আমাকে কোনো দরকার হইবে না।"

মহেন্দ্রের এই আত্মশুদ্ধিই যদি 'চোখের বালি'র বক্তব্য হয়, তা হলে মূল উদ্দেশ্যের দিক থেকে এই উপন্যাস 'বিষবৃক্ষে'র প্রবর্ধন ছাড়া আর কিছুই নয়। নগেন্দ্র-মহেন্দ্র একই কুলাল-চক্রে শোধিত।

'চোখের বালি'র আসল স্বাতন্ত্র্য বিষয়বস্তুতে নয়, রীতিতে। রবীন্দ্রনাথের চল্লিশ বৎসর বয়সের পূর্ণায়ত লেখনী, বর্ণনায়, বিশ্লেষণে ও বাক্-চাতুর্যে অসীম আত্মপ্রত্যয় অগ্রসর, এমনকি সংলাপের সাধুভাষা পর্যন্ত সেই শক্তির তরঙ্গে অতিশয় স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। "সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে

দেখানো—'চোখের বালি'তে এ পদ্ধতি অনেকাংশেই সফল। অবশ্য ঘটনার প্রভাব রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ এড়াতে পারেননি, প্রচুর নাট্যমুহূর্ত এতে আছে, কোনো-কোনোটিকে মেলোড্রামাটিক্ বললেও অন্যায় বলা হয় না, তবু মনোবিকলনই এর প্রধান অবলম্বন।

যদিও "মায়ের ঈর্ষা"-কেই রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের প্রধান সংকট-সূত্র বলে নির্দেশ করেছেন, তথাপি ওটিকে গৌণ কারণ ছাড়া আর কিছুই মনে করা যায় না। যে দুর্বলতা এবং অস্থিরচিত্ততা মহেন্দ্রকে প্রথম থেকেই শিকারীর লক্ষ্যের সামনে নিরুপায় মৃগের মতো সহজবধ্য করে রেখেছে, সেই কারণেই বিনোদিনী না এলেও অন্য যে-কোনো নারী যে-কোনোদিন তাকে আত্মসাৎ করতে পারত। মহেন্দ্র এত অরক্ষিত, এমনই আবেগ-বিহ্বল যে নিজের মধ্যেই তার পতন প্রস্তুত ছিল। তাকে আয়ত্ত করবার জন্য বিনোদিনীকে বিশেষ আয়োজনও করতে হয়নি ; লঘুচিত্ত মহেন্দ্র আশাকে নিয়ে অপরিমিত মেতে উঠে স্বাভাবিক নিয়মেই যখন ক্লান্তিতে অবসন্ন—সেই মুহূর্তে বিনোদিনীর আবির্ভাব যেন তাকে নতুন একটি খেলনার দিকে টেনে নিয়েছে। রাজলক্ষ্মীর ঈর্ষ্যাই মহেন্দ্রের পতনের হেতু নয়, তাঁর অতি-লালনেই এই চির-শিশুটি সমস্ত উপন্যাসে এক পরম নির্বোধের ভূমিকায় অভিনয় করে গেছে আর মাঝিহীন নৌকোর মতো ইতস্ততঃ ভেসে বেড়িয়েছে অসংযত হৃদয়াবেগের জোয়ারে ভাঁটায়।

রাজলক্ষ্মী এবং অন্নপূর্ণার দুটি স্বাভাবিক চরিত্রকে ছেড়ে দিলে, একটি স্নিগ্ধ-সরলতা ছাড়া আশার চরিত্রেও বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। হয়তো তার প্রয়োজনও নেই, তার কোমল-নির্মলতাটুকুই বিনা দোষে দুঃখ-বহনের নিষ্ঠুরতাকে যথার্থ ফুটিয়ে তুলেছে। উপন্যাসের কেন্দ্রচারিণী প্রলয়শক্তি হল বিনোদিনী, আর বিহারী পৌরুষের বজ্রমুঠিতে যেন সেই মৃত্যু-তুরঙ্গীর

বল্‌গা নিয়ন্ত্রণ করেছে। আশা-সম্পর্কে বিহারীর মনোগত দুর্বলতায় কোথায় যেন একটু কষ্ট-কল্পনা আছে, বিহারীর এই বেদনার জায়গাটুকু রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য করে তুলতে পারেননি। কিন্তু বিহারী আর বিনোদিনীর কাহিনীই 'চোখের বালি'র যথার্থ ঔপন্যাসিক স্বরূপ; একটা স্থূল উপমা দিয়ে বলা যায়—যেন সার্কাসের নিপুণ খেলোয়াড় নবীনা বাঘিনীকে পোষ মানাবার জন্য আসরে এসে নেমেছে।

বিনোদিনী যে প্রথমদিকে মহেন্দ্রের প্রতি প্রলোভনের জাল বিস্তার করেছিল, তার কারণগুলি সুস্পষ্ট। ভালো মহেন্দ্রকে সে আদৌ বাসেনি, আশা-মহেন্দ্রের অসংযত প্রণয়লীলায় তার অতৃপ্ত কামনা কিছু উত্তেজিত হয়েছিল—এই মাত্র; নিজ বিবাহ-প্রসঙ্গে প্রত্যাখ্যানের নিগূঢ় অপমান তার মনে ছিল, আশা সম্পর্কে মহেন্দ্রের মত্ততা এবং বিহারীর শ্রদ্ধা তাকে যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংগ্রামে নামিয়েছিল, এবং নিজের এমন পরিপূর্ণ জীবন-যৌবন—যা "বারাসতের বর্বর বানরের" হাতে পড়ে সম্পূর্ণ শূন্য হয়ে গেছে, তার জন্যে একটা সুতীব্র ক্রোধ এবং প্রতিহিংসার চেতনাও বিনোদিনীর ছিল।

বিনোদিনী যখন নিজের অন্তর্দহনে একটা সর্বাত্মক বিনাশের পূর্বপর্ব রচনা করছিল, নির্বুদ্ধি আশার চিঠিকে অবলম্বন করে বিষে বিদ্ধ করছিল মহেন্দ্রকে, তখন এল বিহারী। এক নির্মল উজ্জ্বল পৌরুষ নিয়ে সে বিনোদিনীকে চ্যালেঞ্জ করল, চড়িভাতির সেই নির্জন দুপুরে তার মনে এক অম্লান নারীত্বকে পুনর্জীবিত করল, রক্তাক্ত আঘাত দিয়ে তার বিষফণাকে দলিত করল। পরিবর্তন শুরু হল বিনোদিনীর। মহেন্দ্রকে সে কামনার জালে জড়াতে চাইছিল, এবার প্রেম আর পূজা দিয়ে বিহারীকে লাভ করতে চাইল। এইভাবেই 'চণ্ডালিকা'র প্রকৃতি আত্মনিবেদন করেছিল আনন্দের কাছে।

সে লাভ সহজ হল না। ঘটনাচক্র এবং ভুল বোঝা মাঝখানে এসে দাঁড়াল। তারপর মত্ত-মহেন্দ্রকে অবলম্বন করে বিনোদিনীর বিহারীর সন্ধানে যাত্রা। তার কঠিন নিঃস্পৃহতা আর ঘৃণার আঘাতে, ধীরে ধীরে স্বভাবতঃ সচ্চরিত্র মহেন্দ্র আত্মস্থ হল, অনেক বেদনা আর ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে, রাজলক্ষ্মীর শেষ শয্যায় আশা আর মহেন্দ্রের পুনর্মিলন ঘটল। বিহারীর স্পর্শে নবীনায়িতা বিনোদিনী কাশী যাত্রা করল অন্নপূর্ণার সঙ্গে।

উপন্যাসের কল্যাণময় পরিণতির জন্য সমস্ত কৃতিত্ব প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বিহারীরই প্রাপ্য। প্রয়োজন সময়ে যেমন সে বারে বারে সংকটত্রাতা রূপে দেখা দিয়েছে, তেমনি তারই চরিত্রস্পর্শে প্রলয়াগ্নি বিনোদিনীর দীপশিখায় রূপান্তর ঘটেছে; যেন প্রবৃত্তি-বন্যার অন্ধ উচ্ছ্বাস তার সামনে এসে শান্ত কলধ্বনিতে স্তিমিত হয়ে গেছে।

প্রশ্ন জাগে, বিহারী-বিনোদিনীর বিবাহ ব্যাপারে গ্রন্থকার কুণ্ঠিত হলেন কেন। বিহারীর দিক থেকে এ প্রস্তাব ছিল, বিধবা-বিবাহে রবীন্দ্রনাথেরও নিশ্চয়ই আপত্তি ছিল না, কিন্তু বিনোদিনীর দিক থেকে এই যে বাধা—তা কি লেখকের দুর্বলতাই প্রমাণ করে? এখানে রবীন্দ্রনাথও কি সমকালের পাঠকের কথাই ভাবলেন? সমাজের রক্তদৃষ্টির সামনে নতি স্বীকার করলেন? বঙ্কিমের ঐতিহ্যই কি তাঁকে মেনে নিতে হল?

আমার মনে হয়, এই অভিযোগ ভিত্তিহীন। এর সহজ এবং সরল উত্তর উপন্যাসেই আছে। মহেন্দ্র-বিনোদিনীকে নিয়ে কুৎসা ও কদর্যতার যে তরঙ্গ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, বিনোদিনীর সঙ্গে বিবাহ ঘটলে সে কলঙ্ক বিহারীকেও ম্লান করত। বিহারী সম্পর্কে বিনোদিনীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় কোনো খাদ ছিল না —তার পূজ্য-প্রিয়তমকে এক বিন্দু গ্লানিও যাতে স্পর্শ না করে—তারই জন্য এত বড়ো ত্যাগকে সে সহজেই স্বীকার করে নিল।

আমাদের হয়তো ভালো লাগবে না। তবু এই মনস্তত্ত্ব যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক, এ-কথাও বোধ করি জোরের সঙ্গে বলা সম্ভব নয়। যে নারী কামনার কুৎসিত ঘৃণজাল সৃষ্টি করে শেষ পর্যন্ত নিজেই গ্লানিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, সে তার আদর্শ পুরুষকে সর্ব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠা দিতে চাইবে—এ সত্য স্বাভাবিক, রবীন্দ্রনাথের সংযত সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে সমন্বিত। বিহারী বিনোদিনীর সামাজিক মিলন না ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ বৃহত্তর মিলনেরই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

'চোখের বালি'-তে যে রিয়্যালিজ্‌ম ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথকে অনেকখানি অগ্রসর করে দিয়েছিল, 'বঙ্গদর্শনে' পরবর্তী উপন্যাস 'নৌকাডুবি' সেখান থেকে অনেকখানি পশ্চাদপসরণ করেছে। এই উপন্যাস শুধুই গল্প—এর প্রবল মনস্তাত্ত্বিক সম্ভাবনা এবং একটি নিষ্করুণ নাট্যভূমিকা শেষ পর্যন্ত রূপকথার গল্পের মতোই কমলা-নলিনাক্ষের শুভ-মিলনে পরিসমাপ্তি পেয়েছে। রমেশের নায়কত্ব অকস্মাৎ খণ্ডিত, হেমনলিনীর কাহিনী অসম্পূর্ণ, ঘটনাবৃত্ত রচনা করেই লেখক দায়মুক্ত। রমেশ এবং কমলার প্রাথমিক সম্পর্ক থেকে কমলাকে যে-ভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, তাকে মাত্র কমলার হিন্দু নারীসুলভ বিবাহ-সংস্কার দিয়ে ব্যাখ্যা করা কঠিন। গল্পে গভীরতার অভাব, অক্ষয় অনাবশ্যকভাবে অতি সক্রিয়, হেমনলিনী 'ন যযৌ ন তস্থৌ', সজ্জন নলিনাক্ষ বর্ণহীন। 'নৌকাডুবি' কৌতূহলোদ্দীপক কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তার কোনো বিশিষ্ট পরিচয় নেই।

এই দুর্বলতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও সচেতন ছিলেন। 'রচনাবলী'র ভূমিকায় তিনি দ্বিধাজড়িত হয়ে বলেছেন, "স্বামীর সম্বন্ধের নিত্যতা নিয়ে যে সংস্কার আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েদের মনে আছে তার মূল এত গভীর কিনা যাতে অজ্ঞানজনিত প্রথম ভালোবাসার জালকে ধিক্কারের সঙ্গে সে ছিন্ন করতে পারে"—এ প্রশ্নের সমাধান না করেও হয়তো ভাবা যায়: "কোনো একজন বিশেষ মেয়ের মনে

সমাজের চিরকালীন সংস্কার দুর্নিবার রূপে এমন প্রবল হওয়া অসম্ভব নয় যাতে অপরিচিত স্বামীর সংবাদমাত্রেই সকল বন্ধন ছিঁড়ে তার দিকে ছুটে যেতে পারে।" 'নৌকাডুবি' যদি সাধারণ জীবন-সত্যের পাশ কাটিয়ে 'একজন বিশেষ মেয়ের' বিশেষ কাহিনীই বলবার চেষ্টা করে, তা হলে অবশ্য আর কোনো প্রশ্নই থাকে না। রমেশের 'ট্রাজেডি' এবং 'গল্পের মধ্যে যে-অংশে বর্ণনায় এবং বেদনায় কবিত্বের স্পর্শ লেগেছে' সেইটুকুই যদি পাঠককে তৃপ্ত করে তা হলেই ঔপন্যাসিক নিজেকে কিছুটা সার্থক বলে বিবেচনা করবেন।

তাই যদি, তা হলে পাঠকেরও আর কোনো বক্তব্য থাকে না।

॥ তিন ॥

১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন, ১৯০৬ সালে বিখ্যাত 'বরিশাল সাহিত্য-সম্মেলন'। 'বন্দেমাতরম', 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর' পত্রিকায় রুদ্রের পদধ্বনি। স্বদেশ এবং স্বাধীনতার মন্ত্রে আসমুদ্র ভারতবর্ষে বিক্ষুব্ধ আলোড়ন, ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী, মানিকতলা বোমার মামলা। কংগ্রেসী রাজনীতিতে উগ্রপন্থী ও রক্ষণশীলদলের মধ্যে শক্তির দ্বন্দ্ব। এক নিদারুণ কালভূমি।

সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বহু ক্ষেত্রেই সম্পর্কিত ছিলেন বটে, কিন্তু এই রাজনৈতিক উগ্রতা, এই উদ্দাম চাঞ্চল্য, এই প্রবল স্বাদেশিকতা—এদের সঙ্গে তাঁর চিত্তের যোগ খুব গভীর ছিল না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রেরণায়, আশৈশব শিক্ষায়, মনোগত প্রবণতায়—তাঁর প্রত্যয় নিবদ্ধ ছিল বিশ্ববোধে—ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকে। স্বদেশপ্রেমে তাঁর হৃদয় উচ্ছ্বসিত ছিল, কিন্তু যে স্বাদেশিকতা জাতিবৈর এবং ক্রোধে উতরোল—যা দেশকে বিশ্বযোগে উপলব্ধি না করে জ্যাত্যভিমানের দ্বীপখণ্ডে বিবিক্ত

করে, যা উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যে রক্তপাতের আশ্রয় দিতেও দ্বিধান্বিত হয় না—সেই 'Demon of Nationalism'-কে স্বীকৃতি দেওয়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল। তাঁর মনে ক্রমে ক্রমে এই প্রতীতি বদ্ধমূল হয়ে উঠছিল : "Nationalism ভৌগোলিক অপদেবতা—সে ভূত ছাড়াবার সময় এসেছে।"

শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবী জুড়ে এই স্বাদেশিকতার অপচ্ছায়া—ক্রোধ, বিদ্বেষ এবং আত্মাভিমানের ত্র্যহস্পর্শে সর্বত্রই এক পরম দুর্লগ্ন আসন্ন হচ্ছে। ফলে রবীন্দ্রনাথের মন স্বভাবতঃই কুণ্ঠিত এবং শঙ্কিত হয়ে উঠছিল। অন্যদিকে তাঁর ধ্যানে জাগছিল এক বিশ্বমানবের দ্যুতি—যে সমস্ত জগৎকে আহ্বান জানিয়ে বলতে পারে ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষায় :

"স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্বমিত্যথাতোঽহঙ্কারাদেশ এবাহমেবাধস্তাদহমুপরিষ্টাদহং পশ্চাদহং পুরস্তাদহং দক্ষিণতোঽহমুত্তরতোঽহমেবেদং সর্বমিতি—"

ভারতবর্ষের ইতিহাসও তো এই। ন্যাশনালিজ্‌ম্‌ নয়—ঐক্যের সাধনা। 'যত্র বিশ্বভবত্যেক নীড়ম্‌।' বলের অধিকার নয়, প্রেমের সাম্রাজ্য। তার প্রতীক সম্রাট অশোক। 'সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে'ই ভারতসত্তার অভিষেক।

সেই যুগের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শ কতখানি গ্রহণযোগ্য ছিল, বলা কঠিন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অসঙ্কোচেই ঘোষণা করলেন : "ভারতবর্ষে যে-কেহ আছে, যে-কেহ আসিয়াছে, সকলকে লইয়া আমরা সম্পূর্ণ হইব ; ভারতবর্ষে বিশ্বমানবের একটি প্রকাণ্ড সমস্যার মীমাংসা হইবে। সে সাফল্য এই যে, পৃথিবীতে মানুষ বর্ণে ভাষায় স্বভাবে আচরণে ধর্মে বিচিত্র—নরদেবতা এই বিচিত্রকে লইয়া বিরাট ; সেই বিচিত্রকে আমরা এই ভারতবর্ষের মন্দিরে একাঙ্গ করিয়া দেখিব।"

এই প্রবন্ধ যখন 'প্রবাসী' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়, তখন উক্ত পত্রেই ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথের মহত্তম ঔপন্যাসিক কীর্তি—"গোরা।" এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ সেই শাশ্বত ভারতীর আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাঁর জীবনবাণী ঘোষণা করেছেন। মাত্র উপন্যাসরূপে নয়, রবীন্দ্রনাথের ভারত-চিন্তার সব চাইতে মূল্যবান দলিল হিসাবেও 'গোরা'কে গ্রহণ করা উচিত।

বাংলা সাহিত্যে 'গোরা' এপিক উপন্যাসরূপে কীর্তিত। সন্দেহ নেই, এই গৌরব উপন্যাসটির প্রাপ্য। বক্তব্যের বিশালতায়, সর্বমানবিকতার আবেদনে, সত্যের সন্ধিৎসায় 'গোরা' মহাকাব্যই বটে। এই সর্বাত্মক আবেদনের জন্যেই 'গোরা'র অনুবাদ পৃথিবীর সব ভাষায় সমান সমাদৃত হয়েছে, আধুনিক কালেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফরাসী সমালোচক অধ্যাপক জঁা ফিওজা এই বইকে 'লে মিজেরাব্‌ল' এবং 'ওয়ার অ্যাণ্ড্‌ পীসে'র পাশে জায়গা দিয়েছেন: "Le livre est à placer à côté des Misérables et de La Guerre et la Paix"। 'গোরা' এক দিকে বিশ্বাত্মবোধের উপাসনা, অন্যদিকে ভারতসত্তারও পরিচয়। অধ্যাপক ফিওজা আরো বলেছেন: এই উপন্যাস থেকে জানা যায়, ভারতের মানুষ পৃথিবীর সর্বমানুষের সঙ্গে একই প্রাণ এবং মানস-সূত্রে আবদ্ধ—ইয়োরোপীয় মতে মাত্র সেই অপরিচিত বিচিত্র প্রাণীর সমষ্টি নয়—যারা গো-পালন করে এবং প্রবল আবেগে জগন্নাথের রথচক্রের তলায় প্রাণ দেয়: "adorant les vaches et ardent a se faire ecraser sous les chars de ses idols।"

'গোরা' আয়তনে সুবিশাল হলেও (যদিও কোনো কোনো আধুনিক বাংলা উপন্যাসের আয়তনের সঙ্গে তুলনা করলে বইটিকে প্রায় প্যাম্‌ফ্লেট্‌ বলা উচিত) তার গল্পাংশ খুব বিস্তৃত নয়। আড়াই বছর ধরে ধারাবাহিক ভাবে যে উপন্যাস লিখিত হয়েছে, তার ঘটনাকাল তিন মাসেরও বেশি কিনা সন্দেহ। এই সংক্ষিপ্ত

সময়ের মধ্যে বিনয়-ললিতার প্রসঙ্গ, গোরা-সুচরিতার সম্পর্কের বিকাশ, গোরার কারাবাস, পানুবাবু এবং ব্রাহ্মসমাজের আলোড়ন বিলোড়ন, হরিমোহিনীর আবির্ভাব এবং গল্পে অন্যান্য কিছু জটিলতার সূত্রপাত—এগুলি এতই দ্রুতবেগে ঘটেছে যে কিছু কিছু মানস-পরিণতি সম্পর্কে পাঠকের মনে অনিবার্য ভাবেই প্রশ্ন জাগে। বিনয়-ললিতার ব্যাপারটিকে গোরার এক মাস কারাবাসের মধ্যেই যে ভাবে পাকিয়ে তুলে লেখক বিবাহ পর্যন্ত এগিয়ে গেছেন—তাতে বইয়ের পত্র সংখ্যা বেড়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এ-কথা মনে না হয়েই যায় না যে এক বৎসরের ঘটনাকে যেন এক মাসের মধ্যে পুরে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু ঘটনার বিস্তারে, তর্ক ও তত্ত্বের আলোড়নে উপন্যাসের গতি এই সংশয়কে ভুলিয়ে রাখে।

এই উপন্যাসের বিবিধ তর্ক এবং বিশ্লেষণে, গোরা-বিনয়-পরেশবাবু-পানুবাবু—কাউকেই কোনো নির্দিষ্ট প্রতিপক্ষ বলে মনে করলে ভুল করা হবে; আসলে বিভিন্ন যুক্তি এবং চিন্তার প্রতীক হিসেবেই চরিত্রগুলি এসেছে, তারা নানা ভাবে রবীন্দ্রনাথের ভারত-ভাবনাকে নানা দিক থেকে পূর্ণতা দিয়েছে। টি-এস এলিয়ট এক জায়গায় বলেছিলেন, কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার আগে প্রতিপক্ষীয় সম্ভাব্য যুক্তিগুলিকে সর্বাগ্রে ভেবে নিতে হবে; অর্থাৎ যে 'নেতি নেতি' পন্থানুসরণে ভারতবর্ষ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় অগ্রসর হয়ে থাকে, কোনো সত্যকে লাভ করবার জন্য বিরোধিতার সেই কণ্টক-কুটিল মার্গ অতিক্রমণই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উপায়। 'গোরা'য় যেন নব্য ন্যায়ের আলোচনা সভা—পূর্বপক্ষ-উত্তরপক্ষের বাণ-বিনিময়ে শেষ পর্যন্ত একটি নির্দ্বন্দ্ব সামগ্রিক সত্যের ঘট-স্থাপনা।

গোরা হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী। কিন্তু কোন্ হিন্দুত্ব? অবশ্যই আচার-আচরণের নয়। যা ভারতের সত্যস্বরূপ, তারই সন্ধান তার জীবনব্রত। তবু যে সে হিন্দুধর্মের তুচ্ছাতিতুচ্ছ আচার-অনুশাসন-

গুলিকেও মেনে চলে, তার কারণ—যারা বাইরে থেকে দেশ ও ধর্মের সমালোচনা করে, স্বদেশী হয়েও যারা পরের মতো আমাদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে—তাদের সে জবাব দিতে চায়, সেই অপমানের প্রত্যুত্তরে আমাদের দীনতাগুলিকেও মহিমার রাজপতাকার মতো তুলে ধরে। সে বলেছে:

"এখন আমাদের একমাত্র কাজ এই যে, যা-কিছু স্বদেশের তারই প্রতি সংকোচহীন সংশয়হীন সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে দেশের অবিশ্বাসীদের মনে সেই শ্রদ্ধার সঞ্চার করে দেওয়া। দেশের সম্বন্ধে লজ্জা করে করে আমরা নিজের মনকে দাসত্বের বিষে দুর্বল করে ফেলেছি; আমাদের প্রত্যেকে নিজের দৃষ্টান্তে তার প্রতিকার করলে তারপর আমরা কাজ করবার ক্ষেত্রটি পাব।"

এই চিন্তায় ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু প্রয়োজন আছে। অন্যত্র গোরা সুচরিতাকে আরো স্পষ্ট কণ্ঠে জানিয়েছে:

"আপনার প্রতি আমার অনুরোধ, আপনি ভারতবর্ষের ভিতরে আসুন, এর সমস্ত ভালোমন্দের মাঝখানেই নেবে দাঁড়ান,—যদি বিকৃতি থাকে, তবে ভিতর থেকে সংশোধন করে তুলুন, কিন্তু একে দেখুন, বুঝুন, ভাবুন, এর দিকে মুখ ফেরান, এর সঙ্গে এক হোন—এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, বাইরে থেকে, খ্রীস্টানি সংস্কারে বাল্যকাল হতে অস্থিমজ্জায় দীক্ষিত হয়ে, একে আপনি বুঝতেই পারবেন না, একে কেবল আঘাতই করতে থাকবেন, এর কোনো কাজেই লাগবেন না।"

গোরার এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথেরও। শুধু আবশ্যক ছিল পরধর্ম এবং পরজাতি সম্পর্কে অন্ধ-বিদ্বেষ থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া—তার ব্যবচ্ছিন্ন ভারতবোধকে বিশ্বচেতনার সঙ্গে সংযুক্ত করা। তা ছাড়া এতদিন যে ভারতবর্ষকে সে মাত্র তত্ত্বরূপেই দেখেছিল, তার যথার্থ পরিচয়টির প্রত্যক্ষ করবার প্রয়োজনও তার ছিল। সেই প্রয়োজন সাধিত হল চর ঘোষপুরে, কারাবাসে, জন্মের

ইতিহাস জানার মধ্যে। আরো একটু বাকী ছিল। ভাবময় গোরার শুষ্কতার ভেতরে একটি প্রেমের গভীর কোমল প্রবাহও বইয়ে দেওয়ার দরকার ছিল—নইলে গোরা তত্ত্ব হয়েই থাকত, তার মানব-স্বরূপ প্রকটিত হত না। তাই তার মিলন ঘটল সুচরিতার সঙ্গে।

কবি ভিক্তর ইয়ুগো মালয় দেশ থেকে একটি বিচিত্র ছন্দের আমদানি করেছিলেন। এই ছন্দের নাম 'Pantoum'—'পাঁতুঁ'। এর বৈশিষ্ট্য হল—একটির মধ্যে দুটি কবিতা রচনা—প্রথম এবং তৃতীয় পংক্তিতে এক কবিতা, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ পংক্তিতে আর একটি। 'গোরা' উপন্যাস পড়তে গিয়েও এই জাতীয় অনুভূতি জাগে। এখানেও যেন এক উপন্যাসে দুটি কাহিনীকে এক সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। একটি ভাবধর্মী, একটি জীবনধর্মী।

এই জীবনধর্মী কাহিনীর নায়ক বিনয়, নায়িকা ললিতা।

গোরা এবং বিনয়ের চরিত্র রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' নাটকের ক্ষেমঙ্কর* এবং সুপ্রিয়কে স্মরণ করায়। এমন কি, দুজনের ধর্ম-সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনাতেও এই সাদৃশ্য লক্ষ্য করা সম্ভব। বিশাল পুরুষ ক্ষেমঙ্কর বিশ্বাসী, সুপ্রিয় তার্কিক এবং যুক্তিবাদী; ক্ষেমঙ্করের সঙ্গে সে যে সর্বদা একমত তা নয়, কিন্তু বন্ধুর বিপুল ব্যক্তিত্বে সে অভিভূত। বিনয়ের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটেছে। যদি 'গোরা' উপন্যাসে ললিতা না থাকত—যদি সুচরিতার আকর্ষণে মুগ্ধ বিনয় ('গোরা'র সূচনায় এই রকম একটা 'false start' দেওয়া হয়েছে) গোরাকে ছেড়ে সরে যেত, যদি গোরা আসত বিনয়কে দণ্ড দিতে—তা হলে 'গোরা'ও নবতর 'মালিনী' হয়ে উঠত। কিন্তু তা হয় নি। আর তা হয় নি বলেই 'মালিনী'র মতো তিনটি চরিত্র একটি অখণ্ড ঐক্যে গ্রথিত হতে পারেনি—বিনয়-প্রসঙ্গ এবং গোরা-কাহিনী প্রায় দুটি সমান্তরাল রেখায় বয়ে গেছে। শুধু এই দুই কাহিনীর মধ্যে আপাতঃ ভিলেন রূপে একটি চরিত্রই সক্রিয়—তিনি দুর্ভাগা পানুবাবু।

বিনয় এবং ললিতাকে নিয়ে প্রায় গোরানিরপেক্ষ ভাবেই একটি স্বতন্ত্র উপন্যাস গড়ে উঠেছে, এবং ঔপন্যাসিক বিচারে বিনয়ই এই কাহিনীর নায়ক। যদিও 'গোরা'র প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভূমিকা এতে আছে, কিন্তু তাকে এক পাশে সরিয়ে দিলেও জীবনধর্মী এই আখ্যানটুকু নিজের বৃত্তেই পূর্ণ হতে পারত। অপরপক্ষে গোরাও কৃষ্ণদয়ালের বাল্যবন্ধু পরেশবাবুর বাড়ীতে আনায়াসেই আসতে পারত, তারপর সুচরিতা-হরিমোহিনীর আশ্রয়ে দ্বিতীয় উপন্যাসটি গড়ে ওঠা অসম্ভব ছিল না—যা কাহিনী-হিসেবে স্পষ্টতঃই গৌণ।

তবু জীবনধর্মী অংশের নায়ক হয়েও সমগ্র উপন্যাসের নায়কত্ব বিনয়ের নয়। গোরা-সুচরিতার ভাবধর্মী অংশের ঔপন্যাসিক গুরুত্ব না থাকতে পারে, কিন্তু এই অংশেই পরেশবাবুর উদার প্রশান্ত ব্যক্তিত্ব ব্যাখ্যাত, এই অংশেই আনন্দময়ী সর্বসংস্কার-মুক্তরূপে মাতৃস্নেহের কোলটি মেলে দিয়েছেন। 'গোরা' মাত্র উপন্যাস নয়, তা রবীন্দ্রনাথের ভারত-চিন্তার ইতিবৃত্ত। পরেশবাবু ভারতের মুক্ত প্রশান্ত প্রজ্ঞাসত্তা, আনন্দময়ী মূর্তিমতী ভারত-জননী, গোরা সেই ভারতের হৃদয়-মন্থিত বিশ্বমানব—Universal Man। তাই এই উপন্যাসের নামান্তর কল্পনাও করা চলে না। বিনয় ললিতার কাহিনীতে গোরার নিজস্ব ভূমিকা যা-ই হোক—ললিতার শ্রদ্ধায়, বিনয়ের বিশ্বাসে, উপন্যাসের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে সে যেন বাতাসের মতো স্বাভাবিক এবং অনিবার্য ভাবে মিশে আছে।

এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ধর্মচিন্তা এবং স্বাদেশিকতা সম্পর্কে বহুবিধ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেয়েছেন। স্বভাবতঃই সেগুলি বিতর্ক ও বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু উপন্যাসের মহত্তম আদর্শের কথা স্মরণ করলে এই সব তর্ক-বিতর্কও গৌণ হয়ে যায়। যে-কথা আগেই বলেছি—'গোরা'য় রবীন্দ্রনাথ নিজেকেই বিভিন্ন সত্তায় বিভক্ত করে যে পূর্বপক্ষ উত্তরপক্ষ রচনা করেছেন—তার সামগ্রিক

সিদ্ধান্তই আমাদের গ্রহণীয়। হিন্দু নয়, ব্রাহ্ম নয়, ধর্ম নিয়ে বাদ-প্রতিবাদও নয়—মাত্র প্রসারিত হৃদয়ের ভালোবাসা দিয়ে কেমন করে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় আনন্দময়ী তারই প্রতীক। তাই উপন্যাসের শেষে :

'গোরা কহিল, "মা, তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসে ছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই, শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।" '

চরিত্র হিসাবে এই উপন্যাসে প্রায় সকলেই উজ্জ্বল। বিনয়ের মনোবিশ্লেষণে, তার দ্বিধায়, তার নিশ্চয়তায়, তার বন্ধুপ্রীতি এবং বিচ্ছেদের বেদনায়—লেখক নির্ভুলভাবে অগ্রসর হয়েছেন। গোরার রাহুগ্রাস থেকে বিনয়কে মুক্ত করার চেষ্টায় ললিতার আকুলতা—তার যুক্তিনির্ভর এবং সুনিশ্চিত ভালোবাসা—তার কঠিন চরিত্রশক্তি —'গোরা' উপন্যাসের অনন্য আকর্ষণ। পরেশবাবু পাণ্ডিত্য, বিশ্বাস এবং সততার একটি প্রশান্তিদীপ্ত বিগ্রহ। গোরা মূলতঃ ভাবধর্মী হয়েও প্রয়োজনীয় মানবিক আবেগে প্রবল ও উজ্জ্বল। আনন্দময়ী মাত্র চরিত্রই নন—প্রত্যক্ষ বাস্তব হয়েও তিনি একটি সুবিশাল ব্যঞ্জনা, মূর্তিমতী ভারতসত্তা—তাঁকেই যেন মর্মকোষে স্থাপন করে উপন্যাসটি বিবর্তিত হয়েছে।

পানুবাবু যেন একটু ক্যারিকেচারধর্মী—লেখকের আরো একটু করুণা তাঁর ওপর বর্ষিত হতে পারত। সারাজীবন অনাচার করে বার্ধক্যে সন্ন্যাসী কৃষ্ণদয়াল একেবারে নির্ভুল একটি টাইপ। মহিম অনবদ্য—পরেশবাবুর পরিবারের অন্যান্যেরাও যথাযথ। হরিমোহিনী চরিত্র অসামান্য বাস্তব—এই দুঃস্থ বিধবা কি ভাবে সুচরিতা সম্পর্কে একটা 'Possessive Instinct'-এর তাড়ায় দিনের পর দিন অন্ধ হয়ে উঠছেন, তার অতি নিপুণ ক্রমবিকাশ উপন্যাসে আছে। কৈলাস প্রায় একটি ফোটোগ্রাফ, সুচরিতার সঙ্গে বিবাহ

দূরে থাক—প্রস্তাবমাত্রেই ঘরে জল জমা নিয়ে বৈষয়িক লোকটি চিন্তিত হয়ে উঠেছে।

আর সুচরিতা রবীন্দ্রনাথের সেই মনোনায়িকা—যে শান্ত, আত্মমগ্ন, মাধুর্যের নিভৃত পাত্র বয়ে প্রায় নিঃশব্দে যে অপেক্ষা করে আছে—অথচ 'বুদ্ধি তার ললাটিকা, চোখের তারায় বুদ্ধি জ্বলে দীপশিখা।' সুচরিতার মধ্যেই 'শেষের কবিতা'র লাবণ্য নিহিত, সে যোগাযোগের কুমুদিনীর আরেক রূপ। "তাহার মুখে বুদ্ধির একটা উজ্জ্বলতা……কিন্তু নম্রতা ও লজ্জার দ্বারা তাহা কী কোমল হইয়া দেখা দিয়াছে। মুখের ডৌলটা কী সুকুমার……অনুচ্চারিত কথার মাধুর্য সেই দুটি ঠোঁটের মাঝখানে যেন একটি কোমল কুঁড়ির মতো রহিয়াছে।"

ভাষার দিক থেকে 'গোরা' অমিতরূপে ঐশ্বর্যবান। আর তা যদি না হত, তা হলে এই মহান উপন্যাসের বিশাল-বাণীকে সে বহন করত কী করে? মাত্র একটি সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি আহরণ করতে পারি। স্টিমারে বিনয়ের সঙ্গে কলকাতার ফেরবার সময় ললিতা যখন ঘুমন্ত, তখন বিনয়ের উপলব্ধি এই রকম:

"বিশ্রব্ধ বিশ্রামের এই ছবিখানি বিনয়ের কল্পনাকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। শুক্তির মধ্যে মুক্তাটুকু যেমন, গ্রহতারামণ্ডিত নিঃশব্দতিমির বেষ্টিত এই আকাশ মণ্ডলের মাঝখানটিতে ললিতার এই নিদ্রাটুকু, এই সুডোল সুন্দর সম্পূর্ণ বিশ্রামটুকু জগতে তেমনি একটিমাত্র ঐশ্বর্য বলিয়া আজ বিনয়ের কাছে প্রতিভাত হইল। 'আমি জাগিয়া আছি, আমি জাগিয়া আছি'—এই বাক্য বিনয়ের বিস্ফারিত বক্ষঃকুহর হইতে অভয়শঙ্খধ্বনির মতো উঠিয়া মহাকাশের অনিমেষ জাগ্রত পুরুষের নিঃশব্দবাণীর সহিত মিলিত হইল।"

'গোরা', কাহিনী-হিসাবে এপিক-সুলভ বিস্তৃতি লাভ করেনি; 'লে মিজেরাব্‌লে'র বিপুল ঘটনা-প্রবাহ এতে নেই, 'ওয়ার অ্যাণ্ড্ পীসে'র মতো নাপোলেয়ঁর আক্রমণের পটভূমিতে সমগ্র রুশিয়ার

বিশাল রূপ এতে ফুটে ওঠেনি ; কিন্তু যে মানব-ভাবের চিরন্তনত্বে এবং কাব্যোৎকর্ষে 'মেঘদূতে'র মতো খণ্ড কাব্যকেও পরম ছিদ্রান্বেষী সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা মহাকাব্যের গৌরব দিয়েছেন, সেই একই কারণে—আনুমানিক তিন মাসের ঘটনাশ্রয়ী এবং প্রধানভাবে দুটি-পরিবার নির্ভর এই উপন্যাস এপিক মহিমায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

॥ ৪ ॥

১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'সবুজপত্রে' যখন 'জ্যাঠামশায়' নামে রচনাটি স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেন, তখন এটি যে একটি উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়—হয়তো লেখকের কল্পনাতেও তা ছিল না। অতঃপর আরো তিনটি অধ্যায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হল—'জ্যাঠামশায়ে'র সঙ্গে 'শচীশ', 'দামিনী' এবং 'শ্রীবিলাস' মিলে একটি অখণ্ড শিল্প মূর্তিতে দেখা দিল। লেখক এর নামকরণ করলেন 'চতুরঙ্গ।'

'চতুরঙ্গ' বাংলা সাহিত্যে বিতর্ক-কণ্টকিত। একে কি উপন্যাস হিসেবে সম্পূর্ণ বলা যায় ? এর মধ্যে কি একটা "rugged"-ভাব বিদ্যমান নেই ? এর চরিত্রগুলির আচরণ কি সর্বত্র সুস্পষ্ট ? এই গল্পে কি এমন অনেকখানি ফাঁক নেই—যা কল্পনা দিয়ে, পরিশ্রম দিয়ে পাঠককে পূর্ণ করে নিতে হয় ? এর মধ্যে কি ছায়া এবং আলোকের লীলা এত বেশি বিদ্যমান নয়—যার ফলে পাঠক বিভ্রান্ত হয়ে মূল বক্তব্য থেকে দূরে সরে যেতে পারে ?

এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে একটি প্রশ্নের মীমাংসা করে নেওয়া উচিত। উপন্যাস কী ? নিঃসন্দেহেই একটি দীর্ঘ বিস্তৃত কাহিনী—যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি, কোনো পরিবার বা কোনো সমাজের একটি বিশেষ ক্রমবিকাশ ও পরিণতি প্রদর্শিত হয়ে থাকে। ঘটনা, চরিত্র

এবং বিশ্লেষণ—এই তিনটি মৌল উপকরণের মিলনে অথবা এদের যে-কোনো একটির ওপর নির্ভর করেই উপন্যাসের একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে হয়। এই বৃত্তটি কাহিনীমূলক হতে পারে—সেখানে ঘটনাগত একটি সমাপ্তি আসে ; এই বৃত্তটি ভাবমূলক হতে পারে—তাতে কাহিনীগত সূত্রগুলিকে এক সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হোক আর নাই হোক—একটি আইডিয়ার পূর্ণতা অর্জিত হয়ে থাকে।

এই ব্যাপক সংজ্ঞার মধ্যে দেখলে উপন্যাসের সম্ভাবনা অনন্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক'-ও উপন্যাস। স্কটের 'ওয়েভারলি' উপন্যাসগুলি যেমন স্বীকার্য, তেমনি জঁা পল সাত্রের 'লে শেমঁ্যা দ্য লা লিব্যার্তে' ও গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ উপন্যাসের অন্তরদেবতা একব্রতী নন, তিনি বহু-বল্লভ।

১৯১৪ সালে মার্সেল প্রুস্তের 'আ লা রেশ্যার্শ দ্যু তাঁ প্যার্দ্যু'-র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়ে বিশ্ব-সাহিত্যে চাঞ্চল্য আনে। এই বিস্তৃত দীর্ঘায়ত উপন্যাস—বিশ্লেষণে অতি-মন্থর যার গতি (একটি মেয়ের হাসি বর্ণনা করবার জন্যে যেখানে লেখককে পুরো ছ'টি পৃষ্ঠা খরচ করতে হয়েছে)—এই উপন্যাসকে গ্রহণ করা যাবে কী করে? মানুষ নিজে কোনো ঘটনাই ঘটিয়ে তুলছেনা—একটা পূর্ব-নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী সে নিয়তি-নিয়ন্ত্রিতের মতো একটির পর একটি ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করছে ; কোনো কালই চিরগত নয়, একটি অচল বেষ্টনীর মধ্যে শৈশব-যৌবনের সমস্ত অপগত অনুভূতিকে পুনরাস্বাদন করা সম্ভব—উপন্যাসের এমন যে একটি বিষয়বস্তু হতে পারে, এ-কথাই বা কে ভেবেছিল?

১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের কামান গর্জে উঠল বটে, কিন্তু বিশ্ব উপন্যাসের পক্ষেও এই বৎসর এক ক্রান্তিকাল। এই বৎসরই জেম্‌স্ জয়েস তাঁর 'ইউলিসিস' লেখা শুরু করেন, সারা করেন ১৯২২ সালে। 'ইউলিসিস' কোন্ জাতের উপন্যাস? হোমারীয়

মহাকাব্যের নায়কের মতো এক বর্ষণ-বিষণ্ণ দিনে ডাব্লিনের জনৈক শ্রীযুক্ত ব্লুম যে অচেতন-অবচেতন মনের দিক্‌চিহ্নহীন সমুদ্রে অভিযাত্রী—বিচিত্র বর্ণনায় এবং ভাষায় চার্লস্ ডিকেন্সের উপন্যাস-মুগ্ধ ইংরেজ পাঠককে তা কোন্ রসের সন্ধান দিল ?

১৯১৫ সালে ডরোথি রিচার্ডসনের 'পয়েন্টেড্ রুফ্স্' প্রকাশিত হল বটে, কিন্তু এই উপন্যাসও ১৯১৪ সালেই বিকশিত। জয়েস যদি সাহিত্যে 'আত্মোক্তি-প্রবাহ' (monologue) ব্যবহার করে থাকেন, তা হলে আধুনিক কালের 'চৈতন্য-প্রবাহ' (Stream of Consciousness) ডরোথি রিচার্ডসনেরই অবদান। একটিমাত্র চরিত্র—মিরিয়ামের চিন্তাপ্রবাহ বিশ্লেষণেই ঔপন্যাসিকার কর্তব্য শেষ—এবং অসামান্য সাফল্য অর্জিত।

পরম বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় ১৯১৪ সালেই 'চতুরঙ্গ' সূচিত এবং ১৯১৫ সালের প্রথম দিকে সমাপ্ত। রবীন্দ্রনাথ তখন প্রুস্ত্ নিশ্চয়ই হাতে পান নি, ইউলিসিস্ তো প্রকাশিত হয়েছে অনেক পরে, 'পয়েন্টেড্ রুফ্স' 'চতুরঙ্গের' সম্পূর্ণ সমকালীন। মনে হয় ১৯১৪ সাল যেন বিশ্বমানবের অন্তরে বাইরে এক বিপুল বিপ্লব নিয়ে দেখা দিয়েছিল—তা কেবল যুদ্ধ-সীমান্তেই নয়, সাহিত্য-সীমান্তেও বটে। সেই বিপ্লবের দুন্দুভি ইয়োরোপে বসে শুনেছিলেন প্রুস্ত—জয়েস—ডরোথি-এম-আর, বাংলা দেশে বসে শুনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই 'চতুরঙ্গে' রবীন্দ্রনাথ নতুনকালের উপন্যাসই লিখেছেন—'চোখের বালি' কিংবা 'গোরা'র অনুবর্তন করেন নি।

ঘটনা-নিয়ন্ত্রণে এবং চারিত্রিক স্পষ্টতার দিক থেকে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস রূপে উত্তীর্ণ হয়েছে কিনা—এ জাতীয় আলোচনা আমার কাছে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ ভার্জিনিয়া উল্‌ফের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'মিসেস্ ড্যালোয়ে' বইটিকে গ্রহণ করা যায়। এই ভদ্রমহিলা একটি পার্টি দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন—সেই উপলক্ষ্যে একটি দিনের কাহিনী উপন্যাসটিতে বিবৃত। মননপ্রবাহ

এবং সাংকেতিকতার ওপর নির্ভরশীল এই উপন্যাস কিউবিস্ট্ ছবির মতো রহস্যময় আলোছায়ায় অস্পষ্ট—অথচ সব মিলে একটি সম্পূর্ণ উপলব্ধির সঞ্চার। 'মিসেস্ ড্যালোয়ে' পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস কিনা—এ নিয়ে কোনো সাহিত্য-পাঠক আজ পর্যন্ত তর্ক তুলেছেন বলে আমার জানা নেই।

হয়তো 'চতুরঙ্গে'র ঘটনা-শৃঙ্খলে মধ্যে মধ্যে ফাঁক আছে; হতে পারে, এর চারটি অঙ্গ সর্বক্ষেত্রেই অনিবার্যভাবে সংযুক্ত নয়; চরিত্রগুলির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে হয়তো গ্রন্থকার অতি-স্পষ্টতার সুযোগ গ্রহণ করেন নি; এর পরিণতির ধারাও হয়তো কুহেলি বিজড়িত। তবু 'চতুরঙ্গ' আধুনিক চিত্তসম্মত নবতম রীতি অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস এবং সার্থক উপন্যাস। কারণ, শিথিল-গ্রথিত মনে হলেও উপন্যাসের একটি নির্দিষ্ট ক্রমবিকাশ আছে, একটি সুনিশ্চিত ভাববৃত্ত এতে সম্পূর্ণ হয়েছে।

'জ্যাঠামশায়', 'শচীশ', 'দামিনী' এবং 'শ্রীবিলাস'—এই চারটি চরিত্রই এই উপন্যাসের চতুরঙ্গ। 'জ্যাঠামশায়কে আপাতঃ বিচারে একটু বিচ্ছিন্ন মনে হয়, অবশিষ্ট অঙ্গত্রয়ী মোটামুটি অনুক্রমিক এবং পরস্পরাশ্রিত।

'চতুরঙ্গ' শচীশের সাধনা এবং সিদ্ধির ইতিবৃত্ত। কঁত্ এবং বেন্থামের আদর্শে দীক্ষিত হিউম্যানিস্ট্ এবং নাস্তিক জ্যাঠামশায় শচীশকে জ্ঞান ও কর্মযোগের দীক্ষা দিয়েছিলেন। প্লেগের সেবা করতে গিয়ে জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুবরণ, ননিবালার সকরুণ অপচয়—শচীশের মনকে সাময়িকভাবে শূন্যতায় পূর্ণ করে তুলল—শুষ্ক জ্ঞান-সাধনায় সে আর তৃপ্তি পেল না। অতএব তার মন ছুটল সম্পূর্ণ বিপরীত মুখে—লীলানন্দ স্বামীর রসের পাথারে সে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জানেন, নিছক জ্ঞানচর্চাও যেমন পূর্ণ পরিতৃপ্তি আনেনা (জগমোহনও ননিবালার ক্ষেত্রে হৃদয়ধর্মের উতরোল আর্তি অনুভব করেছিলেন), তেমনি রস-সম্ভোগের

'গদ্‌গদ বাষ্পাবিলতা'ও মানুষকে মাত্র বিহ্বলই করে—আত্মস্থ করে না।

সবিনয়ে স্মরণীয়, 'গোরা'য় যেমন নির্দিষ্ট কোনো ধর্মমতের পোষকতা করা রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত ছিল না, সেইরকম 'চতুরঙ্গে'ও কোনো ধর্মসাধন-পদ্ধতিকে তিনি কটাক্ষ করেননি; শচীশের সিদ্ধির ধারা নির্ণয়ই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। অতএব এর পর এল দামিনীরূপিণী প্রকৃতির পালা—এল কামনার আকর্ষণ। 'পা ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া লাথি মারিয়া' 'সেই আদিম জন্তু'টাকে শচীশ দূর করে দিতে চাইল বটে, কিন্তু মনের ভেতরে তার শাশ্বত অবাধ্য প্রভাবকে কিছুতেই অতিক্রম করা গেল না। আশ্চর্য সাংকেতিকতার সাহায্যে শচীশের সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী এই উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এক অপরূপ সমাধান এসে দেখা দিয়েছে। রূপের মধ্য দিয়ে দৃষ্টিকে অভিষিক্ত করিয়েই অরূপকে প্রত্যক্ষ করতে হয়, সীমাই সঙ্গিনী হয়ে অসীমের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়। দামিনীর প্রেম এবং পূজায় সেই রূপ এবং সীমার দীক্ষা পেয়েছে শচীশ, সমস্ত সংশয়ের অবসান ঘটেছে। সে জেনেছে যিনি বিশ্বেশ্বর, তিনি রূপের মধ্য দিয়ে ভক্তের কাছে আসেন, আর অরূপের পথ ধরে ভক্তকে তাঁর কাজে ছুটে যেতে হয়—দুটি ধারা যদি বিপরীত দিক থেকে বয়ে না আসে, তা হলে মিলন ঘটবে কী উপায়ে। দামিনীর প্রেমে তাঁর রূপের বার্তা—আবার অরূপের পথ বেয়ে এগিয়ে চলাই শচীশের মিলন-যাত্রা। সুতরাং নিজের মধ্যে রূপকে দহন করে রূপাতীতের সাধনাই তো শচীশের শেষ কথা। সে-ই তার পূর্ণতার পথ।

"ওগো আমার প্রলয়, আপনাকে আমি তোমার মধ্যে চুরমার করিতে থাকিব—চিরকাল ধরিয়া। বন্ধন আমার নয় বলিয়াই কোনো বন্ধনকে ধরিয়া রাখিতে পারি না। আর বন্ধন তোমার বলিয়াই অনন্তকালে তুমি সৃষ্টির বাঁধন ছাড়াইতে পারিলে না।

থাকো, আমার রূপ লইয়া তুমি থাকো, আমি তোমার অরূপের মধ্যে ডুব মারিলাম।”

এই বক্তব্যকেই ‘রাজা’ নাটকে আর এক ভাবে বলা হয়েছে। অরূপই রূপের বাঁধনে বেঁধেছিলেন সুদর্শনাকে, সেই জাল ছিন্ন করে তবেই অরূপের সঙ্গে সুদর্শনার মিলন ঘটল। পূজার উপচারের মধ্য দিয়েই অভীষ্ট দেবতাকে আহ্বান করতে হয়, অথচ সেই উপচারকে অতিক্রম করতে না পারলে দেবতাকে লাভ করা যায় না। দামিনীকে স্বীকার করে নিয়ে, তাকে অতিক্রান্ত হয়ে, তবেই শচীশ সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত হতে পারল।

এই ভাবধর্মী উপন্যাস স্বভাবতঃই প্রচলিত উপন্যাসধারার নির্ধারিত খাতে বয়ে যায়নি। অভিনব, এবং কিছু পরিমাণে পরীক্ষা-মূলক বলেই ‘চতুরঙ্গ’ তার একটি নিজস্ব শিল্পাঙ্গিক নির্মাণ করে নিয়েছে। প্রথম পদক্ষেপরূপে অল্প-বিস্তর অপূর্ণতা তাতে সম্ভব, সংকেত এবং ব্যঞ্জনার ওপর নির্ভরশীল বলে হয়তো পাঠককে কিছু কিছু অংশ বুদ্ধি এবং কল্পনার সাহায্যে সুস্পষ্ট করে নিতে হয়। কিন্তু ভার্জিনিয়া উল্‌ফের ‘দি ওয়েভ্‌স্’-কে বোঝবার জন্যে যাকে মগ্ন-সমুদ্রে তলাতে হয়—শব্দবিন্যাসে শুনতে হয় অর্থগূঢ় তরঙ্গ-ধ্বনি—তার পক্ষেও এই উপন্যাস এতই কি জটিল ?

দামিনী এই উপন্যাসের বিদ্যুৎ-শিখা—মানবিক কামনার বহ্নি-বলয় সে বিস্তার করেছিল শচীশের জন্য। শচীশের শীতল-কঠিন পদাঘাতে সেই অগ্নি সংহত হয়েছে—কাহিনীর শেষে বিদ্যুৎ পরিণতি পেয়েছে জলগর্ভ মেঘরূপে। জীবন ধর্মের অনিবার্যতায় অগ্নিদহন থেকে শচীশও সম্পূর্ণ পরিত্রাণ পায়নি—কিন্তু আনাতোল ফ্রাঁসের বিখ্যাত উপন্যাসের সন্ন্যাসীর মতো সেই দহনে নিঃশেষ হয়ে ‘ত্যা’-র মৃত্যুশয্যায় সে ‘ভ্যাম্পায়ার’ হয়েও ফিরে আসেনি , অন্তর্দাহে তার ধ্যানের সত্য উজ্জ্বল হয়েছে, দামিনীর হৃদয়ে পূজার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে সে।

শ্রীবিলাস একদিক থেকে এই কাহিনীর সূত্রধার। কিন্তু "প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারী" এই চরিত্রটি মাত্র 'চতুরঙ্গ'-কে একটি অখণ্ডতায় সাজিয়ে দিয়ে শচীশের ছায়া-সহচর হয়েই, নিজের কর্তব্য শেষ করেনি। শচীশের মনে পুরুষসুলভ ঈর্ষ্যার সৃষ্টি করবার জন্য দামিনী তাকে উপকরণরূপে ব্যবহার করেছে—কিন্তু শ্রীবিলাস অন্ধ ছিল না, প্রতি মুহূর্তে সে অনুভব করেছে—এক মর্মভেদী কৌতুক-নাট্যে সে যেন এক সকরুণ বিদূষক। দামিনীর প্রতি তার করুণ গভীর ভালোবাসাকে সে কোনোদিন গোপন করেনি—বেদনার্ত হৃদয়ে অপেক্ষা করেছে, তারপর একদিন তার ভালোবাসা পুরস্কৃত হয়েছে—স্ত্রীরূপে সে লাভ করেছে দামিনীকে। সে যেন 'শেষের কবিতা'র শোভনলাল—'অসীম ক্ষমায়, ভালোমন্দ সুখদুঃখ মিলায়ে সকলি'—দামিনীকে নারীরূপেই গ্রহণ করেছে, কোনো আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে তাকে মণ্ডিত করেনি।

দামিনী এবং শ্রীবিলাসের বিবাহ প্রসঙ্গ কি বিভ্রান্তিকর? না—সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এখানেও যেন 'শেষের কবিতা'ই আর এক রূপে দেখা দিয়েছে। যে গুরু, যে ধ্যানের দেবতা, তাকে অন্তরে চির-প্রতিষ্ঠা করে প্রতিদিন নীরবে অর্ঘ্য নিবেদন করা যায়; কিন্তু দামিনী নারী—শুধুমাত্র পূজারিণীই নয়। ননিবালার মতো মৃত্যুর কাছে ঋণ শোধ করে দেওয়াকেই সে শেষ কথা বলে বিশ্বাস করে না। "সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবনরসের রসিক। বসন্তের পুষ্পবনের মতো লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে সে কেবলই ভরপুর হইয়া উঠিতেছে; সে কিছুই ফেলিতে চায় না, সে সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ।"

'সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান' দেওয়া যায় না বলেই, তার প্রতিষ্ঠা অন্তরের পূজামন্দিরে। কিন্তু জীবনরসের সাধনায় শ্রীবিলাসের মতো এমন সহজ স্বাভাবিক পৃথিবীর মানুষ আর কোথায় পাওয়া যেত? যেখানে ধ্যান, সেখানে বিগ্রহমূর্তি মহিমাময় ঐশ্বর্যে

প্রকটিত; কিন্তু যেখানে জীবনের ক্ষুধা—সেখানে ধাতু-বিগ্রহের স্পর্শ কেবল বুকের মধ্যে ক্ষতচিহ্নই রেখে যায়, তার অতিরিক্ত সে কিছুই দেয় না।

তাই, পরিশেষে আকাশের বিদ্যুৎ কী কারণে গৃহদীপ হয়ে শ্রীবিলাসের জীবনকে দীপিত করে তুলল, তার উত্তর শ্রীবিলাসের ভাবনার মধ্যেই আছে: "মেয়েরা স্বয়ম্বরা হইবার বেলায় তাদেরই বর্জন করে যারা আমাদের মতো মাঝারি মানুষ, যারা স্থূলে সূক্ষ্মে মিশাইয়া তৈরী—নারীকে যারা নারী বলিয়াই জানে, অর্থাৎ এটুকু জানে, যে, তারা কাদায় তৈরী খেলনা পুতুল নয় আর সুরে তৈরি বীণার ঝংকারমাত্রও নহে।......এইজন্য তারা যদিবা আমাদের পছন্দ করে, ভালোবাসিতে পারে না। আমরাই তাদের সত্যকার আশ্রয়, আমাদেরই নিষ্ঠার উপর তারা নির্ভর করিতে পারে, আমাদের আত্মোৎসর্গ এতই সহজ যে তার কোনো দাম আছে সে কথা তারা ভুলিয়াই যায়।" কিন্তু ভুল অবশেষে দামিনীর ভেঙেছে, শ্রীবিলাসের নিঃশব্দ প্রশান্ত প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায় নি।

'আকাশের চাঁদে'র উপাসনায় নিজেকে শূন্য করে দিতে গিয়ে 'জীবনরসের রসিক' দামিনী শেষ পর্যন্ত আত্মস্থ হয়েছে। ফিরে এসেছে পৃথিবীর প্রেমে, ধূলো-মাটির ঘরে, শ্রীবিলাসের উদার নির্ভরতাময় বাহুর আশ্রয়ে। কিন্তু একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল, মাটির ভালোবাসাটুকু সে আকণ্ঠ পান করে যেতে পারল না, তবু: "যেদিন মাঘের পূর্ণিমা ফাল্গুনে পড়িল, জোয়ারের ভরা অশ্রুর বেদনায় সমস্ত সমুদ্র ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, সেদিন দামিনী আমার পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।"

প্রশ্ন জাগে, 'চতুরঙ্গ' কি শচীশের পূর্ণতার কাহিনী না জীবনের কাছে দামিনীর প্রত্যাবর্তনের এক সকরুণ ইতিহাস? হয়তো এর উত্তর নির্দ্বিধায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও দিতে পারতেন না।

উপন্যাসের ধারা

[উত্তর পর্যায়]

॥ এক ॥

১৩২১ সালের বৈশাখ মাসে প্রমথ চৌধুরী প্রকাশ করেছিলেন 'সবুজপত্র'। এই পত্রিকার আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে একটি স্মরণীয় ঘটনা। সজীব এবং সতেজ তারুণ্য 'সবুজপত্রে'র নিয়ত অনুপ্রেরণা। বুদ্ধি এর নির্ণায়ক, পাশ্চাত্ত্য চিন্তাশীলতার সঙ্গে আধুনিক মননের যোগ-সাধন এর লক্ষ্য, এবং ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পুনর্বিচার এর অন্যতম দায়িত্ব। যা "নবীন পত্রের রং", যার মধ্যে "রসের ও প্রাণের যুগপৎ লক্ষণ ও অভিব্যক্তি," তারই ধ্বজা উড়িয়ে— এইভাবেই আসরে এসেছিল 'সবুজপত্র'।

কিন্তু আরো কথা আছে। তা প্রমথ চৌধুরীর রচনা থেকেই উদ্ধৃত করা যাক: "যে জী·নীশক্তির আবির্ভাবের কথা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, সে শক্তি আমাদের নিজেদের ভিতর থেকে উদ্‌বুদ্ধ হয়নি; তা হয় দূর দেশ হতে নয় দূর কাল হতে, অর্থাৎ বাইরে থেকে এসেছে। সে শক্তি এখনো আমাদের সমাজে ও মনে বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। সে শক্তিকে নিজের আয়ত্তাধীন করতে না পারলে তার সাহায্যে আমরা সাহিত্যে ফুল কিংবা জীবনে ফল পাব না। এই নতুন প্রাণকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে হলে প্রথমে লোকের মনে তা প্রতিবিম্বিত করা দরকার। অথচ, ইয়োরোপের প্রবল ঝাঁকুনিতে আমাদের অধিকাংশ লোকের মন ঘুলিয়ে গেছে। সেই মনকে স্বচ্ছ করতে না পারলে তাতে কিছুই প্রতিবিম্বিত হবে না। বর্তমানের চঞ্চল এবং বিক্ষিপ্ত মনোভাব-সকলকে যদি প্রথমে মনোদর্পণে সংক্ষিপ্ত ও সংহত করে প্রতিবিম্বিত করে নিতে পারি,

তবেই তা পরে সাহিত্য-দর্পণে প্রতিফলিত হবে।" (সবুজপত্রের মুখপত্র)

—'সবুজপত্রে'র এই উদ্‌ঘোষণ থেকে কয়েকটি সংকেতসূত্র পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমতঃ, দেশের হৃদয়ের মধ্যে একটা উগ্র চঞ্চলতা দেখা দিয়েছে, এমন একটা শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে—যার উৎস দ্বিমুখী ; একটি পাশ্চাত্ত্য আধুনিক চিন্তাধারা, আর একটি আমাদের স্বদেশীয় প্রাচীন উত্তরাধিকারবোধ। দ্বিতীয়তঃ, লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই শক্তি এখনো আমাদের মধ্যে সংহতি লাভ করেনি—জীবনে বা সাহিত্যে তা কোনো পূর্ণ ফলবন্ত রূপ নিয়ে প্রকটিত হচ্ছে না। তৃতীয়তঃ, এই বিক্ষিপ্ত-প্রবল প্রাণের জোয়ারকে সংহত, সংযত এবং নিয়ন্ত্রিত করে একটি নতুন জীবন তথা সাহিত্য-আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার।

'সবুজপত্রে'র নবত্ব এবং বিশেষত্ব এর থেকেই সুস্পষ্ট। এককথায় 'সবুজপত্র' এক ভাবদ্বন্দ্ব এবং যুগসন্ধির পত্রিকা, প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য মননের সমীকরণের প্রয়াস—দেশের অন্তরের প্রচণ্ড সমকালীন আবেগকে একটা সুনির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করবার চেষ্টা, বুদ্ধির আলোকে আত্মসমীক্ষা এবং আগামী যুগের পথিনির্দেশের পরিকল্পনা।

এই নতুন জীবনীশক্তির স্বরূপ কী ? সমাজচিন্তা এবং ব্যক্তিত্ব-বোধ প্রবলভাবে আন্দোলিত হয়েছে ইব্‌সেনের এবং বার্ণাড শ'র নাটকে, গল্‌স্‌ওয়ার্দির 'ফরসাইট্‌ সাগা'র একটি খণ্ড বাঙালী পাঠকের হাতে এসেছে, আঁরি বারব্যুসের 'L'enfer'-এর সঙ্গে অন্তত বুদ্ধিজীবীদের পরিচয় ঘটেছে, তলস্তয় সামনেই রয়েছেন। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান বিয়র্নসন পূর্বেই এসেছিলেন—তাঁর উত্তরসূরী হামসুন বাঙালীর অন্তরে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছেন। এই সমস্ত সাহিত্যের পঠন-পাঠনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জেগেছে, আমাদের এতদিনের প্রচলিত মূল্যবোধ আজ কতখানি স্বীকার্য, নারীর

অধিকারের সীমা কতখানি প্রসারিত এবং এইসব নতুন বৈপ্লবিক ভাবনাকে আমরা কী পরিমাণেই বা আত্মস্থ করে নিতে পারি।

অন্যদিকে দেশে প্রবল রাজনীতিক আলোড়ন। বিপ্লববাদী অগ্নিতরঙ্গ বইছে, সেই সঙ্গে এসেছে অসহযোগ ও বিদেশী বর্জনের জোয়ার। দেশপ্রেমের ঝোড়ো হাওয়া ছুটেছে দিকে দিকে। কংগ্রেসপন্থা এবং রুদ্রপন্থা একসঙ্গে তরুণ মনে এক অসহ উন্মাদনার আবর্ত ফেনিয়ে তুলেছে।

অতএব, অবিলম্বেই আত্মস্থ হওয়া প্রয়োজন—একটা হিসেব-নিকেশ দরকার। এই দারুণ লগ্নে একবার নিজেদের ভালো করে যাচাই করতে হবে, বুঝে নিতে হবে এই মুহূর্তে আমরা কতটা গ্রহণ করব, কতটাই বা বর্জন করব; যে আগুন জ্বালাতে চলেছি, তাতে কতখানি আলো জ্বলবে, গৃহদাহের আশঙ্কাই বা কী পরিমাণে; আত্মবিকাশের প্রচণ্ডতায় আমরা এমন কোনো ভ্রান্তি-চক্রে পড়ব কিনা—যা শেষ পর্যন্ত আত্মবিনাশে সমাপ্তিলাভ করে।

'সবুজপত্রে'র এই আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ সর্বাধিক সাড়া দিয়েছিলেন এবং বলা বাহুল্য, তাঁর পক্ষে সেইটিই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। চতুর্দিকে এই তরঙ্গ-বিক্ষোভে তাঁর চিত্তেও কোনো প্রশান্তি ছিল না। তাই এই আত্মসমীক্ষা এবং সত্যসন্ধানের প্রয়োজনে 'সবুজ-পত্রে' যে উপন্যাসটি তিনি লিখতে সুরু করলেন, তার নাম 'ঘরে বাইরে।' এইখান থেকেই আমি তাঁর উপন্যাসের 'উত্তরপর্ব' আলোচনা করব।

বহিরঙ্গগত একটি গৌণ কারণও আছে। 'ঘরে বাইরে'ই রবীন্দ্রনাথের চল্‌তি-ভাষায় লেখা সর্বপ্রথম উপন্যাস।

॥ দুই ॥

'ঘরে বাইরে' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশে সাড়া তুলেছিল। একদল পাঠক যেমন এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের এক আশ্চর্য আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করলেন, আর একদল তেমনি 'ঘরে বাইরে' থেকে আবিষ্কার করলেন দুর্নীতি এবং দেশদ্রোহিতা। যাঁরা 'ঘরে বাইরে' সম্পর্কে বিক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, তাঁদের অন্ততঃ একজনের পত্রোত্তরে রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্রে'র পাতাতেই তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে কিছু ভাষ্য রচনা করেছেন। কয়েক বছর পরে 'প্রবাসী'তেও তাঁকে আর একবার নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করে নিতে হয়েছে।

এইসব সুপরিচিত আলোচনা থেকে দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন যে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস, এবং উপন্যাসরূপেই তার মূল্য রসিকজনের বিচার্য; সেই সঙ্গে এ-কথাও তিনি জানিয়েছেন, কোনো দেশে কোনো কালেই লেখক স্বয়ম্ভূরূপে আবির্ভূত হন না; ব্যক্তিমানবরূপে দেশ ও জাতি সম্পর্কে তাঁরও কিছু চিন্তা-চেতনা আছে এবং তাঁর সাহিত্যে তাদের প্রতিফলন অপরিহার্য তথা অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সামগ্রিকভাবে এই উপন্যাসে যে তাঁর রাজনীতি এবং জীবনমূলক একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তার দায়িত্ব অস্বীকার করেন নি। 'ঘরে বাইরে'র নীতি-দুর্নীতি সম্পর্কে সেদিন যে-সমস্ত প্রশ্ন উঠেছিল, সীতাদেবী সম্বন্ধে সন্দীপের হঠোক্তি কারো কারো মনে যে ক্রোধের সৃষ্টি করেছিল—আজকের সাহিত্য-পাঠকের কাছে তা হাস্যকর। কিন্তু 'ঘরে বাইরে'র রাজনীতির ব্যাখ্যান সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ এখনো বিদ্যমান। আর এই দিকটির ওপরে রবীন্দ্রনাথও অনেক বেশি জোর দিয়ে নিজের ভূমিকাটি স্পষ্ট করে নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন: "সত্য প্রেমের পথ আরামের পথ নয়, সে পথ দুর্গম। সিদ্ধিলাভ সকলের শক্তিতে নেই এবং সকলের ভাগ্যেও

ফলে না, কিন্তু দেশের প্রেমে যদি দুঃখ ও অপমান সহ্য করি তাহলে মনে এই সান্ত্বনা থাকবে যে কাঁটা বাঁচিয়ে চলবার ভয়ে সাধনায় মিথ্যাচরণ করিনি।"

উপন্যাসের পাতায় নিখিলেশের জবানবন্দিতেও আমরা এই কথাই বারে বারে শুনতে পাই।

'ঘরে বাইরে' যেন প্রমথ চৌধুরীর সূত্র অবলম্বন করে এক সঙ্গে দুটি বক্তব্যকে তুলে ধরতে চেয়েছে। বিমলা এবং নিখিলেশের দাম্পত্য-জীবনে একটা আনন্দিত সুর-ঝঙ্কার বেজে চলেছিল, কোথাও যে তার মধ্যে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ঘটতে পারে এ সম্ভাবনার আশঙ্কা পর্যন্ত কোনোখানে ছিল না। মেজোরাণী সম্পর্কে যে চাপা-সংশয়টুকু বিমলাকে মধ্যে মধ্যে পীড়ন করত—তা সেই দাম্পত্য-জীবনে একটুখানি ছায়া-আলোকের জাফ্‌রি কাটত মাত্র।

বনেদী রাজপরিবারের ইতিহাসে নিখিলেশ ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। সুরা এবং সাকীর আহ্বানে সে পূর্বপুরুষদের নির্দেশিত পাতালের মসৃণ পন্থা বেয়েই নেমে যায় নি। সে উচ্চশিক্ষিত, আধুনিক এবং চরিত্রবান। নতুন কালের চিন্তাধারার সঙ্গে তার মানস-সংযোগ ছিল, ইবসেনের নোরার অন্তর্দাহও তার অজানা ছিল না; তাই বিমলাকে মাত্র গৃহবধূরূপে লাভ করেই তার তৃপ্তি হয় নি। সে বিশ্বাস করত—"স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ।" তাই ব্যক্তিক স্বার্থপরতার ক্ষুদ্র গৃহকোণটি থেকে সে বিমলাকে বাইরের আকাশে মুক্তি দিয়ে নিজের প্রেমকেও মুক্ত করতে চেয়েছিল—সম্পূর্ণ পৃথিবীর মধ্যে পূর্ণভাবেই স্ত্রীকে লাভ করতে চেয়েছিল। নিখিলেশ বলেছে: "আমি লোভী নই, প্রেমিক। সেই জন্যেই তালা-দেওয়া লোহার সিন্দুকের জিনিস চাই নি—আমি তাকেই চেয়েছিলুম আপনি ধরা না দিলে যাকে কোনোমতেই ধরা যায় না। স্মৃতি-সংহিতার পুঁথির কাগজের কাটা ফুলে আমি ঘর সাজাতে চাইনি;

বিশ্বের মধ্যে জ্ঞানে শক্তিতে প্রেমে পূর্ণ-বিকশিত বিমলকে দেখবার বড়ো ইচ্ছে ছিল।"

এই মুক্তি এল দেশজোড়া রাজনৈতিক আলোড়নের ভেতর দিয়ে। আর সেই সঙ্গে দুরন্ত বেগে এল সন্দীপ। "কালপুরুষের নক্ষত্রের মতো" সন্দীপের "উজ্জ্বল দুই চোখ" বিমলার "মুখের উপর এসে পড়ল।" বিমলার ইচ্ছে হল—"গ্রীসের বীরাঙ্গনার মতো আমার মাথার চুল কেটে দিই ওই বীরের হাতের ধনুকের ছিলা করবার জন্য—আমার এই আজানুলম্বিত চুল।"

এইখান থেকেই শুরু হল 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের সংঘাত। সন্দীপের প্রবল ব্যক্তিত্ব, তার চরিত্রের উগ্র প্রচণ্ডতা,—তার নির্লজ্জ নগ্ন দুঃসাহস, তার অকুণ্ঠিত লোভ—এবং সর্বোপরি তাকে ঘিরে ঘিরে দেশপ্রেমের একটা অগ্নিবলয় বিমলাকে অপ্রতিরোধ্যভাবে আকর্ষণ করল। শেষ পর্যন্ত দেশপ্রেম রইল ছদ্মবেশ, বিমলার প্রতি সন্দীপের উগ্র কামনা আর পতঙ্গবৃত্তা বিমলার তার প্রতি মরণান্তিক আকর্ষণ—'ঘরে বাইরে'র ট্র্যাজিডীকে ঘনিয়ে আনল।

প্রথম দিকে সন্দীপের প্রতি বিমলার যে শ্রদ্ধা ছিল, তা এক অগ্নিমন্ত্রী দেশনায়কের চরণে নিবেদিত—যা দেশের নগণ্য অগণনকে মহতোমহীয়ানরূপে ছাড়িয়ে উঠেছে বিশাল বনস্পতির মতো। কিন্তু সে মোহ ভাঙতে দেরী হয়নি। তার পরবর্তী অধ্যায় মাত্র ব্যক্তিক আকর্ষণের। লোহা যেমন করে চুম্বককে টানে, কাঁচপোকা যে-ভাবে তেলাপোকাকে আত্মসাৎ করে, তেমনিভাবেই দুর্নিবার বেগে সন্দীপ বিমলাকে টেনে নিয়ে চলেছে। তখন আর সন্দীপ সম্বন্ধে বিমলার শ্রদ্ধা নেই। সে জানে সন্দীপ লোভী, জানে মিথ্যাকে জোরের সঙ্গে ঘোষণা করাই সন্দীপের চরিত্র; শান্ত-সংযত নিখিলেশের সত্য, শক্তি এবং ত্যাগের সম্মুখে সন্দীপের মেকী দেশপ্রেম বারে বারে চুরমার হয়ে যায়। তবু সন্দীপকে বিমলা ছাড়তে পারে না; আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়, নিখিলেশের

পা বুকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে—তবুও তার ফেরবার পথ নেই। এ তার নেশা—সর্বনাশের নেশা। যে কারণে বিলিতী উপন্যাসে ইংরেজ সেনানায়কের তরুণী কন্যা আফ্রিদী-সৈনিকের বাহুপাশে ধরা দেয়—এ সেই আদিম ইতিহাসের আহ্বান, সমাজ-শিক্ষা-সংস্কৃতি সব এর কাছে মিথ্যে হয়ে যায়। এর হাত থেকে প্রাণপণে মুক্তি চেয়েছে বিমলা, কিন্তু সব দিক থেকে চরম দুর্লগ্ন ঘনিয়ে আসবার আগে আর সে মুক্তি তার আসে নি। এই প্রসঙ্গে বিমলা নিজেই বলছে :

"তাঁকে শ্রদ্ধাও করি নে, এমনকি তাঁকে অশ্রদ্ধাই করি। আমি খুব স্পষ্ট করেই বুঝেছি আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর তুলনাই হয় না। এও আমি প্রথমে না হোক ক্রমে ক্রমে জানতে পেরেছি যে, সন্দীপের মধ্যে যে জিনিসটাকে পৌরুষ বলে ভ্রম হয় সেটা চাঞ্চল্যমাত্র।

তবু আমার এই রক্তে-মাংসে এই ভাবে-ভাবনায় গড়া বীণাটা ওঁরই হাতে বাজতে লাগল। সেই হাতটাকে আমি ঘৃণা করতে চাই এবং এই বীণাটাকে—কিন্তু, বীণা তো বাজল। আর, সেই সুরে যখন আমার দিন রাত্রি ভরে উঠল তখন আমার আর দয়ামায়া রইল না। এই সুরের রসাতলে তুমিও মজো, আর তোমার যা-কিছু আছে সব মজিয়ে দাও, এই কথা আমার শিরার প্রত্যেক কম্পন আমার রক্তের প্রত্যেক ঢেউ আমাকে বলতে লাগল।"

পুরুষের যে আদিম প্রবলতা নারীকে তার শান্ত, শীলিত কক্ষ-পরিক্রমা থেকে ধূমকেতুর মতো ছিন্ন করে নিয়ে আসে—সেই চিরন্তন ইতিহাসকে শিল্পিত করাই 'ঘরে বাইরে'র প্রধানতম কৃতিত্ব। এর সঙ্গে যুগের প্রশ্নও এসে মিলেছে। নারীর ভূমিকা কতখানি ঘরে, কতখানিই বা বাইরে? আকাশে ডানা মেলবার অধিকার নিশ্চিতভাবেই তাকে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু ঝড়ের কালো মেঘে জ্বলন্ত বিদ্যুতের মনোহরণ মূর্তি দেখে যদি সে সেইদিকেই মৃত্যু-

অভিসারে যাত্রা করে—তবে তাঁকে ফিরিয়ে আনবার প্রয়োজন আছে কি না? এবং এই ক্ষেত্রে আমরা কতটা গ্রহণ করব ইব্‌সেনের শিক্ষা, আধুনিক ইয়োরোপের নারী-স্বাতন্ত্র্যবাদ আমাদের নীড় জীবনের পক্ষেই বা কতটা কল্যাণকর হবে? মনে হয়, এই প্রশ্ন 'গোরা' উপন্যাসের মধ্যেও পরোক্ষভাবে কয়েকবার এসেছে। কিন্তু তার চাইতেও বৃহত্তর-মহত্তর বক্তব্য সম্মুখে ছিল বলে রবীন্দ্রনাথ তখন সেটিকে ঠিক যাচাই করে নিতে পারেন নি; অনুকূল কাল-পরিবেশ এবং নির্দিষ্ট ধরণের কাহিনীর আশ্রয়ে এইখানে তিনি সেটিকে সম্পূর্ণভাবে বিন্যস্ত করে ধরেছেন।

তিনটি প্রধান চরিত্রের আত্মসমীক্ষার আলোকে এই প্রশ্নই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। উদ্দামতার উদগ্র নেশায় এবং দেশপ্রেমের মোহাবরণে নিখিলেশকে বিমলা উপেক্ষা করেছে, তার উদার, গভীর, নিস্তরঙ্গ, ধ্রুব ও কল্যাণময় প্রেমকে তার বিস্বাদ মনে হয়েছে; আগ্নেয় মরণ যাকে ডাক দিয়েছে—স্নিগ্ধ-শান্ত ছায়ানীড় তার কাছে তখন নিরর্থক। কিন্তু শান্তি, প্রেম এবং কল্যাণের আদর্শে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ এই অগ্নিময় মৃত্যুকেই জয়মাল্য দেননি—অনেক দুঃখের মধ্য দিয়ে, অনেক অপচয়ের বেদনায় দীর্ণ-জীর্ণ হয়ে, বিমলা নিজের সত্যভূমিতে ফিরে এসেছে।

উপন্যাসের মুখ্য অবলম্বন কিন্তু রাজনীতি। মাতানোর এবং খ্যাপানোর আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের কোনো শ্রদ্ধা কখনো নেই—তিনি চান আত্মশোধন, তিনি চান আত্মগঠন। তাঁর বিশ্বাস, হাজার যুগের সংস্কারে যারা আচ্ছন্ন, তাদের উত্তেজনার মদিরা পান করিয়ে ছোটানো যায় বটে, কিন্তু সে উদ্যম প্রায়শঃ উপদ্রব এবং শক্তির অপব্যয় মাত্র। ইংরেজের অত্যাচারকে ঘৃণা করা যায়—কিন্তু ইংরেজকে ঘৃণা করবার অপবুদ্ধি এবং জাতিবৈর দেশকে রসাতলে নিয়ে যাবে। দেশের মানুষকে কাপড় জোগাবার শক্তি নেই, অথচ বিলিতি কাপড় পুড়িয়ে দরিদ্র ব্যবসায়ীর সর্বনাশ করব এবং

জনসাধারণকে উলঙ্গ করে রাখব—এই স্বাদেশিকতা তাঁর কাছে দুর্বোধ্য। আর বিপ্লববাদ? রক্তের পথ তাঁর কাছে চিরদিন ঘৃণ্য—ও এক বীভৎস পাপচক্র—যা এক অন্যায়ের প্রতীকার করতে গিয়ে সহস্র অন্যায়কে আহ্বান করে আনে। এ সম্পর্কে ইয়োরোপের নজীর তুলে কোনো লাভ নেই। তারা রক্তপাতের পথ ধরে হয়তো অনেকখানিই সিদ্ধিলাভ করেছে, কিন্তু তাই দেখেই আমরা অভিভূত হয়ে পড়ব না। এ সত্য যেন আমরা কখনোই ভুলে না যাই যে আজকের এই প্রবল শক্তিমত্তা এবং রক্তপাতের সমস্ত ঋণ একদিন পশ্চিমকে কড়ায় ক্রান্তিতে মিটিয়ে দিতে হবে, কারণ:

'অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥'

সুতরাং 'ঘরে বাইরে'তে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় এবং প্রত্যক্ষ বক্তব্য: ইয়োরোপীয় শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে অন্ধবেগে এ কোন্ নীরন্ধ্র অন্ধকারের পথে আমরা সর্বনাশের দিকে ছুটেছি?

মনস্তত্ত্ব এবং কাব্যব্যঞ্জনার আশ্রয়ে, ফাঁকে ফাঁকে প্রয়োজনীয় নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করে, থেকে থেকে চকিত-বিদ্যুদালোকে চরিত্রগুলির এক-একটি আশ্চর্য দিক উদ্ভাসিত করে 'ঘরে বাইরে' কলধ্বনিত নদীর মতো তার সমুদ্র-পরিণতির দিকে অগ্রসর। কখনো নিখিলেশের মন তাতে গভীর অতলতা সৃষ্টি করেছে, কোথাও বিমলা তার প্রবল আবর্তে ডুবছে-উঠছে, কখনো বা সন্দীপ তাতে ফেনার অট্টহাসি তুলে কূল ভাঙছে।

কিন্তু সাহিত্যের বিচারে, বিমলা-সন্দীপ-নিখিলেশের ভেতরকার মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, সন্দীপের উন্মত্ত-বর্বর আকর্ষণে বিমলার আত্মবিস্মৃতি আর সত্যের শিখায় নিজের হৃদয়কে জ্বালিয়ে রেখে প্রতি মুহূর্তে দগ্ধ হতে হতে নিখিলেশের যে প্রতীক্ষা—এ থেকেই 'ঘরে বাইরে' সম্পূর্ণ সার্থক হয়ে উঠতে পারত। বস্তুত, তাই-ই ঘটেছে। আজ সেদিনের রাজনীতি একটা দূর ইতিহাস মাত্র, তার অনুষঙ্গ একালের

পাঠকের মনে যৎসামান্য প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করে। যা সত্য হয়ে ওঠে তা বিমলার কঠিন আত্মদ্বন্দ্ব, নিখিলেশের কঠিনতর আত্ম-শাসন এবং সন্দীপের অদ্ভুত অলজ্জ-লুব্ধতা। অর্থাৎ একটি নিদারুণ ও চিরন্তন মানব-সমস্যাই 'ঘরে বাইরে'-কে আজও উজ্জ্বল করে রেখেছে, নিখিলেশ তথা রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রীয় চিন্তা নয়।

এবং, 'ঘরে বাইরে'র দুর্বলতাও এই রাজনীতির চর্চার ভেতরেই। একটা বিশেষ কালের জীবন ও সমাজকে ফোটাতে গিয়ে রাজনীতি প্রয়োজন হলে অবশ্যই আসতে পারে ; কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের দাবি মেটাতেই সব কিছুকে ব্যবহার করতে হবে—সেই উদ্দেশ্যের দ্বারাই সব কিছু চালিত হবে এবং চরিত্র ও ঘটনাকে অস্বাভাবিকভাবে পর্যন্ত বক্তব্যের জোয়ালে বেঁধে দিতে হবে—এ এক মারাত্মক বিভ্রান্তি। এই উপন্যাসে নিখিলেশ এবং চন্দ্রনাথ-বাবুর মধ্য দিয়ে দেশসাধনার যে তত্ত্ব প্রকটিত হয়েছে, তা রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা ; তাঁর বহু প্রবন্ধ, আলোচনা এবং চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে আমরা তা জানতে পারি। এই মতকে যদি উপন্যাসের স্বাভাবিক বিকাশের ভেতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারতেন, তা হলে তাতে কোথাও আপত্তি থাকত না ; কিন্তু 'ঘরে বাইরে'তে বক্তব্য উপস্থিত করবাব ভেতরে একটা অস্বাভাবিক অসহিষ্ণুতা চোখে পড়ে। যে-দোষে বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তর-জীবনের উপন্যাস কঠোরভাবে সমালোচিত—রবীন্দ্রনাথও তা থেকে নিষ্কৃতি পান না। উপন্যাসের প্রতিদ্বন্দ্বী এই অসহিষ্ণুতার জন্যেই কখনো ক্লাউনের মতো ব্যবহার করে—বিমলার সশ্রদ্ধ ভক্তি-নিবদনের অন্তরালে রবীন্দ্রনাথের বিগূঢ় ব্যঙ্গ চাপা থাকে না। সন্দীপের মধ্য দিয়ে যে দেশনায়কের মূর্তি রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়েছেন, সেই ক্রূর-কুটিল নগ্ন-স্বার্থপর মানুষটি বিপ্লবীদের প্রতি সুবিচার করা দূরে থাক, তার একটা অন্যায় প্যারডি রচনা করেছে মাত্র। সেদিনের যে আত্মত্যাগী মানুষগুলি 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র উচ্চারণ

করে অকম্পিত পদে ফাঁসির মঞ্চের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন—যে অরবিন্দ-বারীন্দ্র-উল্লাসকর তাঁর একেবারে অপরিচিত ছিলেন না—রবীন্দ্রনাথ যদি সন্দীপের মধ্য দিয়ে তাঁদের প্রতিফলনই দেখতে পেয়ে থাকেন, তবে তাকে দেশের দুর্ভাগ্য বলে মেনে নিতে হয়। মতভেদ থাকতেই পারে, কিন্তু তাই বলে বিরুদ্ধ বক্তব্যকে হীন করবার জন্যে হরিশ কুণ্ডুর মতো জমিদারকে দেশপ্রেমিকরূপে চিত্রিত করা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে প্রত্যাশিত নয়—যেহেতু তা ঐতিহাসিক-ভাবেই অসত্য। আর এই বিকৃতির ফল উপন্যাসের মূল শিল্প-সৌন্দর্যকে পর্যন্ত গিয়ে আঘাত করে। লেখকের সহানুভূতি এবং পক্ষপাতে নিখিলেশ প্রথম থেকেই সত্যদীপ্ত, সন্দীপ প্রথম থেকেই ঘৃণা এবং কৌতুকের উপকরণ এবং তার প্রতি বিমলার আকর্ষণ—বিমলার রুচি এবং চরিত্রবল সম্পর্কে শুরু থেকেই আমাদের মনে সংশয়ের সৃষ্টি করে। 'Mock-Hero' সন্দীপের জন্যে বিমলার মোহাচ্ছন্ন মূঢ়তা এই কথাই প্রমাণ করে যে সে একরাশ পুঞ্জীভূত আবেগ মাত্র, তার উপযুক্ত বিচারবোধ নেই, প্রয়োজনীয় আত্ম-সংযমের শক্তিও নেই ; অতএব বিমলার প্রতি পাঠকের সহানুভূতি প্রচণ্ডভাবে আঘাত খায়। বলা বাহুল্য, প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রথমেই কৌতুকের এবং অশ্রদ্ধার উপকরণ করে তুললে তাতে ঔপন্যাসিক সংঘাত প্রবলতা লাভ করে না, তা রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্বল হয়ে যায়। 'ঘরে বাইরে'তে পরম বেদনার সঙ্গে এই সত্যটি লক্ষ্য না করে উপায় নেই। সোজা কথায়, বক্তব্যের প্রয়োজনে সন্দীপ ইত্যাদির চরিত্র অতি সরলীকৃত এবং উদ্দেশ্যমূলক type-এ পরিণত হয়েছে, তা ঔপন্যাসিকের গৌরব বাড়ায়নি। আর এতে শেষ পর্যন্ত অমূল্যর মৃত্যু যেন অজ্ঞানের বলি—বিপ্লব অন্দোলনের অগণিত শহীদের অন্যতম রূপে নিজের মৃত্যু দিয়ে সন্দীপের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে সে—যেমন করেছিল 'বিসর্জনে'র জয়সিংহ।

কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর উদ্ধৃতি থেকেই দেখেছি, কালটা আত্ম-

জিজ্ঞাসার এবং আত্মসংহতির। সেই প্রয়োজনের দাবিতেই 'ঘরে বাইরে' নানা প্রত্যক্ষ প্রশ্নের উত্থাপনায় এবং তার আলোচনায় মুখর। ঔপন্যাসিক এবং তাত্ত্বিকের সেখানে সমভাগ। নিখিলেশ-সন্দীপ-বিমলার হৃদয়গত ঔপন্যাসিক জাগ্রত এবং সফল; রাজনীতির আলোচনায় তাত্ত্বিকের উপস্থিতি এবং সে উপস্থিতিকে শিল্পের বিচারে খুব বাঞ্ছনীয় বলে মনে করতে পারি না।

॥ তিন ॥

এর পরবর্তী উপন্যাস 'যোগাযোগ'। 'যোগাযোগ' রচিত হওয়ার মধ্যেই 'শেষের কবিতা'ও লিখিত হতে থাকে এবং এই দুটি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে 'বিচিত্রা' ও 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। রচনা এবং প্রকাশের কালবিচারে 'যোগাযোগ' কয়েক মাসের বয়োজ্যেষ্ঠ। তাই 'যোগাযোগে'র দিকেই প্রথমে দৃষ্টিপাত করা যাক।

'ঘরে বাইরে' থেকে 'যোগাযোগে'র মধ্যে পনেরো বৎসরের ব্যবধান। এই সময়ের ভেতরে কথা-সাহিত্যের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ নিরতিশয় নিরুৎসুক, এমন কি ছোট গল্পের চর্চা পর্যন্ত যৎসামান্য। তাঁর সাহিত্য-সাধনা তখন অন্যতর ক্ষেত্রে ব্যাপৃত, কিন্তু সে আলোচনা আমাদের নয়।

এই পনেরো বৎসরে দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাস অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। বিপ্লববাদের তরঙ্গ থামেনি, ১৯৩০ সালের চট্টগ্রামে সে তার দারুণ বিস্ফোরণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ঠিক একই সময়ে দেশব্যাপী সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রবল বন্যাও সমাগতপ্রায়। রবীন্দ্রনাথের মন এই সময় হিন্দু-মুস্‌লিম সমস্যা নিয়ে চিন্তিত—চরকা-কাটা এবং স্বরাজ-সাধনার

সত্যবিচারে উৎসুক। 'ঘরে বাইরে'তে তাঁর যে চিত্তদাহ প্রকটিত হয়েছিল, তা এখন স্তিমিত; তিনি এখন সংগঠন-মূলক কর্মপদ্ধতিতে বিশ্বাসী—তথাকথিত 'পলিটিক্‌সে' আর তাঁকে তেমনভাবে উৎসাহিত দেখা যায় না।

সেইজন্যে এই পর্যায়ে যে উপন্যাসে তিনি হস্তক্ষেপ করলেন, তাতে রাজনীতির চিহ্নমাত্র রইল না। 'তিনপুরুষ' নাম দিয়ে যে বৃহৎ উপন্যাসটি তিনি 'বিচিত্রা'র পাতায় আরম্ভ করলেন, তা একান্তই পারিবারিক কাহিনী—রাজনীতি দূরে থাক, তা সমাজ-সমস্যাকেও স্পর্শ করল না। 'তিনপুরুষ' অচিরাৎ 'যোগাযোগে' নামান্তরিত হল এবং এক পুরুষের কাহিনীতেই উপন্যাস সমাপ্তি পেলো। চাটুজ্জে পরিবার এবং ঘোষাল বংশের পুরুষানুক্রমিক বিদ্বেষের রণক্ষেত্রে কুমুদিনীর সকরুণ আত্মদান একটি বিষণ্ণ গোধূলির পাণ্ডুর ছায়া বিকীর্ণ করল, যেন ট্রয়যুদ্ধের পর তৃষিত প্রেতাত্মাকে তৃপ্ত করবার জন্যে অ্যাকিলিসের সমাধিতে ঢেলে দেওয়া হল প্রায়াম-কন্যা পলিক্‌সেনার শোণিতধারা!

'ঘরে বাইরে' ⌣পন্যাসেই আমরা লক্ষ্য করেছি, চরিত্র এবং ঘটনার মধ্য দিয়ে বক্তব্যকে ফুটিয়ে তোলার চাইতে চরিত্র ও পরিস্থিতিকে বক্তব্যের বাহন করবার দিকেই রবীন্দ্রনাথ উদ্যোগী হয়েছেন। এই প্রবণতা 'গোরা' থেকেই সূচিত হয়ে উঠেছিল। হয়তো পরিণত বয়সের এটি স্বাভাবিক ধর্ম এবং এই কারণেই উদ্দেশ্যের মহনীয়তা সত্ত্বেও তৎসত্ত্বয়ের 'রেসারেক্‌শন'কে পূর্ণাঙ্গ শিল্পসাফল্যরূপে গ্রহণ করা কঠিন হয়। 'যোগাযোগ' উপন্যাসেও ভাবদ্বন্দ্বই মুখ্য—চরিত্রগুলো সেই দ্বন্দ্ব প্রকাশের উপকরণমাত্র। চাটুজ্জে এবং ঘোষালবংশের দীর্ঘ পারিবারিক বিরোধের ইতিহাস উপন্যাসের পটভূমিতে থাকলেও এর মূল সংঘাত গড়ে উঠেছে একটি সর্বকালীন সমস্যাকে আশ্রয় করে: শিল্পীর একটি অম্লান উজ্জ্বল সৌন্দর্য পিপাসা এবং তার সঙ্গে স্থূল, রূঢ় ও বৈষয়িক

জীবনের সংঘাত যেন চিরকালের 'La belle et la bête'-এর কাহিনী। যা সূক্ষ্ম এবং সুকুমার—তার দিকে প্রতিমুহূর্তে লোভের কুশ্রীতা রাহুর মতো অগ্রসর হয়; কলাবতী বীণার তন্ত্রীগুলি ছিন্ন-ছিন্ন হয়ে যায় অসুরের স্থূল-কর্কশ অঙ্গুলি-সম্পাতে; বৈষয়িকতার সারমেয় শিল্পের নৈবেদ্যকে উচ্ছিষ্ট করে। এই বেদনা থেকেই ভ্যান গগকে নিজের হাতে তাঁর 'The yellow house of light'-কে নিবিয়ে দিতে হয়, গর্গ্যা প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে ব্যাধিতে জর্জরিত হয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেন, কীট্‌সের প্রদীপ শিখায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠবার আগেই অন্ধকারে বিলীন হয়ে যায়।

পৃথিবীর সর্বদেশে, সর্বকালে, সমস্ত শিল্পী-সাহিত্যিক এ নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। অরসিকের কাছে রসনিবেদনের দুর্ভাগ্য থেকে তাঁরা পরিত্রাণ কামনা করেছেন, নিরবধি কালের কাছে সমানধর্মার প্রত্যাশা জানিয়েছেন, দিঙনাগের স্থূল হস্তাবলেপের আশঙ্কায় অনুকূল পবনচারী মেঘদূতের গতি বারে বারে মন্থর হয়ে গেছে। 'যোগাযোগে'র অন্তরলোকেও এই চিরকালীন কাহিনী।

বিষয়ের দিক থেকে রবীন্দ্র-সাহিত্যেও এটি আকস্মিক নয়। 'যোগাযোগে'র পূর্বসূচনা পাওয়া যাবে 'হালদারগোষ্ঠী' গল্পের বনোয়ারীর চরিত্রে, আরও ভালো করে পাওয়া যাবে 'সবুজপত্রে'র প্রথম বৎসরে দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত 'হৈমন্তী' গল্পে। গল্পধারা প্রসঙ্গে আমরা আগেই এদের সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এই 'হৈমন্তী' চরিত্রটিকে কুমুদিনীর প্রথম খসড়া বলা যেতে পারে। হৈমন্তীর স্বামী এখানে যোগাযোগের মধুসূদন নয়—সে-ভূমিকা নিয়েছে রক্ষণশীল লোভী সংসার—যা প্রতি মুহূর্তে ইতর-কার্কশ্যে ক্ষত-বিক্ষত ক'রে হৈমন্তীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। হৈমন্তীর পিতা গৌরীশঙ্করের সঙ্গে বিপ্রদাসের সাদৃশ্যও খুঁজে পাওয়া কঠিন হয় না; সতেরো বছরের কিশোরী হৈমন্তী—যে 'অকলঙ্ক শুভ্র, নিবিড় পবিত্র', তার সঙ্গে 'রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ড' কুমুদিনীর—

যার সমস্ত মুখে একটি 'বেদনার সকরুণ ধৈর্যের ভাব'—আত্মিক সম্পর্ক আপনি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। হৈমন্তীর কায়িক মৃত্যু এবং কুমুদিনীর মানস-মৃত্যুর বেদনাও মূলত এক।

অর্থাৎ রাক্ষসপুরীতে লক্ষ্মীর বন্ধনের অভিশাপ।

কুমুদিনী-মধুসূদনের সম্পর্ক সম্বন্ধে মোতির মা-র মনে যে ভাবনা জেগেছে, সেটি উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথেরও বক্তব্য: "একরকমের জাতিভেদ আছে যা সমাজের নয়, যা রক্তের—সে জাত কিছুতে ভাঙা যায় না। এই যে রক্তগত জাতের অসামঞ্জস্য এতে মেয়েকে যেমন মর্মান্তিক করে মারে পুরুষকে এমন নয়।" শুধু অসামঞ্জস্যই নয়—দুজনের সম্পর্ককে প্রায় খাদ্য-খাদকের পর্যায়ে পৌঁছে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "একটা অজানা জন্তু লালায়িত রসনা মেলে গুঁড়ি মেরে বসে আছে, সেই অন্ধকার গুহার মুখে দাঁড়িয়ে কুমুদিনী দেবতাকে ডাকছে।"

বিপ্রদাসের সান্নিধ্যে এবং শিক্ষায়, শিল্পে, সৌন্দর্যে এবং শুচিতায় যে কুমুদিনী রজনীগন্ধার মতোই ফুটে উঠেছিল, নূরনগরকে পরাভূত করবার আকাঙ্ক্ষায় প্রৌঢ় বৈষয়িক মধুসূদন তাকে নিজের ভোগের ফুলদানীতে সাজাবার জন্যে ছিন্ন করে আনল, ঋণের জালে নাগপাশের মতো জড়ালো চাটুজ্জেদের মুমূর্ষু জমিদারীকে। চিরকালের ব্যবসায়ী মধুসূদন ভেবেছিল, বিবাহের মধ্য দিয়ে যাকে একবার মুঠোর মধ্যে পাওয়া গেছে সে তার ব্যাঙ্কের টাকার মতো নির্বিঘ্ন ব্যয়-অপব্যয়ের সামগ্রী; জীবিত প্রাণিরূপে স্ত্রীর কিঞ্চিৎ ব্যক্তিত্ব যদি কখনো কখনো প্রতিবাদে সজাগ হয়ে ওঠেই, তাহলে তাকে ঘুম পাড়ানোর জন্যে দু'একখানা হীরা-মুক্তার গহনাই যথেষ্ট।

কিন্তু দেখা গেল, কুমুদিনীর হাতের তুচ্ছ নীলার আংটিটিকে তার সমস্ত ঐশ্বর্য দিয়েও মধুসূদন কিনে নিতে পারল না। যে অর্থ আর শক্তির দম্ভ নিয়ে এতদিন সে রাজমর্যাদা ভোগ ক'রে এসেছে, কুমুদিনীর কাছে তা লুটিয়ে গেল ধুলোতে। তারপরে সে বারবার

নত হল, অভিমান করল, রাগ করল এবং অনুতাপ করল, কুমুদিনীর দেহের ওপর স্বামীত্বের অধিকার লাভ করেও তার মনকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারল না, বিপ্রদাসের ওপর শূন্যগর্ভ ঈর্ষ্যায় জ্বলে মরল, শেষ পর্যন্ত নিজের ভেতরকার হিংস্র ক্ষুধিত পশুটাকে শ্যামাসুন্দরীর মাংসপিণ্ড দিয়ে পরিতৃপ্ত করতে চাইল। পরিসমাপ্তিতে তারই সন্তানের জননী হয়ে কুমুদিনী যখন তার কাছে ফিরে গেল, তখন সে সম্পূর্ণ ই পরাজিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক তারপরে আর কাহিনীকে টানেন নি, কিন্তু সেই অলিখিত অংশে কুমুদিনীর প্রাণহীন দেবীমূর্তির পায়ে দিনের পর দিন মধুসূদন তার ব্যর্থ উপচার সাজিয়ে চলেছে, এই দারুণ করুণ রূপটি আমরা কল্পনা করে নিতে পারি।

'যোগাযোগ' উপন্যাস 'ঘরে বাইরে' বা 'চতুরঙ্গের' মতো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের তীব্র তীক্ষ্ণ অন্তর্মুখিতাকে বিশেষ আশ্রয় করেনি; এর বক্তব্য প্রথম থেকেই উপস্থাপিত—তারপর নিরবচ্ছিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত, অসংখ্য নাটকীয় মুহূর্ত। এমন দ্রুতগামী উপন্যাস রবীন্দ্রনাথের আর দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ এবং সেইজন্যেই মুকুন্দলাল এবং নন্দরাণীর সংক্ষিপ্ত পূর্বকাহিনীটুকুও আমাদের কাছে অনাবশ্যক বলে মনে হতে থাকে। 'তিন পুরুষে'র ইতিবৃত্ত রচনার প্রতিশ্রুতি লেখক যখন পালনই করতে পারলেন না, তখন ও অংশটুকু না থাকলেও কোনো ক্ষতি ছিল না মনে হয়।

এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ মধুসূদনের প্রতি নয়—তাঁর মমতায় অভিষিক্ত হয়েছে কুমুদিনী, তাঁর স্নেহে লালিত হয়েছে বিপ্রদাস; প্রসন্নতায় স্নিগ্ধ হয়েছে নবীন, মোতির মা, কালু মুখুজ্জে এবং গোপাল। কিন্তু ঔপন্যাসিক চরিত্র হিসাবে সব চাইতে সার্থক মধুসূদন। বিপ্রদাস, কুমুদিনী এবং মধুসূদন—এই ত্রয়ী ব্যক্তিত্বের মধ্যে মধুসূদনই উজ্জ্বলতম। সে কুমুদিনীর মতো আইডিয়া নয়, বিপ্রদাসের মতো মহৎ ব্যক্তিত্ব নয়, নবীন-মোতির

মা-র মতো টাইপ নয়, এমন কি শ্যামাসুন্দরীর মতো দেহসর্বস্ব লোলুপতাও নয়। সে পরিপূর্ণ রক্তমাংসের মানুষ—সহজ এবং স্বাভাবিক। কুমুদিনীকে সে যে চিনতে পারেনি—সে তার দুর্ভাগ্য—অপরাধ নয়; চাটুজ্জেদের অপমান করবার একটা দুরভিসন্ধি যদি তার প্রথম দিকে থেকেও থাকে—তাহলে সে তার অসম্মানিত পিতৃপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাতর্পণের জন্য এবং তা যথাযোগ্য। বিপ্রদাসের চিঠি লুকোনোর জন্য কিছু শাস্তি হয়তো তার প্রাপ্য ছিল, কিন্তু যে জীবনব্যাপী অভিশাপ কুমুদিনীর মধ্য দিয়ে তার ওপরে নেমে এসেছে—এতখানি দণ্ড তাকে কোনোমতেই দেওয়া চলে না।

আমার মনে হয়, যোগাযোগে সব চাইতে করুণ ভূমিকা মধুসূদনের—এ উপন্যাস তারই ট্র্যাজিডী। যে-কোনো সার্থক ঔপন্যাসিক বা নাট্যকার তাঁর প্রধান চরিত্রকে গঠন করেন, নানা টানা-পোড়েনের মধ্য দিয়ে, ভ্রান্তি এবং সংশয়ে দহন করে, নানা পতন-উত্থানের আশ্রয়ে। কবি-ঔপন্যাসিক মধুসূদনকে 'ভিলেন' করতে চেয়েছিলেন কি না জানি না, কিন্তু "অজানা জন্তুর লালায়িত রসনার" কথা তিনি বলে নিয়েছেন, মধুসূদনের মূঢ়তাকে থেকে থেকে ধিক্কার দিয়েছেন. ফলে মধুসূদনের চরিত্রে ভিলেনের লক্ষণগুলিই যেন তীক্ষ্ণচূড়। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে 'যোগাযোগ' উপন্যাসে চূড়ান্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব তারই, তার মনের বঙ্কিম রেখাঙ্কনেই লেখকের সিদ্ধিলাভ হয়েছে। উপন্যাসের শেষাংশে যখন কুমুদিনীকে ফিরিয়ে নেবার জন্যে সে বিপ্রদাসের কাছে উকিলের চিঠি দেয়, তখন তার নেপথ্য থেকে যেন আমরা মধুসূদনের আর্তনাদই শুনতে পাই—তার অহঙ্কারের হুঙ্কার নয়। অর্থাৎ, সোজা কথায়, ভালো হোক মন্দ হোক—গল্স্‌ওয়ার্দির অভাগা সোম্‌স্ ফরসাইটের মতো মধুসূদনই এই কাহিনীর নায়ক।

অন্যদিক থেকে, কুমুদিনী শেষ পর্যন্ত শুচিতার বিবিক্ততায়ই বাস করেছে এবং উপন্যাসের শেষে যখন লজ্জায় গ্লানিতে তাকে

অবশেষে স্বামীগৃহে ফিরে আসতে হয়েছে, তখনো তার মন বিন্দুমাত্র মধুসূদনের প্রতি অনুকূল নয়। উপন্যাসের প্রারম্ভে কুমুদিনীকে নিয়ে যে বিরোধের সূত্রপাত ঘটেছিল, তা বিচিত্র মনস্তাত্ত্বিক পর্যায়ে বিস্তৃত না হয়ে একমুখী ঝোঁকে এগিয়ে গেল, এবং দেখা গেল দু-একটি আঘাতের পরেই একটি নিরাসক্ত নিষ্ঠুরতার কেন্দ্রে কুমুদিনী সংহত হয়ে গেছে, স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হবার গ্লানি সে শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও ভুলতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথের আইডিয়া দিয়ে গড়া কুমুদিনীর এই নির্মম অনাসক্তি—সৌন্দর্য এবং কুশ্রীতার অসম-মিলনতত্ত্বে হয়তো সার্থক, কিন্তু জীবনের বাস্তবতার বিচারে মোতির মা-র মতোই তাকে স্বীকার করে নেওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন হয়। আর একটু সহজ এবং সহিষ্ণু হলে সে মধুসূদনকে বদলাতে হয়তো পারত না, কিন্তু স্বামীকে অনেকখানি ঊর্ধ্বায়িত করে তোলা তো তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। অপমানিতা কুমুদিনী তা করেনি, তার সুকঠিন নির্বেদ নিয়ে যখন এক জায়গায় সে স্থির হয়ে দাঁড়ায়, তখন যে বিচিত্রতার বাঁকে বাঁকে কোনো চরিত্র পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, কুমুদিনী সে সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়। কুমুদিনীর নিষ্ঠুরতা তাকে মাত্র যে স্বামীর সংসারেই প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়নি তা নয়, জীবন্ত চরিত্ররূপে সাহিত্যের আসর থেকেও তাকে অনেকখানি দূরে সরিয়ে দিয়েছে। 'La belle et la bête'-এর রূপকথাতেও তো শেষ পর্যন্ত বিউটি সেই নির্বোধ পশুকে ভালোবেসেছিল, তার প্রেমের স্পর্শে মুমূর্ষু প্রাসাদ জেগে উঠেছিল লক্ষ আলোর শিখায়—রাজবেশ পরে পশুর নবজন্ম ঘটেছিল। মধুসূদনের উদ্দেশে সেই কয়েকবিন্দু করুণার বর্ষণ কি এতই অসম্ভব ছিল কুমুদিনীর পক্ষে? রূপকথার সেই কুখ্যাত "Barbe-Bleue"র ভূমিকাই কি মধুসূদনের একান্ত প্রাপ্য? চরিত্রটির ওপর এমন অকরুণার ফলে এই উপন্যাসে শুধু ব্যর্থতাতে মধুসূদনেরই মৃত্যু হয়নি, কুমুদিনীও তার সঙ্গে সহমৃতা হয়েছে।

'ঘরে বাইরে'র মতোই তাই এই উপন্যাস-সম্পর্কেও বলা যেতে পারে, শিল্পী যেখানে প্রধানতঃ আইডিয়ার উপাসক, সেখানে তাঁর কৃতিত্বের অংশ বেশি নয়; কিন্তু বাস্তবতা দিয়ে, হৃদয়বৃত্তির আলোড়ন-বিলোড়ন দিয়ে যখন তিনি দুর্জনকেও রূপায়িত করে তোলেন তখনই সে সত্যিকারের সৌন্দর্য এবং সার্থকতায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মধুসূদনও এই গৌরবের অধিকারী—যেমন ম্যাক্‌বেথ নাটকের নায়ক হত্যাকারী ম্যাকবেথ্, যেমন মেঘনাদ বধের নায়ক রাক্ষসপতি রাবণ।

॥ চার ॥

'শেষের কবিতা' ঠিক এই ধরণের পারিবারিক উপন্যাস নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের আদর্শ ই এই উপন্যাসে শিলং শহরের পাইনবনের কাজল-কোমল ছায়ায়, ঝর্ণার ঝঙ্কৃত স্ফটিক-জলের স্বচ্ছধারাতে, রডোডেনড্রনের উদ্ধত শাখার রক্তিমরাগে স্বপ্নবিভোর হয়ে উঠেছে। এর একদিকে ডানের কবিতার কয়েকটি পংক্তির মৃদু গুঞ্জন, অন্যদিকে—'তব অন্তর্ধান পটে হেরি তব রূপ-চিরন্তন'। এর মর্মকথা :

> 'আমার প্রেম রবি-কিরণ হেন,
> জ্যোতির্ময় মুক্তি দিয়ে তোমারে ঘেরে যেন।'

'শেষের কবিতা'ও আইডিয়া-ভিত্তিক উপন্যাস। রিয়্যালিটির অংশ এতে আরো সংক্ষিপ্ত, কাহিনী-গ্রন্থনে সূত্রে যেটুকু বাস্তবতা একান্ত আবশ্যক, মাত্র সেইটুকুই লেখক গ্রহণ করেছেন। অজস্র কবিতায় আকীর্ণ 'শেষের কবিতা' একটি পরিপূর্ণ কাব্য-পাঠের আস্বাদনেই পাঠকের মনকে মন্থর করে তোলে।

একদিক থেকে 'শেষের কবিতা' আবার একটি অপূর্ব প্যারাডক্‌স্।

এই উপন্যাস রচনার কালে দেশের বিদ্রোহী নবীন বীরেরা স্থবির রবীন্দ্রনাথের 'শাসন-নাশনে' উদ্যোগী ; তাঁর বিরুদ্ধে তরুণদের অভিযোগ সোচ্চার—তিনি রোমান্টিক, তিনি বিগতকালের শিল্পী। রবীন্দ্রনাথ যেন এরই প্রতিবাদে গড়ে তুললেন আধুনিকতমতার বিগ্রহ 'অমিট্ রে' কে—যার ভাষায়, চাল-চলনে, পোষাক-পরিচ্ছদে একটা সর্বাত্মক বিদ্রোহ—সকলের মধ্যে যে 'ডিস্‌টিংগুইস্‌ড্'। 'অমিতর দুর্লভ যুবকত্ব নির্জলা যৌবনের জোরেই একেবারে বেহিসেবি, উড়নচণ্ডী, বান ডেকে ছুটে চলেছে বাইরের দিকে, সমস্ত নিয়ে চলেছে ভাসিয়ে, হাতে কিছুই রাখে না।' তার পকেটে সেই দুর্জয় দুর্বার নিবারণ চক্রবর্তীর কবিতার খাতা—যে রবি ঠাকুরের আত্মতৃপ্ত সৌন্দর্যরতির কমলবনে মত্ত হস্তীর মতো এসে প্রবেশ করেছে :

"আমার দুর্বোধ বাণী
বিরুদ্ধ বুদ্ধির 'পরে মুষ্টি হানি
করিবে তাহারে উচ্চকিত,
আতঙ্কিত।
···অপরিচিতের জয়,
অপরিচিতের পরিচয়,—
যে অপরিচিত
বৈশাখের রুদ্র ঝড়ে বসুন্ধরা করে আন্দোলিত,
হানি বজ্র-মুঠি
মেঘের কার্পণ্য টুটি
সংগোপন বর্ষণ-সঞ্চয়
ছিন্ন করে, মুক্ত করে সর্ব জগন্ময়।"

কিন্তু এই ঔদ্ধত্য, এই প্রবল দুর্বিনয়, এই দুর্ধর্ষ আধুনিকতা শেষ পর্যন্ত শিলং পাহাড়ে এসে তার মুখাবরণ মুক্ত করল। দেখা গেল, বাইরে অমিত যতই বিদ্রোহী, অন্তরে সেই পরিমাণেই রবীন্দ্রনাথের

শিষ্য। অমিত শিলঙে গিয়েছিল তার স্বশ্রেণীর কেউ সেখানে যায় না বলে, সে চেয়েছিল নির্জনতা—যেখানে দেওদার বনের ছায়ায় বসে নিজের আনন্দে সে বই পড়তে পারে। কিন্তু গল্পের বই নয়। "গল্পের বই ছুঁলে না, কেননা ছুটিতে গল্পের বই পড়া সাধারণের দস্তুর। ও পড়তে লাগল সুনীতি চাটুজ্জের বাংলা ভাষার শব্দতত্ত্ব, লেখকের সঙ্গে মনান্তর ঘটবে এই একান্ত আশা মনে নিয়ে।"

কিন্তু একটা ছোট মোটর দুর্ঘটনার আকস্মিকতায় অমিতেব মুহূর্তে রূপান্তর ঘটে গেল। "একটি মেয়ে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। সদ্য মৃত্যু-আশঙ্কার কালো পটখানা তার পেছনে, তারি উপরে সে যেন ফুটে উঠল একটি বিদ্যুৎরেখায় আঁকা সুস্পষ্ট ছবি—চারদিকের সমস্ত হতে স্বতন্ত্র। মন্দার পর্বতের নাড়া-খাওয়া ফেনিয়ে-ওঠা সমুদ্র থেকে এইমাত্র উঠে এলেন লক্ষ্মী, সমস্ত আন্দোলনের উপরে—মহাসাগরের বুক তখনো ফুলে ফুলে কেঁপে উঠছে।"

তারপরে নিরবচ্ছিন্ন প্রেমের কলগুঞ্জন—বুদ্ধি এবং আবেগদীপ্ত তীক্ষ্ণ সংলাপের দ্যুতি—চেরাপুঞ্জির নিবিড়-নীল মেঘ থেকে এক-একটি বর্ষণের মতো কবিতার ধারাপাত। হৃদয়ের প্রবল টানে পরস্পরকে জীবনে জড়িয়ে নিতে গিয়েও শোভনলালের নীরব করুণ প্রেমের অলক্ষ্য বন্ধনে লাবণ্যের দ্বিধা, কেটি মিত্রের আবির্ভাব এবং তার 'এনামেল করা গালের উপর দিয়ে চোখের জল' গড়িয়ে পড়া, তারপরে 'হে বন্ধু, বিদায়'।

এই কাব্যোপন্যাসের সঙ্গে কোথায় যেন 'ঘরে বাইরে'র একটা অলক্ষ্য সংযোগ অনুভব করা যায়। অমিতের সঙ্গে সন্দীপের অবশ্য কোনো তুলনাই করা চলে না—কিন্তু যে প্রবল প্রাণবেগে অমিত শোভনলালের স্তিমিত ভক্ত-প্রেমের পূজামন্দির থেকে লাবণ্যকে ছিন্ন করে আনছে—তা আর একদিক থেকে বিমলার

পরম-সংকটকেই স্মরণ করায়। পরিশেষে যেমন বিমলা সন্দীপের লোভের গ্রাস থেকে মুক্তি পেয়েছে, তেমনি করেই অমিতের স্বপ্নরাজ্যের কুহেলি থেকে লাবণ্য ফিরে গেছে শোভনলালের উৎকণ্ঠ-প্রতীক্ষিত শান্ত প্রেমের জগতে, যে তাকে গ্রহণ করবে "অসীম ক্ষমায়, ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি।" আর অমিতকে সে জানিয়ে গেছে :

"যে ভাবরসের পাত্র বাণীর তৃষায়,
তার সাথে দিব না মিশায়ে
যা মোর ধুলির ধন, যা মোর চক্ষের জলে ভিজে।
আজো তুমি নিজে
হয়তো বা করিবে বচন
মোর স্মৃতিটুকু দিয়ে স্বপ্নাবিষ্ট তোমার বচন।
ভার তার না রহিবে, না রহিবে দায়—"

বিশুদ্ধ রোমান্টিক উপন্যাস—চম্পূকাব্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। দেহহীন ভাবময় প্রেমের সেই চিরন্তন আরতি। কিন্তু বৈশিষ্ট্যও আছে। 'শেষের কবিতা'য় ভাষাশিল্পী রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব চরমে পৌঁছেছে। জলভরা মেঘের মধ্যে খরশাণ বিদ্যুতের মতো কাব্যসুরভিত এবং উইটে উজ্জ্বলিত এই ভাষা অনুকরণের প্রলোভন জাগায়; কিন্তু নদীর ওপর জ্যোৎস্নার লীলাকে যেমন জলের অঞ্জলিতে তুলে আনা যায় না, তেমনি এর ভাষা আমাদের চোখের সামনে থেকে লুব্ধ করেও ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

এই উপন্যাসের আর একটি বিশেষত্ব অমিতের চরিত্র-রচনায়। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় এমন একটি নায়ক-মূর্তি এই পর্যায়ে ফুটে উঠতে আরম্ভ করেছে—যে সমস্ত আধুনিকতাকে অতিক্রম করেই আধুনিক, যে চলনে-বলনে প্রখর-প্রগল্ভ, অথচ যে অন্তরে অন্তরে কোনো স্থির অচঞ্চল ধ্রুব-সত্যের প্রত্যয়ী। তার বাইরের সমস্ত উদ্দামতা অশ্রান্ত উগ্রতায় সেই সত্যেরই সন্ধান করে ফিরছে।

সে আধুনিক, কিন্তু বিলিতি কেতার অনুকরণে নয়—তার আধুনিকতা সম্পূর্ণই মৌলিক ; সে ফ্যাশানেব্‌ল নয়—স্টাইলিস্ট্‌ সে অভিজাত ইঙ্গ-বঙ্গ সংস্কৃতির সৃষ্টি একটি পরগাছা মাত্র নয়—সপ্ত সমুদ্রের বাতাস ডানায় মাখিয়ে নিয়ে মুক্তির আনন্দে রাজহংসের মতো কোনো মানস-সরোবরের যাত্রী। এই মুক্ত-চঞ্চল আধুনিকতম যৌবনের প্রতিভূ হল অমিত—আর লাবণ্যই তাকে তার মানস-যাত্রার পথ দেখিয়েছে। অমিতকেই আমরা নতুন করে দেখতে পাই 'রবিবার' গল্পের অভীকের মধ্যে।

হয়তো অভীকের চাইতে আর একটু রক্ষণশীল ভাবেই পাই। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে বাইরের সমস্ত বিলিতিয়ানাই ছিল একটা নিছক প্রচ্ছদপট মাত্র, তার অন্তরঙ্গে ছিল জাতীয়তা, ছিল ভারতবোধের আত্মমর্যাদা। নিবারণ চক্রবর্তীর শিষ্য, স্টাইলিস্ট্‌ অমিতও শেষ পর্যন্ত এই ভারতীয়তার কাছেই সম্পূর্ণ ধরা দিয়েছে, 'রবি ঠাকুরের' সঙ্গে তার মানস-সংযোগ আর চাপা থাকেনি।

"সে আজকাল কেটি মিত্তিরের বাইরেকার রঙটা ঘোচাতে উঠে পড়ে লেগেছে। কা ' পেয়েছে মনের মতো, বর্ণান্তর করা। এতদিন অমিত মূর্তি গড়বার শখ মেটাত কথা দিয়ে, আজ পেয়েছে সজীব মানুষ। সে মানুষটিও একে একে আপন উপরকার রঙিন পাপড়ি-গুলো খসাতে রাজি, চরমে ফল ধরবে আশা করে।······বন্ধুদের সে বলে দিয়েছে তাকে কেতকী বলে ডাকতে।······অমিত তাকে নাকি নিভৃতে ডাকে 'কেয়া' বলে।"

অর্থাৎ 'শোধবোধে'র নেলীর মধ্যে যে ভারতীয়তা স্বাভাবিক ভাবেই ফুটে উঠেছিল, অমিত তাকেই ধীরে ধীরে জাগিয়ে তুলেছে কেটি মিত্তিরের ভেতর। অমিতর আধুনিকতার মূল রহস্যটি যে কোন্‌খানে আশা করি, আমাদের তা বুঝতে অসুবিধে হবেনা।

আর একটি নতুন কথা আছে 'শেষের কবিতা'য়—যাকে রবীন্দ্রনাথের প্রেমতত্ত্বের মধ্যে কিছুটা স্বতন্ত্র সংযোজন বলা যেতে

পারে। 'মানসী'তে তিনি যে রূপাশ্রয়ী অকায় প্রেমের সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, তাকেই পূর্বাপর অনুসরণ করে এলেও 'শেষের কবিতা'য় তার সীমা আরো একটু প্রসারিত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ সত্যতর প্রেমকে ধ্যানের মধ্যে রেখে নিভৃতে পুজো করা যায়, আর ব্যবহারিক জীবনে আর এক প্রেমকে নিয়ে দৈনন্দিনতা নির্বাহ করা চলে। অমিতের ভাষায়, 'দীঘি', আর 'কুয়োর জল'। "কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল,—প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাবণ্যের সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা সে রইল দিঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।" এই ঔদার্য অবশ্য তরুণ রবীন্দ্রনাথ দেখাতে পারেন নি; পারলে 'নষ্টনীড়' অমন করে ভাঙনের মধ্যে হারিয়ে যেতো না—চারু, অমলের সরোবরে অবগাহন করে ভূপতির ঘড়ায় তোলা জলেই স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে পারত।

॥ পাঁচ ॥

১৩৩৯ এবং ১৩৪০ সালে পর পর দুটি ছোট উপন্যাস প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা' পত্রিকায়। একটি 'দুই বোন', আর একটি 'মালঞ্চ'। উপন্যাসের কিছু লক্ষণ থাকলেও আয়তনে, ঘনীভূত বিন্যাসে, চরিত্রের স্বল্পতায় এবং ইঙ্গিতধর্মিতার প্রাচুর্যে দুটি দীর্ঘ ছোটগল্পের আস্বাদই এদের মধ্যে লাভ করা যায়। ভাবের দিক থেকেও উপন্যাস দুটিতে কিছু ঐক্য আছে—এদের দুখানিকেও 'দুই বোন' নামে চিহ্নিত করলেও অন্যায় হয় না।

দুটি উপন্যাসই মূলতঃ রোমান্টিক—কেন্দ্রে একটি পুরুষ, তাকে প্রদক্ষিণ করে 'দুই নারী'। 'দুই বোনে' এ ছাড়াও আরো কিছু

তত্ত্ব আছে। "মেয়েরা দুই জাতের···একজাত প্রধানত মা, আর একজাত প্রিয়া।" একজন 'বর্ষাঋতু'—যে জলদান করে, ফলদান করে, তাপ নিবারণ করে—শুষ্কতাকে দূর করে দিয়ে জীবনকে তৃপ্ত পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়; আর একজন বসন্ত—তার সমস্ত মায়ামন্ত্র আর চঞ্চলতা নিয়ে প্রবেশ করে চিত্তের গভীরে—"যেখানে সোনার বীণার একটি তার রয়েছে নীরবে, ঝংকারের অপেক্ষায়, যে-ঝংকারে বেজে বেজে ওঠে সর্ব দেহে মনে অনির্বচনীয়ের বাণী।"

'দুই বোন' উপন্যাস এই দুইজাতের নারীর পরিচিতি—একটি বিশেষ আইডিয়ার দ্বারা নির্দেশিত, উপন্যাসের সূচনা-পর্বেই কবি সে-কথা তাঁর পাঠকদের জানিয়ে দিয়েছেন এবং 'বিচিত্রা'য় পত্রস্থ একটি চিঠির মাধ্যমে উপন্যাসের মর্মবাণীটি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাও করেছেন। তা থেকে আমরা জানতে পারি, যে-ধরনের পুরুষেরা স্ত্রীর মধ্যে দিয়ে মাতৃস্নেহলাভে সারা জীবন চরিতার্থ হয়ে থাকে—গল্পের নায়ক এঞ্জিনীয়র শশাঙ্ক সে-দলের নয়, তার অন্তর চেয়েছিল স্ত্রীকে "স্ত্রীরূপেই"—চেয়েছিল "যুগলের অনুষঙ্গ"। তার বদলে সে পেল শর্মিলাকে: "বড়ো বড়ো শান্ত চোখ; ধীর গভীর তার চাহনি; জলভরা নব-মেঘের মতো তার দেহ। স্নিগ্ধ শ্যামল; সিঁথিতে সিঁদুরের অরুণরেখা।" এবং তার "মকরমুখো মোটা বালাপরা" দুই হাতে কল্যাণময় সেবা আর অতিলালনের সতর্কতা।

এইখানেই শশাঙ্কের মনে লুকিয়েছিল একটা অচেতন অতৃপ্তি। যে লীলারূপিণী প্রেয়সীর জন্যে অন্তর তার নিজের অগোচরেই দিনের পর দিন তৃষিত হয়ে উঠছিল, একদিন অবস্থাচক্রে তারই সংবাদ নিয়ে এল শর্মিলার ছোট বোন ঊর্মিলা। নামের মধ্যেই তারও চরিত্রের ইঙ্গিত। সে "যতটা দেখতে ভালো তার চেয়েও তাকে দেখায় ভালো। তার চঞ্চল দেহে মনের উজ্জ্বলতা ঝল্‌মল্ করে বেড়ায়।"

শশাঙ্কের মতো ঊর্মির জীবনেও একটা ভ্রান্ত নির্বাচন ঘটে

গেছে। সে ব্যক্তি হল নীরদ—জন্ম-গুরুমশাই—প্রতি পদে যার শাসন আর নিষেধ—যাকে নিয়ে ঊর্মির "প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল।"

অর্থাৎ দু-দিক থেকেই অমিল পয়ার এবং ছন্দোপতন। নীরদ বিলেত যাওয়ার পরে তপস্যার কারাগারে বন্দিনী ঊর্মি কিছুদিনের জন্যে পেল মুক্তি, আর সেই মুক্তির আনন্দে সে মাতিয়ে দিলে শর্মিলার কেজো স্বামী শশাঙ্ককেও। লোহা-লক্কড় চূণ-সুরকির তলায় এঞ্জিনীয়ারের যে হৃদয়টি চাপা পড়ে গিয়েছিল এবং শর্মিলার অতিলালনে যে পুরুষসত্তা শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়েছিল—তারা একসঙ্গে বসন্তের বাতাসে জেগে উঠল। শর্মিলার অসুস্থতার আনুকূল্যে এবং নীরদের বিশ্বাসঘাতকতায়, ব্যবসায়ে সর্বনাশের আগুন জ্বেলে, তারই আলোকে যখন ঊর্মিকে জীবনে বরণ করতে যাচ্ছিল শশাঙ্ক, তখন দিদির দিকে তাকিয়ে ঊর্মিই নিজেকে তা থেকে সবলে বিচ্ছিন্ন করে নিলে। "ভাগ্যের অঘটন শোধরাতে গিয়ে সামাজিক অঘটন দারুণ হয়ে উঠল"—এই হল লেখকের সিদ্ধান্ত।

অসম মিলনের এই সমস্যা সর্বকালের, অথচ সামাজিক বিধি-বিধান এবং লোকাচারের নিষেধে এর কোনো প্রতীকার নেই। শর্মিলার মতো আদর্শ স্ত্রীকে পেয়েও মনের ছন্দ মেলেনি বলে শশাঙ্ক অসুখী—ডিভোর্সের মামলায় আদালতেও এ যুক্তি অচল। অথচ এই যন্ত্রণা সত্য, এই অতৃপ্তির মধ্যে কোনো রোমান্টিক্ কল্পনা-বিলাস নেই। বাধ্য হয়েই মানুষকে নিজের প্রাপ্তির সঙ্গে চুক্তি করে নিতে হয়, তাকে বলতে হয়ঃ "যা পেয়েছি তাই মোর অক্ষয় ধন, যা পাইনি বড়ো সেই নয়।" তারপরে দিন কাটতে থাকে, অভ্যাসের সঙ্গে ঘষা খেতে খেতে অনুভূতির তীক্ষ্ণতা ভোঁতা হয়ে আসে, তখন আর 'কী পাইনি' মন তার হিসেব মেলাতে উৎসাহ বোধ করে না।

কিন্তু এরই মধ্যে যদি কখনো দেখা দেয় ঊর্মিমালার মতো তপোভঙ্গ মহেন্দ্রের দূতী, তখন তার কালো চক্ষের বিদ্যুতের

আলোয় অসাড় ঘুমন্ত চেতনায় সোনার কাঠির ছোঁয়া লাগে, যাকে ভোঁতা লোহার ফলা বলে মনে হয়েছিল তা ইস্পাত হয়ে জ্বলে ওঠে, মজা নদীতে অকস্মাৎ দুরন্ত বন্যা বয়ে আসে। সেদিন যে অঘটন ঘটতে আরম্ভ করে, সামাজিক দিক থেকে তাকে ধিক্কার দেওয়া চলে, নীতি দিয়েও তাকে সমর্থন করা যায় না, কিন্তু সত্য হিসেবে তাকে অস্বীকার করবার পথ কোথায়? এই 'Mal-adjustment' এবং তাকে সংশোধন করবার একটা করুণ চেষ্টার বিষণ্ণ কাহিনী পরিবেষণ করা হয়েছে 'দুই বোনে'।

জীবনে স্ত্রী-প্রিয়া এবং কর্মসহচরী—একটি নারীর মধ্যেও কখনো কখনো যে এই ত্রিবেণী এসে মিলিত হয় না—এ-কথা আমরা বিশ্বাস করি না। এমন হলে, চরিতার্থ পুরুষ অর্জুনের মতোই বলতে পারে: 'প্রিয়ে, আজ ধন্য আমি।' কিন্তু যদি তা না হয়? যদি নদীর এক কূলে প্লাবন ঘটে—ঘটে অনাবশ্যকতার বন্যা, আর এক তীরে দীর্ঘ তৃষিত মরুভূমি ধূ ধূ করতে থাকে, তখন?

ইউজিন ও'নীলের 'The Strange Interlude' বলে যে বিখ্যাত নাটকটি আছে, তার নায়িকা তিনজন পুরুষকে দিয়ে জীবন পরিপূর্ণ করতে চেয়েছে একজন তার প্রেমিক, একজন তার সুস্থ-সবল সন্তানের জনক, তৃতীয় জন তার ভর্তা ও রক্ষাকর্তা। বক্তব্য চমকপ্রদ, কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য হওয়া শক্ত। শশাঙ্কও শেষ পর্যন্ত শর্মিলার শান্ত আত্মত্যাগের প্রশ্রয়ে এমনি একটা সমাধানের দিকেই চলতে চেয়েছিল, কিন্তু তা আর ঘটল না। ভাঙনের পথ বেয়ে বেরিয়ে গেল ঊর্মি, আর তিনজনের মনে জেগে রইল এমন ক্ষতচিহ্ন—যা থেকে চিরদিন রক্তবিন্দু ঝরতে থাকবে। অথবা চিরদিনের কথাই বা কে বলতে পারে—নিভৃত আত্মলেহনে সে ক্ষতকে নিরাময় করবার ক্ষমতাও তো মানুষের অনায়ত্ত নয়!

'মালঞ্চ' উপন্যাসেও এক পুরুষ, দুই নারী। শশাঙ্কের সঙ্গে আদিত্যের সাদৃশ্য আছে, নীরজার মধ্যে খানিকটা শর্মিলা, সরলার

মধ্যে খানিকটা ঊর্মি। কিন্তু আদিত্য ও নীরজার মিলন ভাঙা-ছন্দের অমিতাক্ষর নয়, অমিত্রাক্ষরও নয়। "বিবাহের পর দশটা বছর একটানা" ওদের চলে গেছে "অবিমিশ্র সুখে"। নীরজাকে "মনে মনে ঈর্ষা করেছে সখীরা; মনে করেছে ওর যা বাজার দর তার চেয়েও অনেক বেশি পেয়েছে। পুরুষ বন্ধুরা আদিত্যকে বলেছে, 'লাকি ডগ'।"

এই দাম্পত্য-জীবনের প্রতীক আদিত্য আর নীরজার "ফুলের চাষ"—তাদের যৌথ-প্রেমের পুষ্পিত পরিপূর্ণ রূপ 'মালঞ্চ'। নীরজা নিঃসন্তানা—অন্যদিকে তার "ভালোবাসার ছিল প্রচণ্ড জেদ।" এই প্রচণ্ড জোরালো ভালোবাসা দিয়েই সে ঘিরে রেখেছে আদিত্যকে—ফুটিয়ে তুলেছে মোতিয়া বেল, গোলাপ, ম্যাগ্‌নোলিয়া, রজনীগন্ধা, ডালিয়া, জিনিয়া, কার্ণেশন। স্বামীর মতোই মালঞ্চের সঙ্গেও তার অচ্ছেদ যোগ, মালঞ্চের মধ্যেই তার প্রেম সহস্র পুষ্পদণ্ডে সূর্যস্নাত, বর্ষণসিক্ত, বসন্ত-সমীরিত।

কিন্তু মৃত সন্তান জন্মের পরে নীরজার জীবন্মৃত্যুর দুর্ভাগ্য কাহিনীতে ঘনিয়ে আনল দুর্বিপাক। এল সরলা। শান্ত, অন্তর্মুখিনী। আদিত্যের প্রথম জীবন-মালঞ্চের সে মালিনী—যার কাছে আদিত্যের বৈষয়িক সার্থকতার ঋণও সামান্য নয়। তারপরেই নীরজার দুঃসহ অন্তর্জ্বালার অধ্যায়। সে জানে, দিনের পর দিন তার পালা ফুরিয়ে আসছে, মালঞ্চের কোনো কাজেই সে আর কোনোদিন লাগবে না, তার জায়গায় আজ অপরিহার্যভাবেই সরলার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যা সত্য তাকে স্বীকার করে নেবার মতো বিবেচনা নীরজার আছে, রমেনের কথাও সে ভোলেনি, কিন্তু তার সাম্রাজ্যে তারই চোখের সামনে আর একজন অধীশ্বরী হয়ে বসবে, এও সহ্য করা অসম্ভব! নিজের নিরুপায় যন্ত্রণায় সে রক্তাক্ত হয়েছে, অপমানের আঘাত দিতে চেয়েছে সরলাকে, অথচ সেই সঙ্গে চেয়েছে স্থৈর্য—একান্তভাবে কামনা করেছে তার অন্তর প্রসারিত হোক—

ঔদার্যে উন্মুক্ত হোক—যাবার আগে যেন নিজের হাতেই সরলাকে মালঞ্চ সমর্পণ করে দিতে পারে।

আদিত্যের মনেও তার প্রথম-মালিনীকে জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার স্বপ্ন জেগেছে। আর নীরজার বিদ্বেষ এবং আদিত্যের ভালোবাসার দোটানায় সেই 'মালিনী'ও ক্ষত-বিক্ষত; সরলাও বুঝেছে সে সরে গেলেই হয়তো আদিত্যের সংসারে এবং মালঞ্চে নতুন করে সুর ফিরে আসবে। অতএব স্বদেশকর্মী রমেনকে তার প্রশ্ন :

'রমেনদা, জেলে যাওয়া যায় কী করে, পরামর্শ দাও আমাকে।'

'জেলে যাবার রাস্তা এত অসংখ্য এবং আজকাল এত সহজ যে কী করে জেলে না যাওয়া যায়, সেই পরামর্শই কঠিন হয়ে উঠল।...

'না আমি ঠাট্টা করছিনে, অনেক ভেবে দেখলুম, আমার মুক্তি ওইখানেই।'

কেন? তার কারণ—এতদিন সরলা নিজেকে চিনত না, নীরজার "বিরাগের আগুনের আভায়" সে নিজেকে দেখতে পেয়েছে, —"তেইশ বছর যা ছিল কুঁড়িতে, আজ দৈবের কৃপায় তা ফুটে উঠেছে।" সরলা এবং আদিত্য সেই উপলব্ধির আলোকে নিজেদের ভেতরে আর কোনো আড়াল রাখল না। "সরলা উঠে দাঁড়াল, আদিত্য সামনে দাঁড়িয়ে, দুই হাত ধরে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, যেমন করে তাকিয়ে আছে আকাশের চাঁদ। বললে, 'কী আশ্চর্য তুমি সরি, কী আশ্চর্য'!"

তারপরে রমেনের সঙ্গে জেলেই গেল সরলা। আবার জ্বলতে লাগল নীরজার মন। এই বাগান ছেড়ে মৃত্যুর পরেও সে চলে যেতে পারবে না। তাই আদিত্যকে সে বলে, "ওই বাগানটাই সম্ভব আর আমি অসম্ভব এ হতেই পারে না, কিছুতেই না। সন্ধ্যেবেলায় ঠিক অম্‌নি করেই অস্পষ্ট আলোয় কাকেরা ফিরবে

বাসায়, এম্‌নি করেই দুলবে সুপুরিগাছের ডাল ঠিক আমার চোখের সামনে। সেদিন তুমি মনে রেখো আমি আছি, আমি আছি, সমস্ত বাগানময় আমি আছি। মনে কোরো বাতাস যখন তোমার চুল ওড়াচ্ছে, আমার আঙুলের ছোঁয়া আছে তাতে। বলো, মনে করবে ?"

এই হল নীরজার দাবি, তার অন্তিম কামনা। মালঞ্চের ওপর তার অধিকার জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে সমানভাবে প্রসারিত। কিন্তু মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সে নিজেকে আজ মহত্তম ত্যাগের জন্যেও প্রস্তুত করে নিয়েছে, সরলার প্রতি সমস্ত বিদ্বেষ তার ফুলবাগানের কাঁটাগাছের মতোই সমূলে এবং সজোরে উৎপাটিত করে তুলতে চেয়েছে সে। "কাল রাত্রি থেকে বার বার পণ করেছি এবার দেখা হলে নির্মল মনে ওকে বুকে টেনে নেব আপন বোনের মতো।...বলো, আমি তোমার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হব না, তাহলে সবাইকে আমার ভালোবাসা দিয়ে যেতে পারব।" আর রমেনের কথাগুলো স্মরণ করে, সরলা ফিরে আসবার সময় পর্যন্ত ডাক্তারের কাছে সে বেঁচে থাকবার আকূতি জানিয়েছে, বার বার সংকল্প করেছে—"দেব দেব দেব, সব দেব।"

কিন্তু শেষ মুহূর্তে প্রতিজ্ঞা রাখতে পারে নি। সরলা ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তিম চেষ্টায় বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ক্ষিপ্তা ডাকিনীর মতো। বলেছে, "জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না। আমি থাকব, থাকব, থাকব।...পালা পালা পালা এখনই, নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধবে তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত।"

'দুই বোন' এবং 'মালঞ্চে' কোনো বৃহৎ তত্ত্বকথা নেই, কোনো জটিল ঘাত-সংঘাত নেই, চিন্তার এবং মনোবিকলনের তন্ন তন্ন বিশ্লেষণ নেই—উপন্যাসের সুদীর্ঘ ব্যাপ্তিও নেই। আগেই বলেছি, এ দু'টি ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত। যদি টমাস হার্ডির বড়ো বড়ো

গল্পগুলোকে আমরা স্মরণে রাখি, তা হলে বলা যেতে পারে, এরা "Roman" হতে পারেনি, "Nouvelle" পর্যন্ত গিয়েই পৌঁছেছে। আর ভালো ছোট গল্পের মতোই এরা নিরলঙ্কৃত উজ্জ্বলতায় দীপ্তিমান, সাংকেতিকতায় সমৃদ্ধ, গতিতে খরধার, ব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ। নিবিড় সংযম এবং নৈপুণ্যের সাহায্যে জীবনের সরল অথচ অতি বাস্তব সত্যকে শিল্পিত করে তুলে রবীন্দ্রনাথ এই গল্প দু'টিকে শৈল্পিক সিদ্ধিতে পৌঁছে দিয়েছেন। 'ঘরে বাইরে', বা 'যোগাযোগে'র মতো বস্তু-মাহাত্ম্য এদের না থাকতে পারে, কিন্তু শিল্প-বিচারে এরা পূর্ণতর বলেই আমার ধারণা। আর ছোটগল্প-লেখক রবীন্দ্রনাথ যে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের চাইতে মহত্তর শিল্পী—এই দু'টি রচনা তা যেন আরো একবার প্রমাণ করে।

॥ ছয় ॥

রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ উপন্যাস 'চার অধ্যায়'।

এই উপন্যাসের আলোচনা করতে গিয়ে কিছু সংকোচ বোধ হচ্ছে। 'ঘরে বাই ে'র মতো এতে আবার রাজনীতি ঘিরে এসেছে—তা বিপ্লববাদের সমালোচনা। এর প্রথম মুদ্রণে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে কবির ব্যক্তিক আলাপের যে পূর্বভূমিকাটুকু যুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল, সম্ভবতঃ চতুর্দিকের ক্রুদ্ধ প্রতিবাদে তা পরে প্রত্যাহৃত হয়েছে। এবারেও জনমত 'চার অধ্যায়ে'র বিরুদ্ধে উদ্যত হয়েছে—তা রাজনৈতিক কারণেই।

'চার অধ্যায়' সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথকে 'ঘরে বাইরে'র মতো জবাবদিহি করতে হয়েছে—বলতে হয়েছে: "যেটাকে এই বইয়ের আখ্যানবস্তু বলা হয়েছে সেটা এলা ও অতীন্দ্রের ভালোবাসা।" এই ভালোবাসাকে যা নিয়ন্ত্রিত করেছে তা মাত্র নায়ক-নায়িকার

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই নয়—চারদিকের অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাত। এর রাজনীতির পটভূমি সেই পরিপার্শ্ব মাত্র।

কিন্তু পরিপার্শ্ব এত প্রবল যে মাত্র প্রেম-কাহিনীরূপেই 'চার অধ্যায়'কে গ্রহণ করা শক্ত। বিপ্লবী আন্দোলনের যে ছবি এতে ফুটেছে—সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার দাবি জানালেও তার সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্নের অবকাশ থাকে। বিশ্বাসঘাতকের হয়তো অভাব ছিল না, কিন্তু দলের পক্ষে কোনো কর্মী যদি ভার হয়ে ওঠে, তাহলে ইন্দ্রনাথের মতো নেতা স্বয়ং পুলিশে খবর দিয়ে সে ভার বর্জন করেন, বাংলার বিপ্লবীদের ইতিহাসে এমন ঘটনা অশ্রুতপূর্ব। সত্যের বিচারে কানাই গুপ্ত সম্পূর্ণ অবাস্তব। বটু যেভাবে এলাকে আত্মসাৎ করতে চেয়েছে, তাকে অপবাদ বললেও অত্যুক্তি হয় না। পটভূমিতে, চরিত্রে, কাহিনীর বিন্যাসে এই উপন্যাসকে নিতান্তই একটি বানানো গল্প বলে মনে হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে লেখা 'বদনাম' গল্পেও বিপ্লবী জীবন সম্পর্কে এই কাল্পনিকতার পরিচয় পাওয়া যাবে।

আমার ক্ষোভ সেখানেও নয়। আসল কথা, এই উপন্যাসই একান্ত দুর্বল। কথার কারুকার্য আছে, কিন্তু তারা চমকিত করে না; চরিত্রগুলো প্রাণবন্ত হয়নি—তারা খসড়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে —কেউ-ই যেন রক্তমাংসে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। ব্রতভ্রষ্ট অতীনের বেদনা এবং এলার ট্র্যাজিডী—কোনোটিই মনে দাগ কাটে না। 'ঘরে বাইরে'তে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-চরিত্রায়ণে যে প্রচণ্ড বলিষ্ঠতা অনুভব করা যায়—'চার অধ্যায়ে' তার চিহ্নমাত্রও নেই। এইখানেই এই উপন্যাসের ব্যর্থতা। বিপ্লবী কর্মধারার বিপক্ষে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অতীন-এলার প্রেমের পটভূমিকাতে যদি শিল্পরূপে উপস্থাপিত হত, তা হলে 'চার অধ্যায়'কে গ্রহণ করতেও আমাদের দ্বিধা থাকত না। কিন্তু এই উপন্যাসে শৈল্পিক ভিত্তিই শিথিল

বলে রাজনীতিগত প্রশ্ন মুখ্য হয়ে প্রতিবাদে পাঠককে উত্তেজিত করে, মূল নিঃশক্তি বলেই শুষ্ক শাখার দিকে চোখ পড়ে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র উপন্যাস-সাহিত্যে 'চার অধ্যায়' দুর্বলতম সংযোজন। তবে উপন্যাসে নাট্যিক বিন্যাস আছে, সেটি এর মুখ্য আকর্ষণ। কী কারণে বলা যায় না, রবীন্দ্রনাথের শেষ-পর্যায়ী গল্পে উপন্যাসে নাটকীয়তা যেন একটু বেশি মাত্রায় সুস্পষ্ট। সেদিক থেকে 'চার অধ্যায়ে'র মূল্য নিশ্চয় স্বীকার্য।

॥ সাত ॥

আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করে এনেছি। কেবল আর একটি কথা বলেই উপসংহার টানব। এ-কথা কখনোই ভোলবার উপায় নেই যে রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি। তাঁর উপন্যাস-সাহিত্যেও এই কবিকে বার বার অনুভব করা যায়—'শেষের কবিতা'য় তো তাঁকে পূর্ণ মূর্তিতেই আমরা দেখতে পাই। 'চতুরঙ্গে' যে গভীরচারী মনস্তত্ত্ব—যে নিবিড় চৈতন্যপ্রবাহ চরিত্র, ঘটনা ও পরিণামকে নিয়ন্ত্রণ করছে, তার সঙ্গে ফরাসী মনোবিশ্লেষণের কোনো মিল নেই, জেম্‌স্ জয়েস কিংবা ভার্জিনিয়া উল্‌ফের সঙ্গে তার পার্থক্য আকাশ-পাতাল। চিত্ততলের মানস-স্রোতের ওপর থেকে থেকে কবি-কল্পনার রশ্মি পড়েছে, পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্যে অনেক সময়েই যা বুদ্বুদিত তামস-প্রবাহ, তার ওপর রবীন্দ্রনাথ কবিত্বের ইন্দ্রধনু ফুটিয়েছেন। পৃথিবীর সাহিত্যে এমন অপরূপ রচনা-রীতি আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে গুহার অন্ধকারে "আদিম কালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তুটা"র আবির্ভাব শচীশের চিন্তায় যে-ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তা মাত্র রবীন্দ্রনাথের লেখনীতেই সম্ভব। 'ঘরে বাইরে' থেকে যথেচ্ছ একটি উদাহরণ নেওয়া যাক :

"এই পর্যন্ত লেখা হয়ে শুতে যাব যাব করছি এমন সময়ে আমার জানলার সামনের আকাশে শ্রাবণের মেঘ হঠাৎ একটা জায়গায় ছিন্ন হয়ে গেল, আর তারই মধ্যে থেকে একটি বড়ো তারা জ্বল্ জ্বল্ করে উঠলো। আমার মনে হল আমাকে সে বললে, কত সম্বন্ধ ভাঙছে গড়ছে স্বপ্নের মতো, কিন্তু আমি ঠিক আছি; আমি বাসর-ঘরের চিরপ্রদীপের শিখা, আমি মিলনরাত্রির চিরচুম্বন।

সেই মুহূর্তে আমার সমস্ত বুক ভরে উঠে মনে হল, এই বিশ্ববস্তুর পর্দার আড়ালে আমার অনন্তকালের প্রেয়সী স্থির হয়ে বসে আছে। কত জন্মে কত আয়নায় ক্ষণে ক্ষণে তার ছবি দেখলুম—কত ভাঙা আয়না, বাঁকা আয়না, ধুলোয় অস্পষ্ট আয়না। যখনই বলি, 'আয়নাটা আমারই করে নিই'—'বাক্সর ভিতর ভরে রাখি' তখনই ছবি সরে যায়। থাক্-না, আমার আয়নাতেই বা কী! প্রেয়সী, তোমার অটুট বিশ্বাস রইল, তোমার হাসি ম্লান হবে না, তুমি আমার জন্যে সীমন্তে যে সিঁদুরের রেখা এঁকেছ প্রতিদিনের অরুণোদয় তাকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে রাখছে।"

এ মনস্তত্ত্ব, কিন্তু তার চাইতেও অনেক বেশি; হৃদয়ের গোপনতল-বাহিনী—অথচ তার সেই চলস্রোতের ওপর সন্ধ্যাতারার আলোটিকে ধরে এনেছে। এ বিশ্লেষণের জটিলতায় ক্লান্ত করে না—কবিত্বের সৌন্দর্যে গানের মতো ঝংকৃত হয়। 'যোগাযোগ' থেকে আর একটি উদাহরণ:

"বর্ষার রাত্রে খিড়কির বাগানের গাছগুলি অবিশ্রাম ধারাপতনের আঘাতে আপন পল্লবগুলিকে যখন উতরোল করেছে তখন কানাড়ার সুরে মনে পড়েছে তার ওই গান:

বাজে ঝনন মেরে পায়েরিয়া
কৈস করো যাউ ঘরোয়ারে।

আপন উদাস মনটার পায়ে পায়ে নূপুর বাজছে ঝননন্—উদ্দেশহারা পথে বেরিয়ে পড়েছে, কোনোকালে ফিরবে কেমন করে ঘরে।

যাকে রূপে দেখবে এমনি করে কতদিন থেকে তাকে সুরে দেখতে পাচ্ছিল। নিগূঢ় আনন্দ-বেদনার পরিপূর্ণতার দিনে যদি মনের মতো কাউকে দৈবাৎ কাছে পেত তা হলে অন্তরের সমস্ত গুঞ্জরিত গানগুলি তখনই প্রাণ পেত রূপে। কোনো পথিক ওর দ্বারে এসে দাঁড়ালো না। কল্পনার নিভৃত নিকুঞ্জগৃহে ও একেবারেই ছিল একলা। এমন-কি, ওর সমবয়সী সঙ্গিনীও বিশেষ কেউ ছিল না। তাই এতদিন শ্যামসুন্দরের পায়ের কাছে ওর নিরুদ্ধ ভালোবাসা পূজার ফুল-আকারে আপন নিরুদ্দিষ্ট দয়িতের উদ্দেশ খুঁজেছে।...

...অন্তরের এতদিনের এত আয়োজন ব্যর্থ হল—একেবারে ঠন্ করে উঠল পাথরটা, ভরাডুবি হল একমুহূর্তেই। ব্যথিত যৌবন আজ আবার খুঁজতে বেরিয়েছে, কোথায় দেবে তার ফুল। থালিতে যা ছিল তার অর্ঘ্য, সে যে আজ বিষম বোঝা হয়ে উঠল। তাই আজ এমন করে প্রাণপণে গাইছে, 'মেরে গিরিধর গোপাল, ঔর নাহি কোহি।' ”

আবার বলব, হৃদয়কে এমনভাবে রাঙিয়ে তুলে—অনুভূতির সমুদ্রে এমন করে সূর্যোদয়ের লীলা একমাত্র রবীন্দ্রনাথই প্রত্যক্ষ করাতে পারেন। আর, মাত্র এই একটি কারণেও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস বার বার পরম আনন্দেই পড়া চলে॥